

ସ୍ତ୍ରୀ

ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ



ଡି. ଏମ. ଶାହିସ୍ତ୍ରୀ  
୫୨, କରକ୍ଷାଲିନି ଡି. ଡି. କଲିକତା - ୬.

দ্বিতীয় প্রকাশ মাঘ, ১৩৩৬

মূল্য—চার টাকা মাত্র।

১৫৮৭  
STATE CENTRAL LIBRARY  
WEST BENGAL  
CALCUTTA  
১২. ১. ৬০

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার  
কর্তৃক প্রকাশিত ও ১, ছিদাম মুদি লেন, কলিকাতা-৬ কো-অপারেটিভ প্রেস হইতে  
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।

## লেখকের কথা

কয়েক বছর আগে একটি অধ্যাতনামা ছোট নূতন মাসিক পত্রিকায় এই উপভাসটি ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেছিলাম! কয়েক মাস প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে এবং যথারীতি আমারও বইটি শেষ করার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যায়।

এতদিন পরে আবার নতুন করে গোড়া থেকেই বইটি লিখে ফেলেছি।

নতুন উপন্যাস ফাঁদার চেয়ে থানিকটা লেখা উপন্যাস লিখে শেষ করা সাধারণত সহজ হয়—যদিও নিয়মটা সব ক্ষেত্রে খাটে না। প্রথম লাইনটি লিখবার আগেই বেশ কিছুদিন উপন্যাসটি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়—কতকগুলি দিক ভেবে রাখতে হয়, কমপক্ষে আসল কাহিনীর মূল ভিত্তিটা মনে মনে ছকে নিতে হয়।

অর্থাৎ আরম্ভ করা উপন্যাসে অনেকটা কাজ এগিয়ে থাকে।

এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস। আমার বিশ্বাস, প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানি করলে উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সাহায্য হয়।

উপন্যাস লেখার পুরানো একটি রীতি অথবা নীতি আজও অনেকে আঁকড়ে আছেন—সেটা এই যে উপন্যাসে কোন চরিত্র আনলে তার একটা গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা দিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষটার কি হল।

আমার প্রথম উপন্যাস ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’য় আমি প্রথম এই নিয়ম ভঙ্গ করি।

কয়েকটি ছোটখাট চরিত্রের বেলা তো বটেই, ছ’টি প্রধান চরিত্র মতি ও কুমুদের বেলাতেও কুমুদের সঙ্গে ট্রেনে মতিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়ে সেইখানে ছেদ টেনেছিলাম—লিখেছিলাম যে সন্তানের প্রয়োজনে হয় তো

ওদের কোনদিন নীড় বাঁধার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সেটা ভিন্ন কাহিনী,  
দরকার হলে ভিন্ন বই লিখে সে কাহিনীকে রূপ দেব !

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বইয়ে লম্বা ভূমিকা দেওয়া আমার অভ্যাস নয় ।  
এ বইয়ে এত দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়ার কৈফিয়ৎটাই উপরে সরলভাবে লিখে  
দিলাম ।



## এক

লোকে আজও তাদের বড়লোক বলে ।

অবস্থা অবশ্য পড়ে গেছে । আগেকার সেই হালচাল নেই । তবু, যে রকম কাহিল অবস্থা চারদিকে সকলের, মুন আনতে ঘরে ঘরে যেভাবে পাশ্চাত্য ফুরিয়ে যাচ্ছে—কম্ব হুয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রাণ—তার সঙ্গে তুলনা করলে আজও তারা বড়লোক বৈকি !

অভাবের কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে পুটি মোরলা পুঁচকে মাছেরা । রুই কাতলা না হলেও তাদের সঙ্গেই গভীর জলে সাঁতার কেটে বাঁচবার মজা তো ভোগ করছে রামনাথেরা ।

লোকে জানতে বুঝতে সুরু করেছে যে রাঘব বোয়াল রুই কাতলার পিছু পিছু আরামে সাঁতার কাটার দিন মাঝারিদের আর নেই ।

পাল্লা চলেছে গ্রাসের চেঁচা ঠেকিয়ে প্রাণ বাঁচানোর ।

তবু ক'জন খবর রাখে লোকসানে আর দেনায় দেনায় তাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে ?

নানান্দিক থেকে গুটিয়ে আনতে আনতে আজ কি অবস্থা হয়েছে তাদের কারবারের ?

বিলাতী কোম্পানীগুলি রাতারাতি ডোল পাল্টে ভারতীয় কোম্পানী বনে যাবার পর থেকেই যেন কেবলি তারা পা পিছলে পিছলে আছাড় খাচ্ছে ক্রমাগত ।

মহিম বেঁচে থাকতেই এসব ব্যাপার টের পাচ্ছিল সময়ের ।

ভালভাবেই টের পাচ্ছিল । মহিম মারা যাবার পরেই হাড়ে হাড়ে টের পেতে আরম্ভ করেছে ।

এই বিরাট সংসারের দায় ঘাড়ে নিয়ে কি করে মহিম টিকিয়ে রেখেছিল  
কারবারটা ?

সে ভাবতে পারে না, কল্পনা করতে পারে না ব্যাপারটা।

প্রায় তরাডুবির অবস্থাতে এসে গেলেও কারবারটা কোন ম্যাজিকে সত্যি  
সত্যি চালু অবস্থাতে রেখে যেতে পেরেছে ?

প্রথমে সত্যিই হৈয়ালি মনে হয়েছিল।

প্রায় ষোয়ান বয়স থেকেই মহিমের বিশ্বস্ত অধীনস্থ বুড়ো বনমালী এ যাত্রা  
টিকে না গেলে বাপের ব্যবসা চালিয়ে যাবার আসল কৌশল চিরদিনের জন্ত  
হৈয়ালিই থেকে যেত সমরেশের কাছে।

কারবারও খতম হত ছ'মাস কি ন'মাসের মধ্যে।

একই রোগে ধরেছিল মহিম ও বনমালীকে। বয়সও ছুজনের একই  
দশকের কোঠায়।

বনমালীকেই বরং ঢের বেশী বুড়ো আর জীর্ণ শীর্ণ মনে হত তার বাবা  
মহিমের চেয়ে।

আজ সমরেশ বুঝতে পারে যে মহিমের ভুঁড়ি মোটা নাহুসহুস চেহারাটা  
আসলে ছিল ফাঁপা—কারবারে ছরবস্থা অন্তত তার আহার বিহার ব্যায়াম  
বিলাসে ঘাঁটতি পড়তে দেয় নি।

তারই কারবারের জন্ত সারাজীবন কম খেয়ে বেশী খেটে বাঁচার লড়াই  
চালিয়ে আসার ফলে বনমালীর চেহারাটা দেখতে ঢের বেশী বুড়োটে হয়ে  
গেলেও হাড় তার শক্ত হয়েছিল বেশী।

তাই যে রোগ বড় বড় ডাক্তার কবিরাজের পাহারা বসালেও তিন দিনে  
মহিমকে শেষ করে দিল, চোদ্দ দিন সেই রোগে ভুগে সামান্য চিকিৎসাতেই  
বনমালী উঠল সেয়ে।

কলেজের আনাড়ি বুদ্ধি নিয়ে তার প্রায় বছর খানেক লেগেছে কারবারট  
চালু থাকার হৈয়ালি বুঝতে।

কারণ, বনমালী তাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই করেনি।

শে ক্ষমতাও অবশ্য তার নেই।

বার বার ঠেকে ঠেকে সামলে সামলে, ঠেকে গিয়ে কিভাবে সামলাতে হবে বনমালীর কাছে বার বার তার উপায় বাঙলে নিয়ে নিয়ে, হাতে নাতে তাকে জানতে হয়েছে কৌশলটা। শিখেছে কি না কে জানে!

মুখে বলতে সোজা কাজে করতে কঠিন কায়দা।

এক বছরে এমন অবস্থা কয়েকবার হয়েছে যে অন্ধশাস্ত্রে পুরো নম্বর পাওয়া ছেলে সমরেশ ভেবে কুল কিনারা পায়নি—পরদিনের জাইসিস কি করেঠেকানো সম্ভব।

বনমালী বাঙলে দিল।

আগের বছর ক-বাবুর কাছে কিছু দেনা করে একটা নতুন প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

লাভ হয়নি। তবে লোকসানও যায় নি।

খ-বাবুর কাছে আরও বেশী টাকা ধার করে ক-বাবুর দেনাটা ঠিক সময়ে মিটিয়ে দিতে ক-বাবু গদ গদ হয়ে গিয়েছিল।

সুদ নয়, সুদের হিসেবে টাকাটা দেনা করা যায় নি। লাভের একটা বথরা দেবার কথা ছিল। নগদ ফেরত পেয়ে ক-বাবু খুসীতে গদ গদ হলেও লাভের বথরা না পেয়ে ক্রমে ক্রমে ক-বাবু অনেক বেশী ক্ষুব্ধ এবং ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছে।

গ-বাবুর কাছে অল্প কিছু টাকা নিয়ে ক-বাবুর লাভের বথরাটা মিটিয়ে দিয়ে তাকে খুসী করে আরেকটা প্র্যানের জন্ত তার কাছ থেকে মোটা রকম দেনা আদায় করা যাবে।

চুক্তি করতে হবে লাভের বথরাটা বাড়িয়ে। লাভ যে সত্যই বাড়বে, হিসাব ছাড়িয়ে গিয়ে বেশী রকম বাড়বে, সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে ক-বাবুকে।

: কিন্তু দেনা শুধবেন কি করে বুনো দাছ ? লোকসান গেলেও লাভের বেশী বথরা দেবেন কোন হিসাবে ?

তার এই রকম শত-শত আকুল-ব্যাকুল প্রশ্নে বনমালী কোনদিন এতটুকু বিচলিত হয়নি।

: এমনি ভাবে এদিক ওদিক ঠেলেটুলেই খারাপ সময়টা কাটিয়ে দিতে হয়। মন্দার বাজার এমনিভাবেই সামলাতে হয়। বাজারের মোড় ঘুরলে বস্তার মত লাভ জমা হবে না বাবা ? চাইতে এলে সামান্ত দেনা নাক সিঁটকে নগদ ফেলে মিটিয়ে দেব।

এই সহজ কথাটা বুঝতে বছর কেটে গেছে সময়শের।

এর কাছে দেনা করে ওকে খানিকটা সামলাও, ওর কাছে দেনা করে একে খানিকটা সামলাও।

এইভাবে কাটিয়ে দাও হুঁদিনের কয়েকটা বছর !

যুদ্ধটুকু আর কি বাধবে না ? ব্যবসার জগতের হাওয়া কি আর ঘুরবে না ? তখন দেখে নেওয়া যাবে কে কার পাওনাদার !

সময়শ প্রায় আঁতকে ওঠে।

: আরেকটা যুদ্ধ বাধবে ?

ধীরে ধীরে কানে গোঁজা আধপোড়া সস্তা সিগারেটটা ধরিয়ে বনমালী বলে, বাধবে না ? যুদ্ধ বাধার ভরসাতেই তো আছি !

কিন্তু যুখে কিছু বলার উপায় নেই। বনমালীর মুনাফার স্কট তো সহজে মানবে না অতীত ভবিষ্যতের হিসাব !

জগৎ জুড়ে রব উঠেছে আর যুদ্ধ চাই না, শান্তির আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে বাওয়ার উপক্রম হয়েছে যুদ্ধবাজদের—বনমালী ভরসায় আছে আরেকটা যুদ্ধের !

কুমার শুনে হেসে বলে, বনমালীরা কিন্তু মত্বিকারের যুদ্ধবাজ নয়, যুদ্ধবাজদের তাঁবেদারও নয়। যুদ্ধ বাধাবার জন্য বনমালী কখনকালে এতটুকু চেষ্টাও করবে না। যার খুসী যুদ্ধ বাধাক—যুদ্ধ বাধলে বাজার কাঁপে, ওর কারবারে বেশী পয়সা আসে, এইটুকুই ও জানে। আসল দাম কমে পয়সা যে হান্ধা হয়ে যায়, ক'বছর বাদে ওদের আরও সাংঘাতিক বিপদের ব্যবস্থা তৈরী হয়ে থাকে—এ সব কথা বনমালীঘের মাথায় একেবারেই ঢোকে না।

সমরেশ বলে, ব্যবসা বাণিজ্য টাকা পয়সার ব্যাপারটা আমার মাথাতেও ঠিক ঢোকে না ভাই।

: কেন, মোট কথাটা বোঝা তো কঠিন নয়? এ তো সোজা হিসাব! যুদ্ধ তো চিরকাল চলতে পারে না পৃথিবীতে! বাজারও চিরকাল ফেঁপে থাকতে পারে না। যুদ্ধকে একদিন শেষ হতেই হবে, কাঁপা বাজারটাও খেলনা বেলুনের মত চূপসে যাযেই।

সমরেশ বলে, আখেরে লাভ নেই, এটুকু বুঝি। হিউজ্‌ স্কেলে মাপ মেরে, জখম হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুর্ভিক্ষ গজায়—ওসব জানি। যুদ্ধের মোটা লাভ শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে না, তাও তো দেখছি। বাবা কি সোজা টাকা লুটেছিল যুদ্ধের সময়! নিজের ঘরের খবর সব জানি তো। আসল বড়লোক ছিল ঠাকুরদার বাবা আর তার বাবা। ঠাকুরদা শুধু ঠেকিয়ে গিয়েছিল, বাবা ডুবতে বসেছিল—যুদ্ধটা বাধায় যেন মনে হয়েছিল সামলে গেল।

সমরেশ ঝাঁঝালো হাসি হাসে।

: সব ছুদিনের ভেলকি বাজী। কদিন খুব বড়লোকামি চলেছে—তারপর আবার যে কে সেই—নেই নেই নেই। দেখ দু'হাজার থেকে পূজার খরচ বিশ হাজারে উঠেছিল, এবার অনেক ঝগড়া ঝাঁট মারামারি করলেও বনমালীর কাছে পূজার খরচ আলাদা আদায় করা গেল না।

কুমার আশ্চর্য হয়ে বলে, বনমালী মালিক নাকি এখন?

সমরেশ মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলে, মালিক নয়, কর্তা—

ম্যানেজার। বাবাই ব্যবস্থা করে গেছে। বনমালী ব্যবসা চালাবে—ওর  
কথার ওপর কারো কোন কথা চলবে না। সংসারের খরচ শ্রাংসন করবে,  
আমাদের হাত খরচ শ্রাংসন করবে।

এবারও পূজায় সরগরম হয়ে উঠেছে বাড়ীটা। পূজা হবে না তবু বেশ  
কিছু আপনজনেরা এসে হাজির।

সব চেয়ে আগে হাজির তিন বোনের তিন স্বামী আর এক কুড়ি  
ছেলে মেয়ে।

আগে থেকে চিঠিপত্র লিখেই এসেছে। সময়ের বাবার মরণে নাকি  
বড়ই কাতর তার বিবাহিতা মেয়ে তিনজন।

আরেকজন বিবাহিতা মেয়ে অবশ্য বিয়ের পর একটা বছর না যেতেই  
বাপের ঘরে এসে ডেরা বেঁধেছে।

বাপের প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজটা তারা বাপের বাড়ীতেই  
করতে চায়। এমন বাবা জগতে আর হয় না। মেয়েদের খাইয়ে পড়িয়ে  
শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে যথারীতি বিয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্তু ব্লাড প্রেসার অগ্রাহ্য  
করে কী খাটাই না খেটে গিয়েছিল।

মাসী পিসী মামীদের জন কুড়ি মানুষের ভীড়ে নয়, এই তিন বোনের  
তিনটে স্বামী আর একুশটা ছেলেমেয়ের জন্তুই যেন পৈতৃক বাড়ীটা ঠাসাঠাসি  
হয়ে যায়।

পূজার তিনটা দিন কেটে গেল হৈ হুল্লোড়ে। বাপের মরণের অজুহাত  
নিয়ে বোনেরা ঘাড়ে চেপেছে—এ দায় সামলাতে হবেই।

নইলে তার জন্তুই বৃথা।

কিন্তু কি করে লামলাবে?

সামলে গেল বনমালী।

হাসিমুখেই সামলে গেল। কে বলবে যে প্রাণ দিয়ে মহিমের কারবার সামলাতে নেমে হুঁচোখে সে অন্ধকার দেখছে। চারিদিকে দেনার পাহাড়, কারবারের ডুবু ডুবু অবস্থা—সব ছেড়ে দিয়ে একদিন কাশীবাসী হবার সাধটা মাঝে মাঝে বনমালীর প্রাণে উকি দিচ্ছে।

বিজয়ার রাত্রি প্রভাত হতেই কিন্তু বনমালীর অজ্ঞ চেহারা সকলের চোখে ধরা পড়ে।

এবার পূজা হয় নি। বাড়ীতে রন্ধকারি খাবার জিনিষের ছড়াছড়ি নেই। বনমালী হিসেব করে রোজকার খাবার-দাবার আনিয়েছে, সকলকে থাইয়েছে।

মহিম মরেছে। পূজা হল না। জামা কাপড় না পাওয়ার হুঁথ কেউ গায়ে মাখে নি।

গতবার পূজা হলেও ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করে রাজভোগ খাওয়ার সুখ পাওয়া যায় নি, এবারও পাওয়া গেল না। কিন্তু পূজার কদিন নষ্ট না করে গত বারের মতই এবারও যে যত পারে খাওয়ার নিয়মটা বজায় আছে।

বিজয়ার পরদিন সকালেও ঘরের মানুষ এবং বাইরের যত মানুষ বিজয়া করতে এল সবাই আগের মতই পেট ভরে মিষ্টি খেল।

ক্রাইসিস দেখা দিল রাত্রির ভোজনের ব্যাপারে।

সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বনমালী বার হয়েছিল বিজয়ার নিয়ম রক্ষা করতে—ব্যক্তিগত নিয়মরক্ষা নয়, ব্যবসার জ্ঞান বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দরকারী খাতির রক্ষা করতে।

সারাদিন তার দেখা নেই।

এতগুলি মানুষের রাত্রির খাওয়ার ব্যবস্থা করতে কি ভুলে গিয়েছিল বনমালী ?

ভেল ঘি চাল ডাল তরকারী সবই আছে কিছু কিছু—চার পাঁচ জনের মত আছে !

বিকাল হয়, সন্ধ্যা ঘনিরে আসে। বনমালী ফেরে না।

ছোট বড় প্রায় চল্লিশ জন মানুষের রাজ্যের খাবার জন্ত রান্না চড়ানো যায় না।

বড় উদান দুটো ধরাবার মত করল। পর্যন্ত বাড়ীতে নেই!

সমরেশের মা কল্যাণী ব্যাকুল ভাবে বলে, এমনি হাত খালি তোর? একটা বেলা চালাতে পারবি না?

: পরস-কড়ি আমার কিছু দেয় নাকি?

মা কোথা থেকে লুকানো একটা ভাঙা সোনার সেকলে জিনিষ এনে দিয়ে বলে, যাক গে, বনমালী চিরকাল পাগল। ওর নিজের কি স্বার্থ আছে বল? কীই বা খায়—পাখীর আহার। তাদের ভালর জন্তই পাগলামি করছে।

অনেক রাতে বাজার নিয়ে বনমালী বাড়ী ফেরে।

কল্যাণীর অসুযোগের জবাবে হাই তুলে বলে, টাকার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম—তবিলে কি কিছু আছে আর? ছুটির বাজার, টাকা বোগাড় করা কি সোজা ব্যাপার! কাল পরশু বাদে কি হবে তা শুধু ভগবান জানে!

জোরে জোরে সকলকে গুলিয়েই বনমালী এসব বলে।

সমরেশের মুখটাই সবচেয়ে বেশী লাল হয়ে যায়।

অল্প আত্মীয়েরা অনেকেই পরদিন বিদায় নেয়, বাকী ক'জনও কেটে পড়ে কয়েকদিনের মধ্যে।

বোনরা নড়ে না। তিন স্বামী আর একশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে গাঁট হয়ে বসে থাকে।

সেদিন রাতেই নিজেরা পরামর্শ করে, বনমালী ফিরে আসার পর রাত দুটো পর্যন্ত।



পরদিন ছুপুরে মাকে নিয়ে পরামর্শ করতে বলে। সমরেশকেও তারা ডাকত কিন্তু শোনা গেল, খেয়ে দেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে বেরিয়ে গেছে।

পরামর্শ যত না হল, কল্যাণীকে বোঝানো হল তার চেয়ে ঢের বেশী। কল্যাণী থেকে থেকে হুঁপিয়ে ওঠে। তিন মেয়ে কথা বন্ধ রেখে তাকে সামলায় আর বোঝায়।

কল্যাণী বার বার বলে, ছেলেমানুষ সমু কি সামলাতে পারে রে? কে জানে কি কাণ্ড হচ্ছে!

মেয়েরা বলে, ভাবছ কেন মা? আমরা তবে রয়ে গেলাম কেন? তোমার জামাইরা তো পাকাপোক্ত মানুষ—ব্যাপার সব বুঝে শুনে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে নিশ্চয়। সমু ছেলেমানুষ, বুনো দাছ পাগলা কিন্তু তোমার জামাইদের ভীমরতি ধরে নি! অত ভেবো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বনমালী সেদিন বাড়ী ফেরে রাত দশটায়। মহিম বেঁচে থাকতেই তার সকাল আর রাত্রির হাঁকা আহারের ব্যবস্থা বাঁধা ছিল। মামাভু আহার, কল্যাণীর ভাষায় সত্যই পাথার আহার—কিন্তু সেটুকু হাঁকা জিনিষ।

এবার পূজো পর্যন্ত সে নিজের বজায় রেখেছিল নিজের আহারের ব্যবস্থা। সকাল আটটায় কারবার করতে বেরিয়ে রাত নটা দশটায় ফিরে সে আহার করত আধ ছটাক চিঁড়ে ভেজা, ছটাক খানেক দুধ আর কিনে আনা একটি সন্দেশ।

আজ বাড়ী ফিরে মুখ হাত ধুয়ে সব সে জপ করেছে, তিন বোন তাকে একরকম পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে খেতে বসায়, বলে, খাবে এসো বুনো দাছ।

বিকাল হয়, সন্ধ্যা ঘনিরে আসে। বনমালী কেঁরে না।

ছোট বড় প্রায় চল্লিশ জন মানুষের রাজের খাবার জন্ত রান্না চড়ানো যায় না।

বড় উনান দুটো ধরাবার মত কমলা পর্যন্ত বাড়ীতে নেই!

সমরেশের মা কল্যাণী ব্যাকুল ভাবে বলে, এমনি হাত খালি তোর? একটা বেলা চালাতে পারবি না?

: পয়সা-কড়ি আমার কিছু দেয় নাকি?

মা কোথা থেকে লুকানো একটা ভাঙা সোনার সেকলে জিনিষ এনে দিয়ে বলে, যাক গে, বনমালী চিরকাল পাগল। ওর নিজের কি স্বার্থ আছে বল? কীই বা খায়—পাখীর আহাৰ। তোদের ভালর জন্তই পাগলামি করছে।

অনেক রাতে বাজার নিয়ে বনমালী বাড়ী কেঁরে।

কল্যাণীর অহুযোগের জবাবে হাই তুলে বলে, টাকার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম—তবিলে কি কিছু আছে আর? ছুটির বাজার, টাকা বাগাড় করা কি সোজা ব্যাপার! কাল পরশু বাদে কি হবে তা শুধু ভগবান জানে!

জোরে জোরে সকলকে শুনিয়েই বনমালী এসব বলে।

সমরেশের মুখটাই সবচেয়ে বেশী লাল হয়ে যায়।

অন্ত আত্মীয়েরা অনেকেই পরদিন বিদায় নেয়, বাকী ক'জনও কেটে পড়ে কয়েকদিনের মধ্যে।

বোনেরা নড়ে না। তিন স্বামী আর একশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে গাঁট হয়ে বসে থাকে।

সেদিন রাজ্রেই নিজেরা পরামর্শ করে, বনমালী ফিরে আসার পর রাত দুটো পর্যন্ত।

পরদিন হুগুরে থাকে নিয়ে পরামর্শ করতে বলে। সমবেশকেও তার ডাকত কিন্তু শোনা গেল, খেয়ে দেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে বেরিয়ে গেছে।

পরামর্শ যত না হল, কল্যাণীকে বোঝানো হল তার চেয়ে ঢের বেশী। কল্যাণী থেকে থেকে হুঁপিয়ে ওঠে। তিন মেয়ে কথা বন্ধ রেখে তাকে সামলায় আর বোঝায়।

কল্যাণী বার বার বলে, ছেলেমানুষ সমু কি সামলাতে পারে রে? কে জানে কি কাণ্ড হচ্ছে!

মেয়েরা বলে, ভাবছ কেন মা? আমরা তবে রয়ে গেলাম কেন? তোমার জামাইরা তো পাকাপোক্ত মানুষ—ব্যাপার সব বুঝে শুনে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে নিশ্চয়। সমু ছেলেমানুষ, বুনো দাহু পাগলা কিন্তু তোমার জামাইদের ভীমরতি ধরে নি! অত ভেবো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বনমালী সেদিন বাড়ী ফেরে রাত দশটায়। মহিম বেঁচে থাকতেই তার সকাল আর রাত্রির ছাঁকা আহারের ব্যবস্থা বাঁধা ছিল। সামান্য আহার, কল্যাণীর ভাষায় সত্যিই পাখার আহার—কিন্তু সেটুকু ছাঁকা জিনিষ।

এবার পূজো পর্যন্ত সে নিজেই বজায় রেখেছিল নিজের আহারের ব্যবস্থা। সকাল আটটায় কারবার করতে বেরিয়ে রাত নটা দশটায় ফিরে সে আহার করত আধ ছটাক চিড়ে ভেজা, ছটাক খানেক দুধ আর কিনে আনা একটি সন্দেশ।

আন্ত বাড়ী ফিরে মুখ হাত ধুয়ে সবে সে জপ সেয়েছে, তিন বোন তাকে একরকম পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে খেতে বসায়, বলে, খাবে এসো বুনো দাহু।

আসন পেতে তার খাওয়ার জন্ত সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মাছ, মাংস  
পোলাও ভাল তরকারী ভাজাভুজি—

বনমালী ফোকলা মুখে এক গাল হাসে, বুঝেছি দিদিরা, বুঝেছি।  
তোদের বুনা দাছ এসব খেত তিরিশ বছর আগে। তোমাদের তো মনে  
খাকার কথা বড়দিদি মেজদিদি? মহিমকে কিভাবে সামলাতে হত।  
পেটে যায়গা নেই, মুখে রুচছে বলেই খেয়ে চলেছে।

বনমালী আরও ব্যাপকভাবে হাসে, নাতনী তোমরা, গিন্নী হয়েছে, তবু  
তোমরা বুঝবে বৈকি। যোয়ান যোয়ান যে শালাদের জন্ত আসলে এসব  
রন্ধেছ, তাদের খাওয়াওগে না? এ বুড়োকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি  
কেন!

তারা কেউ ভাবতেও পারে নি বনমালী এভাবে তাদের যড়যন্ত্র ঘামেল  
করে দেবে। মহিম চিবদিন তার সঙ্গে অধীনস্ত কর্মচারীর মত ব্যবহার  
করত। বাড়ীর সকলের সামনেই যখন তখন কত তর্জন গর্জন করত আর  
গালাগালি যে মহিম তাকে দিত—সে সব তো মনে আছে মহিমের বড়  
মেয়েদের।

তবে, এটাও অবশ্য ঠিক যে বাড়ীর অন্ত কেউ বনমালীকে একটা কড়া  
কথা শোনালে, তার সঙ্গে কর্তালি মার্কী কোনরকম রুঢ় ব্যবহার করলে মহিম  
ক্ষেপে যেত।

বনমালীর সামনে দাঁড় করিয়ে ক্ষমা চাইয়ে নিয়ে তবে বাড়ীর মানুষকে  
রেহাই দিত।

ক্ষমা চাওয়ামাত্র বনমালী কি ভাবে ক্ষমাপ্রার্থিনীকে শীর্ণ দেহের শক্ত  
পাঁজরায় জড়িয়ে ধরে একটু ধমকের সুরেই বলত—মহিম, কি পাগলামি  
করছ? সে স্বভিও মন থেকে মুছে যায় নি। যাবার কথাও নয়।

মহিম হিসাব করত না, যে মেয়েকে ক্ষমা চাইতে এনে দাঁড় করিয়েছে  
সে যুবতী না বালিকা। ক্রমাগত মেয়ের বাপ হতে হতে সে বোধ হয়

ভুলেই গিয়েছিল যে মেয়েরা আঁতুড়ে সব শিশুর মতই ট্যা ট্যা করে কাঁদে  
কিন্তু কয়েক বছরেই তারা হয় বালিকা, আরও কয়েক বছরে তরুণী এবং  
কয়েকটা বছর পরে যুবতী ।

ব্রততীর বিয়ে হয়েছিল, একটি ছেলে হয়েছিল । বনমালীই সব ব্যবস্থা  
করে দিয়েছিল । হাসপাতালে নেওয়া থেকে সপুত্র তাকে বাড়ী ফিরিয়ে  
আনা পর্যন্ত শুধু নয়, ছেলের পাঁচ মাস বয়স হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার কবরেজ  
আনানো আর ওষুধ পথ্য খাওয়ানোর সব ব্যবস্থাই করেছিল ।

ব্রততী জানত, মাইনে করা ভাড়া করা অধীনে লোকের এসব করেই  
থাকে । কর্তার কাছে খাতির বাড়ে বলে করে থাকে ।

হঠাৎ চিঠি এসেছিল । একদিনের মধ্যেই তাকে রওনা দিতে হবে স্বামী  
খণ্ডরের সংসারের দিকে । অনেক গাওনা গেয়ে, অনেক অজুহাত করে  
পাঁচ মাস সে বাপের বাড়ী কাটিয়েছে—এবার ফিরে যেতেই হবে স্বামী খণ্ডর  
শাশুড়ী ননদের ঘরে, তার নিজের সংসারে ।

ভোর সাতটায় এই চিঠি পোষ্ট করা হল বেলা তিনটার গাড়ীতে তার দেওর  
রওনা হবে ।

ভোর বেলা পৌছবে ।

ভোরের গাড়ীতেই যাতে রওনা হওয়া যায় সেজন্য ব্রততী যেন তৈরী হয়ে  
থাকে । ব্রততীর খণ্ডরের মর মর অবস্থা, নাটিকে দেখবার জন্য সে পাগল  
হয়ে উঠেছে, স্ত্রীরাং কোন কারণেই রওনা হতে যেন বিলম্ব না করা হয় ।

এতই উত্তেজিত বিচলিত হয়েছিল ব্রততী যে চিঠিখানা দেখাতে বা মুখে  
জানাতে ভুলেই গিয়েছিল মা বাবা কিম্বা বনমালীকে যে ভোরবেলা তার  
স্বামী আর খণ্ডরবাড়ীর প্রতীক একজন যোয়ান বয়সী দেওর এসে হাজির  
হবে তাকে নেওয়ার জন্য ।

আব্হা ভোরে দু'চারজন মানুষ তখন জেগেছে । কলের ভেঁ বাজেনি ।  
জপ তপ সেরে বনমালী সামনের বারান্দার সিঁড়িতে বসে নিম্নের ডাঁটা

দিয়ে দাঁতগুলি ঘষে ঝেঁজে চলেছিল প্রায় আধ শতাব্দীর অভ্যাসের জেরে টেনে।

সামনে দাঁড়িয়েছিল আটোসাঁটো পোষাক পরা বিরাম। এ রকম টাইপ পোষাক সচরাচর চোখে পড়ে না, সে যেন সর্বত্র সংসারজ্যাগীদের একমাত্র অবলম্বন ল্যাকট এন্ট্রি সার্ট আর প্যাণ্টের কায়দায়।

: বৌদিকে নিতে এসেছি। দেবী করতে পারব না। মোড়ে ট্যান্ডি দাঁড়িয়ে আছে। খবর দাও তো গিয়ে। এখুনি যেতে হবে, আশ্বস্তার মধ্যে।

বনমালী দাঁত ঘষতে ঘষতেই বলেছিল, তোমার নাম কি হে হোকরা বাবু? কোন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছ?

ব্রততীর বোধ হয় জানাই ছিল। ব্রততী বোধ হয় তৈরী ছিল, আড়ালে ছিল।

বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছিল, এ আমার ছাওর বুনো দাহ। আমার নিতে এসেছে।

: বেশ তো। এসে গিয়ে। যাত্রা শুভ হোক।

টুক করে ভেতরে ঢুকে বনমালী সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ছাওরের সঙ্গে ব্রততী এভাবে খণ্ডরবাড়ী যেতে চায়—থাক।

তার পাঁচ মাসের ছেলে এখানেই থাক। তার জিনিষপত্র বাস প্যাট্রাও থাক।

হুহাতে দরজা ঠেলে ঠেলে চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে পাগলিনীর মত ব্রততী অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছিল, দরজা খোল, লীগগির দরজা খোল।

বনমালীর বিনয়নম্র অহুরোধ উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত দরজা খুলেছিল কল্যাণী। বাড়ীতে ঢুকেই ব্রততী বনমালীকে আঁচড়ে কানড়ে দিয়েছিল। লাথি চড় মেয়েছিল। বিরাম তাকে ফেলেই হয়তো গলির মোড়ে দাঁড় করানো ট্যান্ডিতে পালিয়ে যেত—কিন্তু তারও তো বয়স কম। যতই বিকৃত

করে দেওয়া হয়ে থাক—তার মনেও তো শত শত বছরের প্রকাশ গাইগুলির শিকড় গাঁথা।

ঐতি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ধরে এনেছিল। সময়েশকে দিয়ে ট্যান্ডির মালপত্র আনিয়ে নিজের গোনা গাঁথা টাকা পয়সা থেকেই ভাড়া মিটিয়ে ট্যান্ডি বিদায় করেছিল।

মহিম বেড়ানো সেরে বাড়ী ফিরেছিল ঘণ্টাখানেক পরে।

মুখ হাত না ধুয়ে, কিছু না খেয়ে বথারীতি গড়গড়া টানতে বসেছিল।

গড়গড়া টানতে টানতে ডেকে পাঠিয়েছিল সকলকে, মন দিয়ে সকলের কথা শুনেছিল।

শেষ কথা বলেছিল ব্রততী, কতদূর আত্মপরাধী ছাথো বুন্দো দাহুর। ছাওরের সামনে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়! পাড়ার লোক চেয়ে আছে—

মহিম উঠে তাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, চুপ কর। এতবড় আত্মপরাধী তোর ছাওরের, রাস্তায় ট্যান্ডি দাঁড় করিয়ে সদর দরজায় এসে হুকুম ঝাড়ে চটপট বোদিকে আসতে বল! তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়াই উচিত হয় নি।

তারপর হুকুম জারি করেছিল, যেহেতু ব্রততী বনমালীকে লাথি মেরেছে সেই হেতু ব্রততীকে তার পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।

বনমালী কড়া সুরে বলেছিল, তোমার মাথা ঠিক নেই মহিম। বামুনের মেয়ে আমার পায়ে হাত দেবে কিরকম?

: ও বামুনের মেয়ে নয় চাঁড়ালের মেয়ে। নইলে ছাওর এসে ওভাবে তু তু করে ডাকডেই যেতে রাজী হয়? বাপের অপমানের কথাটা খেয়াল করে না?

খিরাম হঠাৎ কাঁদ কাঁদা হয়ে বলেছিল, চিঠিতেই তো সব কথা লেখা হয়েছে? আপনার অপমান হবে কেন? গাড়ী টাইম মত পৌছলে এইভাবে

ট্যাক্সি করে বৌদিকে ভুলে নিয়ে গেলে ফেরার ট্রেনটা ধরতে পারব। নইলে সেই সন্ধ্যার গাড়ী। বাবা ওদিকে পাগল হয়ে গেছে—

ব্রততী মাথা হেঁট করেছিল। মহিমের হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল গড়গড়ার নল।

: বেয়াই পাগল হয়ে গেছে ?

: দাদা তো সব খুলে লিখেছে চিঠিতে ? দাদার চিঠি পান নি ?

হেঁট মাথা ব্রততী ব্লাউজের ভেতর থেকে খামের চিঠিটা বার করে এগিয়ে দিয়েছিল। বাপের নামের খামের চিঠি খুলেছে বলে নয়, সবাই খুলে থাকে বাড়ীর ঠিকানায় লেখা চিঠি। মহিমের সাংসারিক বা পারিবারিক জীবনে এমন কোন গোপনতাই ছিল না যে খামের চিঠি বোঁ ছেলে মেয়ে খুলে পড়লে তার অসুবিধা হত।

পাঁচমাসের ছেলেটা ককাচ্ছিল বলে তার পুঁচকে বালিসের নীচে খামটা শুঁজে দিয়ে সারাদিন ছেলে সামলাতে বিব্রত হয়ে থেকে চিঠির কথা ভুলে গিয়েছিল বলেও নয়। রাত্রে মহিম বাড়ী ফিরলে খেয়াল করে তাকে চিঠিটা দেয়নি বলেও নয়।

সে যদি চমকে উঠে বলত, ওমা, চিঠিটা খোকনের বালিশের নীচে রেখেছিলাম—একেবারে ভুলে গেছি। জ্বর আশায় ভুগে ভুগে একেবারে শেষ করে দিলে খোকাটা আমায়।

বলে, একবার কি ছ'বার কপালটা চাপড়ে দিয়ে উঠে গিয়ে সে যদি ছেলের বালিশের তলা থেকে খামটা এনে মহিমকে দিত—মহিম শুধু মনে মনে আপশোষ করে ভাবত যে চাকরে জামায়ের হাতে মেয়েটাকে দিয়ে কি বিক্রী রকম বোকামিই সে করেছে—মেয়েটা হয়ে গেছে হাকা।

ট্যাক্সি নিয়ে বিরাম আসার পর বনমালী গোলমাল সুরু করলে সে ছেলের বালিশের তলা থেকে খামটা বৃকের কাছে ব্লাউজের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছিল।



এ বাড়ীতে একমাত্র সেই চব্বিশ ঘণ্টা ব্লাউজ পরে।

খামটা হাতে নিয়ে মহিম বার বার ব্রততীর হেঁট করা মুখের দিকে চেয়েছিল। কে জানে কি ভেবেছিল মহিম। সমরেশ আজও ভেবে পায় না।

খুব ছোট ছিল কিন্তু চোখের সামনে আজও জল জল করছে এই সব দৃশ্য।

খাম খুলে চিঠিটা আগাগোড়া ছ'বার পড়েছিল ধীর ভাবে।

পত্রখানা জামাইয়ের। নাতিকেকে দেখার জন্ত তার বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছে—যায় যায় অবস্থা।

ডাক্তার পরামর্শ করে নাকি তাকে বলেছে যে নাতিকেকে তাড়াতাড়ি আনা দরকার।

তারপরেই ঝাঁক চেপেছে নাতিকেকে আনবার। বসে বসে হিসাব করেছে যে কে যাবে, কোন ট্রেনে যাবে, কিভাবে কত তাড়াহুড়া আনা যাবে কলকাতা থেকে নাতি আর তার মাকে।

মহিম উঠে দাঁড়িয়েছিল, বোধ হয় ব্রততীকে একটা চাপড় কষিয়ে দেবার জন্তই, বনমালী উঠে এসে তাকে ধরে জোর করে বসিয়ে দেবার পর সে ব্রততীকে বলে, আজকেই চলে যাবি। আর কোনদিন আসবি না। এমন চিঠি যে চেপে রাখে সে আমার মেয়ে নয়।

এই সোরগোলের মধ্যেই হঠাৎ টেলিগ্রাম এসে গিয়েছিল যে ব্রততীর শব্দও মারা গেছে।

টেলিগ্রামে ও এ নির্দেশও ছিল যে তাড়াহুড়া করে ব্রততীর যাবার দরকার নেই।

বিরাম পাগলের মত চীৎকার করে বলেছিল, আমি তবে কি করব?

মহিম বলেছিল, কি আবার করবে, সন্ধ্যার গাড়ীতে ওদের নিয়ে রওনা হয়ে যাবে।

বিরামের মাথা ঘুরছিল, কান্না আসছিল—ছ'হাতে মুখ ঢেকে সে বসেছিল চুপচাপ।

অর্থাৎ ব্রততী আর তার বাচ্চাটাকে নিয়ে সন্ধ্যার গাছীতে বসনা দেবে, এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল।

দুপুরে সমরেশের সামনেই ব্রততী ঘন্টাখানেক বিরামকে বুঝিয়েছিল, পরামর্শ দিয়েছিল। সমরেশ কিছু বুঝবে না, এই ছিল তার ধারণা।

ব্রততী বলে গিয়েছিল, বিরাম একটা চিঠি লিখে ফেলেছিল মহিমের কাছে। ‘খ্রীষ্টীয়চরণে তালুই মশাই’ সম্বোধন কেঁদে লিখেছিল যে টেলিগ্রামে যখন স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে বৌদিকে নিয়ে যেতে হবে না, বৌদিকে নিয়ে যাওয়ার সাহস তার নেই। নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। বাপ মরাত্তর খবর পেয়ে তার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে। পথে হয় তো বিপদ-আপদ ঘটে যাবে। স্নাতরাং সে একলাই বিদায় নিল।

মেয়েকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরে বিরাম মালপত্র নিয়ে বিদায় হয়ে গেছে শুনে এবং তার চিঠি পড়ে মহিম বলেছিল, চালাক চতুর ছেলে। কিন্তু একদম তেজ নেই। চিঠিতে লিখে রেখে পালিয়ে না গিয়ে কথাগুলো আমার মুখের ওপর বলতে তো পারত? আমি কি ওকে কয়েদ করেছিলাম।

ব্রততী বলেছিল, কয়েদ করতে পার ভেবেই হয় তো ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

সকালের পাওনা চড়টা কী জোরেই যে পড়েছিল ব্রততীর গালে—তার নাতির মা মেয়ের গালে!

বনমালী আপশোষ করে বলেছিল, মহিম, ব্রেক সারাও, ব্রেক সারাও। এবার অ্যাকসিডেন্ট হবে যে!

অনেককাল আগেকার কথা এসব। সে তখন ছিল বালক। স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে ঘটনাগুলি।

তারপর যথা নিয়মে চিঠিপত্র লেখালেখি করে জামাই এসে এক রাত্রি খণ্ডর বাড়ী থেকে ব্রততী ও তার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল।

কারো সঙ্গে হাসিমুখে একটি মিষ্টি কথা বলেনি সোমনাথ। নেহাৎ যেন কার্যক্লেশে খণ্ডর বাড়ীর আদর যত্ন সহ্য করেছিল—উপায় নেই বলেই অনেক কিছু চুপচাপ মেনে নিয়েছিল।

টের পাওয়া গিয়েছিল যে তার বড়ই রাগ আর অভিমান। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার রাগ অভিমান ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল বাড়ীর সকলে।

কেবল সমরেশকে সে খাতির করেছিল। সব সময় কাছে ডেকে রেখেছিল, হাসি গল্প চালিয়েছিল আর থেকে থেকে এটা চাই ওটা চাই বলে নিজের দরকারগুলি মিটিয়েছিল।

খণ্ডর বাড়ীর ওপর রাগ দেখিয়েছিল, নিদারুণ অনিচ্ছা দেখিয়ে খেয়েছিল মাছ মাংস সন্দেহ রসগোল্লা।

কে কি ভাবে অগ্রাহ্য করে ব্রততী নাকে মুখে ডাল ভাত গুঁজে তাকে সামলাতে গিয়েছিল।

আধঘণ্টার পর ব্রততীকে আর ভাল লাগেনি সোমনাথের।

চোয়া ঢেকুর তুলতে তুলতে সমরেশকে বলেছিল, একটা সোডা এনে দিতে পার ?

বনমালী মহিমকে ব্রেক সারাতে বলেছিল, সতর্ক করে দিয়েছিল যে নইলে দুর্ঘটনা ঘটবে।

আজও সমরেশের মনে প্রশ্ন জাগে—বনমালী কি টের পেয়েছিল দুর্ঘটনা কি ভাবে আসবে ?

শরীর খারাপ বলে রাত্রে কিছু না খেয়েই মহিম শুয়ে পড়েছিল। সংসারের সকলের খাওয়া দাওয়ার বন্ধবাট মিটিয়ে নিজে খেয়ে স্বামীর বিছানায় মাথায় কাচের টিপয়ে গ্লাসটা রাখতে গিয়ে মহিমের শোয়ার ভাঁজ দেখেই খটকা লেগেছিল কল্যাণীর মনে।

খাটের পাশে বসে নিত্যকার মত মাথা নামিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই টের পেয়েছিল, জিজ্ঞাসার চেষ্টা বৃথা।

মহিমের ঘুম আর কোনদিনই কেউ ভাঙাতে পারবে না, সে আর জাগবে না, সে আর খাবে না।

## দুই

তিন মেয়ে মাকে ভরসা দিয়েছিল যে বনমালী যদি গুণগোল কিছু ঘটিয়েই থাকে তাদের বাপের কারবারে—তার তিন পাকাপোক্ত বুদ্ধিমান জামাই সব ঠিকঠাক করে দেবে।

কারবারের ব্যাপারে কাউকে নাক গলাতে না দেবার পাকাপোক্ত অধিকার মহিম বনমালীকে দিয়ে গিয়েছিল—ইচ্ছা করলেই সে জামাইদের খাতাপত্র দেখাতে অস্বীকার করতে পারত, জেরার জবাবে নিজে কিছু বলা দূরে থাক, লোকজনকে পর্যন্ত জবাব দিতে নিষেধ করে দিতে পারত।

জামাই আদরে তিনজনকে চা মিষ্টি থাইয়ে দলিলটা নাকের ডগায় ধরে বলতে পারত, আচ্ছা, এবার তোমরা এসো গিয়ে।

কিন্তু সে যেন বেশী রকম আগ্রহ নিয়ে তাদের সব কিছু দেখায় শোনায় জানায়—এবং বোঝায় !

দু’দিনেই আগ্রহ কিমিয়ে যায় জামাইদের। জরুরী কাজের অভূহাতে একে একে তারা একরকম পালিয়েই যায়। তবে মহিমের তিন মেয়েকে রেখে যায়।

খরচের টাকা দিয়ে যায়। তারা খরচ দিয়ে থাকবে, বাপের বার্ষিক কাজটা সারবে।

এখন সময় নেই, উপায় নেই—তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসবার সময় কারবারের একটা সূব্যবস্থা করে যাবে।

গ্রাম এক সময়েই তিন জামাই বিদায় নেয়, তবে একসঙ্গে এক বেলাতে নয়। তিনজনে যাবে তিনদিকে, তিনটে ভিন্ন গাড়ীতে।

পারিবারিক জাবে একদিন ভোরে স্নান হয়ে বিকালেই শেষ হয় জামাই-  
বিকায়ের পর্ব। বেশ বেলা থাকতেই।

বড় মেয়ে বিছানা নেয় অল্প দু'জন পরস্পরের চুল বেঁধে দেবার জন্ত আসে  
ব্রততীর ঘরে।

আশ্চর্য এই যে বড় বড় কুমারী বোনেদের চুল বাঁধার তাগিদ থাকলেও  
তারা দিদিদের এই চুল-বাঁধা সম্মেলনের ধারে কাছে উকি দেয় না।

কাছাকাছি বয়সের তিনজন কম বেশী ছেলেমেয়ের মা গিলিবানি মেয়েমানুষ  
পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে মিনিট চারেক চুপচাপ থাকতে পারে—এই  
অদ্বিত ব্যাপার একমাত্র সমরেশ ছাড়া কারো নজরে পড়ে না।

ব্রততীর কাছে কয়েকটা টাকা নেওয়ার জন্ত সে পাশের ঘরে ওং পেতে  
ছিল।

ওদের চাপেই ভোরের গাড়ীর বদলে সন্ধ্যার পাড়ীতে রক্তনা হতে রক্তী  
হয়ে সোমনাথ ভোরবেলা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে বিদায় হওয়ার পরেই  
ওরা এসে জুটেছিল ব্রততীর ঘরে।

মিনিট কয়েকের বেশী কি আর চুপচাপ মুখ চাওরুটাওঝি করতে পারে  
মেয়েরা!

ব্রততী প্রথম মুখ খোলে।

: তার মানেই বাবার কারবার শেষ হয়ে গেছে। দু'হণ্ডা থাকবে ঠিক করে  
এসেছিল, দরকার হলে আরও এক হণ্ডা যাতে থাকতে পারে সে ব্যাবস্থাও  
করে এসেছিল। বাবার কারবারের অবস্থা খাঁচ করেই পাশিরে বাসছে।

বড় বোন সতী বলে, পালাবে কেন, সোজা জুটিয়ে পালাবার মানুষ ওয়া  
নয়। ঝাঁক চেষ্টায় কিছু করা যাবে না, সব কিছু চূপোর গেছে, অসম্ভব দায়  
না নিয়ে তাই কেটে পড়ল। উনিও তাই বলছিলেন। নিজেদের খরচে  
থেকে নিজেদের খরচে বাবার কাজটা কত যাব তাতে কোন দায় নেই,  
কয়েকটা টাকার মাফল। অল্পক কারবার হুসোর গেছে, ঠেঁকানো যাবে না।

কাজের কাজ শেষ হয়, দু'একদিনের মধ্যে ফিরে আসছে জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গিয়ে জামাইরা কেউ তাদের নিতে আসে না। চিঠি আসে তিন-জনের, নিজের নিজের ঠাইলে লেখা পৃথক চিঠি কিন্তু তিনটি চিঠিরই মোদ্দা কথাটা এক রকম।

জরুরী ব্যাপারে জড়িয়ে গেছে, এখন আর তাদের কলকাতা আসা সম্ভব নয়।

একথা স্পষ্টই বোঝা যায়, কারবারের অবস্থা দেখে তারা এমন ভড়কে গেছে যে দায় ঘাড়ে চাপার ভয়ে তারা কেউ আর ঝগুরবাড়ীর ধারে কাছে যেতে চায় না।

তিন বোনও হঠাৎ যেন নিজেদের ঘর সংসারে ফিরে যাবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

বনমালী অবশ্য কেবল আর একটা যুদ্ধের আশাতেই বসে ছিল না, অল্প প্যাচ করার সুযোগও খুঁজছিল।

প্যাচ তার মাথায় আসে, সুযোগও জুটে যায় কিন্তু কারবারের ব্যাপারে প্যাচ কষতেও কিছু টাকা দরকার হয়।

বনমালী কল্যাণীকে বলে, বোমা, তোমায় তো একবার ভায়ের কাছে যেতে হয়। কিছু টাকা আনতে হবে।

কল্যাণী বলে, টাকার জন্ত ভবানীর কাছে আমাকে যেতে বলছেন? আমি পারব না।

বনমালী বলে, একেবারে মরণ বাঁচনের কথা কিন্তু বোমা। সামান্য মান অভিমানকে বড় করো না। টাকাটা পেলে কারবারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া যাবে। এ সুযোগ ফস্কে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কল্যাণী বলে, আপনি তো সব জানেন। গিয়ে কি হবে? টাকা দেওয়া দূরে থাক, হয় তো কথাই বলবে না। তিনি অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার পর দশ বছর একখানা চিঠি লেখেন নি। আমি যেচে সমুদ্রে মাঝে মাঝে পাঠাই, ওর সঙ্গে পর্যন্ত ভাল কথা কম না!

বনমালী ভেবে চিন্তে সমরেশকে বলে, ছোটমামী তোকে না খুব ভালবাসে ?

: শরীর ভাল থাকলে আদর যত্ন করে, নইলে করে না ।

: তা হোক, তুমি একবার মামীর কাছে যাও । বুঝিয়ে বল গিয়ে যে এই বিপদ, মামাকে বলে তিনমাসের জন্ম টাকাটার ব্যবস্থা করে দিতে হবে । বলবি যে মামার কাছে টাকাটা কিছুই নয়, ফিরে না পেলেও মামার কিছু আসবে যাবে না—কারবারটা ডুবলে তোদের সর্বোনাশ হয়ে যাবে, হয় তোদের সবার দায় শেষ পর্যন্ত মামাকে ঘাড়ে নিতে হবে ।

সমরেশ বলে, তুমি গেলেই তো পার বুনো দাহ ? ভাল করে সব কথা মামাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে ।

বনমালী মাথা নেড়ে বলে, আমার কথা কি কানে তুলবে তোর মামা ? তোর মার সঙ্গেই সম্পর্ক তুলে দিয়েছে । বথাটে হয়ে গেছে বলে রাত্তির বেলা বাড়ী ফিরতেই মহিম বললে, ঘুম ভেঙ্গে এ বাড়ীতে তার মুখ দেখলে ওই মুখে জুতো পায়ে লাখি মারবে । সেদিন বেশী রাত করে নি । মহিমের হুকুমে তোর মা ওর সঙ্গে কথা কইলে না, তোর মার হুকুমে ওকে কেউ খেতে দিলে না । চুপচাপ শুয়ে রইল । সকালে মহিম কল ঘরে গেলে শোয়ার ঘরে গিয়ে ক্যাশবান্স ভেঙ্গে শ' তিনেক টাকা বাগিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেল ।

: ওসব তো শুনেছি । আসল কথা বল ।

: ওটাই তো আসল কথা । তিনশ' টাকা সম্বল করে এক কাপড়ে বাড়ী ছেড়েছিল, নিজের চেষ্টায় তোর বাপের চেয়ে বেশী কামাচ্ছে । গায়ের জালায় তোদের কারো মুখ ঝাখে না । তোর বাবা নয় নিরুপায় হয়ে দায় চাপিয়ে গেছে, ওর কাছে আমি একটা কর্মচারী । আমি বুঝিয়ে বলতে গেলে কি করবে জানিস্ বাবা ? ওই যে তোর বাবা ওকে বলেছিল জুতো পায়ে মুখে লাখি মারবে, অ্যান্ডিন পরে জবাব দিতে আমার মুখে জুতো মেরে বিদায় দেবে ।

সমবেশ বিরল মুখে বলে, তবে আর মামীকে বলে কি হবে ? ছোটমামা টাকা দেবে না ।

বনমালী কোড়ে কাতর হয়ে কপাল চাপড়ে বলে, এই তো লোষ তোদের, কিছু জানবি না বুঝবি না, বড় বড় কথা বলবি । জগৎ সংসারের কায়দা কানুন একটু জেনে বুঝে নিতে হয় তো ? শ' তিনেক টাকা সম্বল করে ঘর ছেড়ে তোর মামা যে এত টাকা কামাচ্ছে, একি ম্যাজিকে হয়েছে ? তোর মামা ছুঁচ হয়ে চুকে ফাল হয়ে বেরোবার কায়দা শিখেছিল, বখাটে হোক আর যাই হোক, তোদের মত হাবাগোবা ছিল না ।

: ছুঁচ হয়ে ঢুকবার কায়দাটা বাংলা লাও না ।

: একদিনে কি বুঝিয়ে বলা যায়, শিখিয়ে দেয়া যায় ? ওসব হল খাতের বাপার—খাত গড়ে তুলতে হয় । যেটুকু বললাম তুই সেটুকু কর দিকি বাবা । মামীর কাছে যা—হেসে কেঁদে রসিয়ে কথা বলে আশ্বাস করে তোষামোদ করে মামীর মনটা ভিজিয়ে দি'গে যা । তারপর মামীই সব ঠিক করে দেবে ।

বনমালী ফোকলা মুখে হাসে ।

বলে, তোর ছোটমামার দশ বছরের গায়ের জ্বালা দশ মিনিটে ঠাণ্ডা করার কায়দা তোর ছোটমামী জানে । বোকা হাবা ছেলেমানুষ তুই ওসব বুঝবি নে । যা বললাম সেটুকু শুধু কর—ফল হয় ভাল না হলে কি আর করা যাবে !

পরদিন সকালে সমবেশ তার ছোট মামার বাড়ী যায় । প্রকাণ্ড বাড়ীতে প্রাণী মোটে পাঁচজন । মামা মামী ছেলে আর চাকর দাসী রাঁধুনি । লোকাভাবে যেন থাঁ থাঁ করে বাড়ীটা—সাজানো গোছানো লোকশূন্য ঘরগুলি যেন জুসজ্জিতা বিধবার মত, গুচিগুত্র গুহুতায় শ্মশানের প্রতীক-শূন্যতার মত ইঁসফাস করছে !

লোক চাই ! জন চাই !



লোক ছাড়া জন ছাড়া বাড়ী ঘরের মানে নাই !

সরমা শুধু বলে, আর । বোস ।

বলে' ঝি চাকর রাঁধুণীর হাতে সংসার এবং তাকে আশ্রয় করা বন্ধ করা  
খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভার ছেড়ে দিলে শোবার ঘরে গিয়ে খাটে কাত হয়ে  
চোখ বোজে ।

শুশ্রূষা ঘরে !

তিন বছরের বাচ্চাটা তার অন্ত ঘরে ঘুমোচ্ছিল ।

নিরাপদেই ।

ও বাচ্চার কান্না মামীর কানে গেলেই বয়খান্ত হয়ে যেত ঝি রাঁধুণী  
দুজনেই ।

খাটুনি সামান্য । মোটা মাইনে দিয়ে তবু ছ'জনকে রাখা । মা'র জন্ত  
হোক আর যার জন্তই হোক—ছেলে তার কাঁদবে কেন !

ফুড-ভরা বোতলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি নাকি ?

যৌবন যেন বিস্ফারিত হয়েছে মামীর প্রাক-মধ্য বয়সে । যুবতীত্ব কুলে  
কঁপে উঠেছে জোয়ারের নদীর মত সর্বদে ।

অথচ কেমন যেন পুরানো বাসি হয়ে ঝিমিয়ে গেছে, নির্জীব হয়ে গেছে,  
সহরের পাশের পুরানো বুড়ী নদীটার মত ।

ঝি রাঁধুনি চা দেয়, চায়ের সঙ্গে দেয় বৈজ্যতিক প্রক্রিয়ার পচন নিবায়ক  
সুন্দর সুদৃশ্য আধুনিক আসবাবে রক্ষিত চারদিনের বাসি বাতিল স্বাদহীন  
সন্দেশ রসগোল্লা ।

চুলের গোছা আলগা করে দিতে দিতে সুন্দরী বলে, খাও না ভাই, খেয়ে  
খাও না ? যেমন দিতে বলেছে, তেমনি দিয়েছি । গিয়ে তুমি বলবে জানি  
পচা খাবার দিয়েছি—বললে 'আর করব কি বল ভাই ! খেতে দিয়েছি,  
খেয়েছো, ঐটুকু যেন বলো সত্যি রাখতে !

গরম চা-টাই শুধু সে খায়। মনে ভেসে আসে এলোমেলো শোনা কথা।  
ছেলেবেলায় শোনা রূপকথার মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছাড়া ছাড়া কাহিনী।

বাদামশাই ছিল জমিদার।

একটি স্তন্দরী যুবতী মেয়েকে নিয়ে তার যুদ্ধ বেধেছিল পাশাপাশি আরেক  
জমিদারের সঙ্গে।

পচা মজা ময়না দীঘি কার এলাকায় তাই নিয়েও হুজনের মামলা চলেছিল  
দীর্ঘকাল ধরে।

ওই দীঘির জলে একদিন আকাশে সূর্য উঠে পড়ার আগেকার আলোয়  
ভাসতে দেখা গিয়েছিল ওই যুবতী মেয়েটির মৃতদেহ।

অল্প কিছুক্ষণের জন্তু দেখা গিয়েছিল, দু'চারজন মোটে দেখেছিল।  
তারপরেই নাকি লাস গিয়েছিল উধাও হয়ে, প্রমাণ হয়েছিল কেউ দীঘির ঘাটে  
লাস ভাসতে ছাধেনি! দীঘির ঘাটে একটি কচি বয়সের বোয়ের লাস ভাসছে  
দেখার জন্তুই নাকি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল হারান চক্রবর্তী আর বঙ্কিমেশ্বর  
চাটুয্যের ঘর বাড়ী।

পুড়ে নাকি মরেছিল হারান চক্রবর্তী সপরিবারে। বঙ্কিমেশ্বর নাকি  
বেঁচে গিয়েছিল বিদেশে থাকার দরুন।

কে জানে কি সব ব্যাপার হয়েছিল। খুব বেশী প্রাচীন ইতিহাস নয়,  
চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, তার নিজের বাপের জীবনান্তের ইতিহাস।

বড় মামা ছোট জমিদারীর মায়া কাটিয়ে ব্যবসায়ে নামে। সাধারণ  
নারকেল তেলে দু'চার ফোঁটা বিদেশী স্নগন্ধের এসেন্স মিশিয়ে বোতল ভরে  
লেবেল এঁটে আর বিজ্ঞাপন দিয়ে সে নাকি প্রজা ঠেকিয়ে জমিদারী থেকে  
যত আয় হয় তার তিনগুণ আয়ের ব্যবস্থা করেছিল।

মাদ্রাজীরা নারকেল তেল খায়। বাঙালীর মেয়েরা নারকেল তেল দিয়ে  
চুল বাঁধে। মুদী দোকানের মর্চে ধরা টিন থেকে ময়লা মেশান খানিক তেল  
এনে এনে মহাসমারোহে চুল বাঁধে।

সামাজ্য একটু রঙ আর গন্ধের ব্যবস্থা করে স্কুলের শিশুতে ভরে লাগসই একটা নাম দিয়ে দশগুণ দামে বিক্রি করা হয়।

বড় বড় টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীরা নাকি শত্রু হয়ে কম্পিটিসনে নেমে বড় মামাকে সাবাড় করেছিল।

বড় মামা কোথায় গেছে কোথায় আছে কি করছে কেউ নাকি আর জানতে পারে নি তারপর থেকে।

মেজমামা ভান্সা সংসার চালাত। মদ নয়—টিন টিন সিগারেট খেত। এক বিশেষ ধরনের সিগারেট।

চশমার পাওয়ার বাড়িয়ে বাড়িয়ে অন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।

শুকিয়ে নাকি কাঠিও হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার নাকি বলেছিল, ওই বিশেষ মার্কার সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ একদিন মরে গিয়ে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়েছিল।

আর ছোটমামা ভবানী আজ দশ বছর তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। সে বাড়ীতে এলে ছোটমামী ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে থাকে !

দোষ হয়তো সরমার নেই, বেচারীর শরীর খারাপ, মাথা ঘোরা লেগেই আছে। তবু এইসব কথা ভাবতে ভাবতে কীভাবে যেন মাথাটা বিগড়ে যায় সমরেশের। মূল্যবোধ পাণ্টে যায়, হিসাব নিকাশ উণ্টে যায়।

মন স্থির করে নিয়ে সোজা সরমার শোয়ার ঘরে যায়, পা ধরে নেড়া দিয়ে ডাকে, মামী, বালিশ থেকে মাথা তোল।

সরমা ঘুমোয় নি। শরীর খারাপ হলে দিনে রাত্রে ঘণ্টাখানেকও তার খাঁটি ঘুম হয় কিনা সন্দেহ। আধা ঘুম জাগা অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে শুধু ঝিমিয়ে যায়।

উঠে বসে চোখ টান টান করে চেয়ে সরমা বলে, আঃ, তোরাই আমাকে

মারবি। হারামজাদি মাগীরা খেতে দেয় নি তোকে? বড় বড় বেড়েছে, সব কটাকে আজ তাড়াব।

মরিয়া সমরেশ হেসে বলে, খেতে দিয়েছে। তোমায় প্রণাম করব কি না, তাই বলছিলাম বালিশ থেকে মাথাটা তোল। শোয়া মানুষকে তো প্রণাম করতে নেই।

: ও বাবা, তুই এ সব জানিস? আবাব মানিসও?

বালিশের তলা থেকে ছোট একটা শিশি বার করে একটা বড়ি নিয়ে খাটের শিয়রের পাশে বসানো টিপয়ে রাখা কাঁচের কুজো থেকে খেত পাখরের গেলাসে জল ঢেলে বড়িটা খেয়ে সরমা বলে, আজ হঠাৎ প্রণাম কেন রে?

মরিয়া সমরেশ তার পা চেপে ধরে হাসি পাণ্টে কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলে, আমায় বাঁচাও মামীমা। এত বড় সংসার, এত বড় কারবার ঘাড়ে চাপিয়ে বাবা মরে গেছে—আমি সামলাতে পারছি না। বুনো দাছ সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছে।

মনে মনে ঠিক করে ভেবেছিল অভিনয় করে কায়দা করে বলবে—বনমালীর শেখানো কোশলটা খাটাবে। রাগ দুঃখ অভিমান হতাশায় এতই জর্জরিত হয়েছিল প্রাণটা যে ছেলেমানুষি চালাকি বুদ্ধি তলিয়ে গিয়ে কীভাবে সব যেন জড়িয়ে গেল।

সত্যি সত্যি হাউ হাউ করে কঁদে ফেলল সমরেশ। চোখের জলে বুক তার ভেসে গেল।

বড়ি গিললেই তো সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রিয়া এগিয়ে যায় না। ক্রিয়া স্তব্ধ হয়েছে, ঝিমানোভাব কেটে আসছে, তবু সরমার বুঝতে খানিকক্ষণ সময় লাগে যে স্বপ্ন দেখছে না সিনেমা দেখছে না সত্যি সমরেশকে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে দেখছে।

সমরেশের কান্না শেষ হবার পর সে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে নড়ে চড়ে বসে

বলে, কঁাঁসি নে। আমি কারো কান্না সহ্যে পারিনি। কিয়ের বলছিলি তুই ?

কান্নার ফুঁপিয়ে উঠে সমরেশ বলে, শোন মি ? আর আসব না তোমার কাছে। কিছুই শোননি ? কাল পরন্তু এসে তোমার এই খাটে বসে ব্রেড দিয়ে আটারি কেটে স্নাইসাইড করব।

বড়ির ক্রিয়া শুরু হলে চটপট চড়ে যায়।

সরমা তার হাত ধরে কাছে টেনে হেসে বলে, বেশ তো, স্নাইসাইড করিস। আমায় ডাকিস, আমরা এক সঙ্গে স্নাইসাইড করব। এখন এক কাজ কর দিকি, চোখ মুখ ধুয়ে আয় তো গিয়ে। ঠাণ্ডা ট্যাপের জল দিয়ে ধুস কিন্তু !

কান্নার চিহ্ন জলে ধুয়ে ফেলার সঙ্গে লজ্জাও খানিকটা কমিয়ে নেবার চেষ্টা করায় চান-ঘরে সমরেশের একটু দেৱী হল।

ইতিমধ্যে বেল টিপে সরমা স্নন্দরীকে ডাকিয়েছে।

স্নন্দরী ঘরে ঢুকেই বলে, আমার দোষ নেই মা, বিমলা সাক্ষী আছে। খেতে দিয়ে সেধেছি, ঘরে এসে তোমার ঘুম ভাঙাতে বারণ করেছি—

সরমা যেন ঘা খাওয়া এশ্রাজের তারগুলির মত বন্ বন্ করে ওঠে, তুই থাম দিকি স্নন্দরি। বাড়াবাড়ি করিস বলেই তো তোদের জিভ কেটে তাড়িয়ে দিতে সাধ যায়। সারাদিন তোদের খালি মিছে কথা—খালি মিছে কথা !

: মিছে যদি বলে থাকি মা—

: চূপ কর। খেতে দিয়ে সাধবি তবু মাহুষ খাবে না—তার মানে তুই সাধতেই জানিস নে। যা, খাবার সাজিয়ে আনগে চটপট।

ঝিমিয়ে নেতিয়ে বিছানায় কাত হয়ে পড়েছিল ছোটমামী—হুটো কথা বলতেও খানিক আগে তার ছিল কত আলস্য। তার মুখ দিয়ে এখন যেন কথার খই ফুটেছে।

সমরেশকে খাওয়াতে খাওয়াতে সে অনর্গল কথা বলে যায়। কথার কঁকে কঁকে সেধে যায়—এটা খা, ওটা খা।

: আর কত খাব ছোটমামী? পকেটে করে বরং নিয়ে যাই, আবার খিদে পেলো খাব। টাকার কথাটা বল?

: তুই সত্যি বোকা হাবা, নইলে বাপ মরতেই অমন কারবারটা ডুবতে বসে? টাকার কথা কি বলব তোকে? টাকার মালিকের সঙ্গে আগে কথা বলি, তোর মামা কি বলে শুনি, তবে তো তোকে বলব।

: তোমার বুঝি হাত নেই?

সরমা হেসে বলে, কি যে করব তোকে নিয়ে! টাকার ব্যাপারে মেয়েমানুষের হাত থাকে?

এবার খানিকটা অভিনয়ের সুরে আন্নার জানিয়ে সমরেশ বলে, চেষ্টা করবে তো?

সরমা বলে, চেষ্টা করব না? যতক্ষণ রাজী না হয় তোর মামাকে রেহাই দেব ভেবেছিস? সারারাত ঘুমোতে দেব না। কবে তোর বাপের সঙ্গে কি হয়েছিল, মাঝুঘটা মরে গেছে, আজও তার জের টানা কেন রে বাবা! এবার মিটিয়ে দিলেই হয়। বিয়ের পর থেকে শুনে আসছি আমার এক ননদ আছে, মন্ত বড়লোকের গিন্নি। আজ পর্যন্ত ননদকে চোখে দেখলাম না। এবার মিটমাট করিয়ে দেব—একদিন গিয়ে হাজির হব তোদের বাড়ীতে।

সরমা নিজে তোয়ালে দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দেয়। খাটে পাশে বসিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে গালে গাল রেখে স্নেহসিক্ত গলায় বলে, কাল এই টাইমে আসিস। টাকার ব্যাপার, হবে কি না জানি না। তবু আসিস। নগদ না পারি, চেক হয়তো আদায় করে রাখতে পারব তোর জন্ত।

পরদিন অসময়ে সমরেশের মামাবাড়ী গিয়ে জানবার দরকার হয় না খবরটা যে তার স্নেহময়ী মামী টাকার ব্যবস্থা করতে পেরেছে কিনা।

সকালে ভবানীর গাড়ী এসে দাঁড়ায় তাদের বাড়ীর সামনে।

দশ বছর পরে ভবানী আজ মহিমের বাড়ীর সম্মুখ দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢোকে।

বাড়ীর ভেতরে যায় না। বাইরের ঘরে বসে সব রকম আদর অভ্যর্থনার চেষ্টা অল্পে বিনাশ করে শুধু কল্যাণী আর বনমালীকে ডাকিয়ে এনে কথা বলে।

কিছু শোনে না। শুধু কথা বলে।

সব কথা বলে কল্যাণীকে। বনমালীকে ডাকিয়ে আনাগোড় তার দিকে একরকম ফিরেও তাকায় না।

কল্যাণী ভয়ে ভয়ে শুধু বলতে গিয়েছিল, ভেতরে গিয়ে বসে, একটু চা-টা খেয়ে—

কথা শেষ করতে না দিয়েই ভবানী ভূমিকা স্তব্ধ করেছিল : ওসব টুকিটাকি কথা তুলোনা দিদি, আমার সময় নেই। আমি যে এলাম, তার মানেই হল অ্যাদিনের ঝগড়া বাদ দিয়েছি। মাল্টিমার্স মারা গেছে, তোমাদের সঙ্গে আর কিসের বিবাদ? কিন্তু হঠাৎ গলাগলি ভাব করতে পারব না।

কেউ কথা বলে না। কল্যাণী কেবল নড়ে চড়ে বসে।

ভবানী মৃদুস্বরে প্রতিটি কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলে, তোমরা চলেছিলে একদিকে, আমি চলে গিয়েছি আরেক দিকে। আর কি আমাদের খাপ খান্ন? ছেলেকে পাঠিয়ে পাঠিয়ে আমার সঙ্গে খাতির রাখার চেষ্টা করা তোমার উচিত হয়নি দিদি।

দিদি! কল্যাণীকে-ভবানী আজ দিদি বলেছে!

: যাক্ গে। কাজের কথা বলি। আমি সব জানি। টাকা চলে তোমাদের কারবার সামলানো যাবে না।

বনমালী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার একটু জোর দিয়েই বলতে যায়, আমি যে প্ল্যান করেছি—

: তোমার প্রাণে কাজ হবে না। তোমার মগজের প্রাণ জেঁমাল মগজের  
মাকড়সাদের পেটে যাবে।

: আরেকটা যুদ্ধ বাধা পর্যন্ত আমি কোনরকমে—

: আরেকটা যুদ্ধ বাধবে কিনা কিছুই ঠিক নেই। যদি বা যুদ্ধ বাধে, সে  
পর্যন্ত টানতে পারবে না।

বনমালী চুপ করে থাকে।

কল্যাণী বলে, উনি নেই। তুই যদি সামলাতে পারিস ভেবেই সমুদ্রে  
পাঠিয়েছিলাম।

কল্যাণী ভেবে চিন্তে সমরেশকে তার কাছে পাঠিয়েছিল!

বনমালী নীরবে এক টিপ নস্ট নেয়।

ভবানী বলে, এ কারবার বাঁচাতে চেষ্টা করাই বোকামি। বনমালী কাদের  
সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে তোমরা জান না। বিজ্ঞেসে কি এরকম পাপলাটে  
একগুঁয়েমি চলে? জেনেওনে কারবারের পিছনে আমি এক পরস  
ঢালব না।

: তবে উপায় কি হবে?

ভবানী সোজা হয়ে বসে সিগার ধরিয়ে বলে, উপায় আমি করে দিতে  
পারি—কিন্তু তোমরা কি তা মানবে? এ কারবার বাদ দাও। হাজারটা  
ফুটো হয়েছে, ইঁহুরে খেয়ে শেষ করেছে, এ নৌকা আর কি চালানো যায়?  
এ কারবার বাতিল করে দাও। মাদ্রাজে আমি একটা ব্র্যাঞ্চ খুলছি—সমুদ্রে  
ভার দেব, বনমালীকে ও অ্যাসিস্ট করবে।

ভবানী মুখ বাঁকিয়ে হাসে, ব্র্যাঞ্চটা ডুববে জানি—রাই হোক, সমুদ্র হাতে-  
নাতে একটু শিক্কা হবে।

কল্যাণীও মুখ বাঁকিয়ে বলে, যা ভাল বুকিস তাই কর। আর তেঁা কোন  
উপায় নেই!



## তিন

সকালে উঠে বনমালী কাতরভাবে বলে আমার একটু আদা-চা করে দেবে? সারারাত কেসেছি, কি করে বেরোব ভাবছি। না বেরোলেও উশায় নেই আঙ্গ!

কল্যাণী বলে, আদা নেই আনতে হবে।

বনমালী বলে, একটু বেশ কড়ারকম চা-ই দাও। বড় গেলাসটা ভরে দিও।

কল্যাণী যেন শুনেও শুনতে পায় না। ভাল সম্ভার দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্ভারের ঝাঁঝে কাসতে কাসতে বেদম হয়ে কি বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায় কল্যাণী বুঝতে পারে না।

সারাদিন বাইরে কাটিয়ে রাত্রে আরও বেশী বেদম হয়ে বনমালী ফিরে আসে। সকালে তার ছিল সকাতির ভাব, এখন তার মেজাজটা কিন্তু বেশ উজ্জ্বল মনে হয়।

আদা-চা আদায় করে ছাড়ে!

চা খেতে খেতে কল্যাণীকে সে বলে, তোমার ভায়ের মতলব টের পেয়েছি বোমা। এতকাল তলে তলে শক্ততা করেছে, এবার একেবারে কঁাসাতে চায়।

কল্যাণী বলে, একটা ব্যবস্থা করবে বলে, সমুদ্র একটা গতি করে দেবে—

: গতি করে দিচ্ছে! ওর মাথা ধারণ হয়েছে কিনা তাই মাত্রাজে ত্রাক খুলে ছেলেমানুষ সমুদ্রে তার দেবে!

: আপনিও থাকবেন।

: আমি? ওটাই তো ওর আসল মতলব। কারবার বাড়িল করায়

মানে জানো বোমা ? সব দায় আমার, সব দায়িত্ব আমার—কারবার বাতিল করলেই আমার গতি হবে জেলখানায়। তোমাদের হয়ে যাবে ভরাডুবি। সেটাই ও চায়। আমি ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে সামলে স্তমলে চালিয়ে যাচ্ছি—এটা ওর সঙ্কল্প হচ্ছে না।

কল্যাণী বলে, কি জানি, আমি কি অত সব বুঝি ? কিন্তু আপনিই বা এভাবে কতদিন চালাবেন ?

বনমালী জোর দিয়ে বলে, যতদিন পারি চালাব, ও পাষাণকে মতলব হাসিল করতে দেব না। হয় তো কিছু একটা লেগেও যেতে পারে, সব ঠিক হয়ে যেতে পারে।

একটু ধেমে কয়েকবার কেসে সে আবার বলে, যুদ্ধের কথা অনেকে বলেছে। টুকটাক যুদ্ধ তো চলছেই এখানে ওখানে, আমেরিকা ওং পেতে আছে—কে বলতে পারে কি হয় ?

ভবানী সত্যি হাল ধরতে চেয়েছিল। নিজের পদ্ধতিতে চেয়েছিল, গায়ের ঝাল ঝাড়বার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না।

ওদিকে রামনাথ মরে ভূত হয়ে গেছে। এদিকে সরমা মরিয়া হয়ে আত্মার ধরেছে যে ননদের সংসারটা সামলে দিতে হবে, সে একটু ভাবসাব করবে ওদের সঙ্গে—স্বপ্নরবাড়ীর মানুষকে না দেখেই এতকাল তার জীবন গেল।

শুধু তাই নয়। এখন কল্যাণী শুধু সমুকে পাঠিয়ে সরমার মারফতে তার কাছে আত্মার জানিয়েছে—কারবারটা ফেসে গেলে ভয়ঙ্কর দুর্ববস্থায় পড়ে দলবল নিয়ে নিজে এসে ঘাড়ে চাপবার জন্তু কি ভাবে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে কে জানে।

তার চেয়ে নানা কৌশলে খানিকটা সামলে স্তমলে ওদের একটা মোটামোট ব্যবস্থা করে দেওয়াই ভাল।

সেকেলে হোক, ব্যবসার ব্যাপারে বড় খাতিয়া রাখা বনমালীর। শুকে একটু কট্টোল করে লাগালে মাতাজের ব্রাঞ্চটার পরিকল্পনা হয় তো আশাতীত রেকর্ড দেবে।

শুধু তাই নয়। মহিম একদিন তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছিল, জগৎ-সংসার জানবে যে সেই মহিমের সংসারের দায়টা সে উদারভাবে মেনে নিয়েছে।

সে ভাবতেও পারে নি বুড়ো বনমালী এরকম মরিয়া একগুঁয়ে হয়ে তার বিরুদ্ধে কথোপকথন দাঁড়াবে।

মহিমের তিন জামাই কারবারের অবস্থা বুঝতে গেলে বনমালী তাদের খাতির করে চা সন্দেশ খাইয়ে সব কিছু দেখা শোনা জানা বোঝার সুযোগ দিয়েছিল।

ভবানী ব্যাপার বুঝতে যেতেই সে গভীর সুরে বলে, কারবারের ব্যাপারে তোমার কিছু করতে হবে না ভবানী। যে টাকাটা চেয়েছি দিতে চাইলে দাও, লিখে নেব। তার বেশী তোমার কিছু করার নেই, করতে হবে না।

ভবানী বলে, তুমি তো পাগল বনমালী। সবাইকে ডুবিয়ে চিতায় উঠতে চাও। ওসব ভাবের কথায় কাজ নেই, আমি যদি জোর করে নাহি, তুমি আমায় ঠেকাতে পারবে?

: পারব। এ কারবার আমার।

বনমালী ভ্রমার খুলে দলিলটা বার করে সামনে ফেলে দেয়।

মনোযোগ দিয়ে আগাগোড়া দলিলটা পড়ে ভবানী একটু হেসে বলে, এ দলিলও কিন্তু আমি বাতিল করে দিতে পারি। সেই সঙ্গে তোমার জেলে দিতে পারি।

: পারবে না।

: পারি। কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক, ওরা তোমায় আঁকড়ে আছে। তোমায় একটু জব্দ করার জন্তু অত হাদ্যমা করা আমার পোষাবে না।

উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দিদি নিজে ভাঙেজায়ীগুলিকে নিয়ে আসে, তোমায় বদলে আমায় আঁকড়ে ধরতে চায়, তোমায় আমি জেল খাটাব, রাস্তার জিক্স করতে করতে কুকুর বেরালের মত রাস্তাতেই যাতে মরে পচে যাও তার ব্যবস্থা করব।

চিন্তার জাবর কাটিতে ভাল লাগে না সময়শের। ঠেকে গেলে থেমে গেলে সে তাই পুরানো অভ্যস্ত চিন্তার আশ্রয় খোঁজে না।

বেরিষে পড়ে।

কোথায় যাবে কি করবে কিছু ঠিক না করেই।

কোথাও যাবে তো নিশ্চয়! মাসুকের নিজের গড়া পৃথিবীর পিঠে এই বিচিত্র জীবন জগতের কোথাও।

কাক সোজা উড়ে যায়—কোথায় থাও আছে। সেও যেন ঠ্রামে বাসে পয়সা খরচ করে সোজা গিয়ে হাজির হয় নন্দিতাদের বাড়ীতে।

উদ্বেগহীন ভাবে বেরিয়ে তার মনে পড়ে যায়, নন্দিতা তাকে বড় ভালবাসত!

স্নেহের বাঁধনে বেঁধে তাকে সংঘত সাধারণ কিশোর করার জন্ত কি ব্যাকুলতা ছিল নন্দিতার, কী অধ্যবসায় ছিল।

মুখে কোনদিন কিছু বলে নি। কাজে চেষ্টা করে দেখিয়েছে।

সত্য কথা বলতে কি, প্রথম পরিচয়ের দিন বড়ই আধুনিক মনে হয়েছিল নন্দিতাকে।

সেই আঁক-কিশোর বয়সেই সাধারণ কাপড় জামা, সাধারণ প্রসাধন, পায়ে সাধারণ লপেটা জাতীয় মেয়েলী স্টাণ্ডাল, হাতে একগাছি করে সরু লিকলিকে সাধারণ সোনার চুড়ি—তবু সময়শের মনে হয়েছিল সে যেন আধুনিকতম রূপসজ্জার মূর্তিমতী প্রতীক।

সোজা হয়ে সহজভাবে দাঁড়িয়ে সমরেশের সঙ্গে সোজা-সুজি অন্তরঙ্গ তামাসা জুড়ে প্রথম পরিচয়ের আলাপ শুরু করেছিল—অজেরও কোন ভঙ্গি করেনি, কথারও কোন মারপ্যাচ চালায়নি।

তবু সমরেশের মনে হয়েছিল, সর্বদে সে যেন অবিরাম একটা হিলোল খেলিয়ে চলেছে, কথা বেন বলছে অভিনয় চরমে তোলা পর্দার সেরা তারকার ছায়ামূর্তির মত।

মনে হয়েছিল নিছক একটা ধাঁধা।

অনেক বছর কেটে গেছে তারপর। নিজের রহস্যবোধের ঝাঁকির হিসাবে নন্দিতা রহস্যময়ী কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার সাধ আর ইচ্ছা দুই-ই শেষ হয়ে গেছে, বহুবার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে নন্দিতার সঙ্গে।

ক্রমে ক্রমে সে বুঝতে পেরেছে যে নন্দিতা মোটেই ধাঁধা নয়। তার নিজেরই গঁগো মনের ধাঁধায় ওকে তার ধাঁধার মত মনে হয়েছিল।

অল্প বয়স থেকে পড়া কোন উপস্থাসের কোন নায়িকার সঙ্গে নন্দিতাকে মেলাতে পারেনি বলে তার ধাঁধা লেগেছিল।

এতকাল ধরতে পারেনি। সেদিন প্রথম জেনেছিল নায়ক নায়িকার চরিত্রের সাধারণ দিকগুলি উদ্ভট ও অস্বাভাবিক করে তোলার জন্য কি অকারণ ঝন্ঝাট আর হুশিঙ্কা সাধারণ বইগুলিতে।

প্রথম দর্শনে প্রেমের ধারা আজও তবে বজায় আছে উপস্থাসে? কী অন্তত খাপছাড়া ব্যাপার।

তাই বটে। ঠিক। অনেকের সঙ্গেই নন্দিতার পরিচয় গড়ে তুলতে হয়। উপস্থাসের পরিচ্ছদের পর পরিচ্ছদে গড়ে তোলার পর দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মাহুকের সঙ্গে পরিচয় গড়ে তোলা তার পোষাবে কেন?

মাহুকের সঙ্গে মাহুকের পরিচয় সোজা সরল ব্যাপার। কি দরকার তার মধ্যে হাজার রকম প্যাচ রেখে?

তবে, তাকে নিয়ে নন্দিতার রহস্যের পরিহাসের মাধ্যমে প্রথম পরিচয়ের

বন্ধুটি হাক্ক করে মিটিয়ে দেবার চেষ্টায় যে কৃত্রিমতা ছিল যান্ত্রিকতা ছিল—  
সেটাও খেয়াল করেছিল সমরেশ। নন্দিতার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হওয়া  
পর্যন্ত কম অস্বস্তি ভোগ করেনি।

দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল নন্দিতাদের বাড়ীতেই, এক বিয়ের নিমন্ত্রণ  
রাখতে গিয়ে।

আশ্রিতা গৌরী এবং নিজের আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তুষার  
তাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। নগদ টাকা মোটের উপর কম আনে নি।  
ছোটখাট একটা বাড়ী কিনে কিছা ছ'চার কাঠা জমি কিনে নিজের একটা  
বাড়ী তুলে নন্দিতাদের রেহাই দিয়ে চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট টাকা।

তারপর যা হয় দেখা যাবে।

গৌরীর সঙ্গে বিষম ভাব জমাতে জমাতে কি ভাবে তুষারের মনটাও  
নন্দিতার বাবা আনন্দ নতুনভাবে গলিয়ে দিয়েছিল কেউ টের পায় নি।  
ভিটে-মাটির চিন্তা ছেড়ে সে আনন্দের সঙ্গে নেমে পড়েছিল নগদ টাকাটা  
খাটিয়ে আরও কিছু টাকা কামাবার চেষ্টায়।

গৌরীর সঙ্গে বিষম ভাবের পরিণাম এবং আনন্দের সঙ্গে সর্বস্ব নিয়ে এই  
বাজারে ব্যবসাতে নামার বিপদের দিকটা খেয়াল থাকে নি।

সর্বস্ব পণ করা ব্যবসার ফলাফল কি হবে না হবে কে জানে। এদিকে  
গৌরী হঠাৎ পড়ে গেছে মুন্সিলে।

সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কিছু নয়। কতই তো ঘটছে। কত উপস্থাসে একই  
ঘটনা কত রকম ভাবে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে যে রূপায়িত করা হয়েছে তার  
ঠিক ঠিকানা নেই।

আগে জানা ছিল না, সমরেশ পরে জেনেছিল যে নন্দিতার জন্মই বিয়েটা  
সম্ভব হয়েছিল।

তুষার করতে চেয়েছিল অল্প ব্যবস্থা এবং আনন্দের সাহায্যে ব্যবস্থাটা  
প্রায় পাকাপাকি করেও এনেছিল।

গৌরীর দর্শন রক্ষা হয়ে যেত ।

নন্দিতা তা হতে দেয় নি ।

তুয়ারকে এবং নিজের বাপকে ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল ।

প্রথম বয়সে সমরেশ ভাবত, এটা বোধ হয় নন্দিতার একেলেপনার একটা নিদর্শন । নাটকীয় কিছু করার ঝোঁকের ব্যাপার ।

পরে সে জেনেছে যে ওই বয়সেও নন্দিতা ওয়কম শক্ত মেয়েই ছিল—পুরুষের অস্থায়ী মানতে হলে সে ক্লেপে যেত ।

তারপর কোথায় গিয়েছে সেই তুয়ারেরা, কোন শূঁতে মিশে গিয়েছে আনন্দের সঙ্গে ব্যবসা করে তার বড়লোক হবার স্বপ্ন ।

বস্তার জলের সঙ্গে পুকুরের জল ভেসে যাওয়ার মত তার মোটা পুঁজির সঙ্গে মারা গিয়েছিল আনন্দের সামান্য সম্পদ ।

কয়েক বছর গুমরে গুমরে কষ্টকর জীবনটা টেনে আনন্দ মারা গিয়েছিল । নন্দিতা কেঁদেছিল ।

কিন্তু মৃত বাপের সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছিল আজও সমরেশের মনে আছে—জানতাম মরবে, এতটুকু মনের জোর ছিল না, তুলতুলে নরম মাহুঘ, মেয়েমাহুঘেরও অধম ।

সহজ সরল স্পষ্ট সুস্থ আত্মপ্রত্যয়ী চালাক-চতুর আর শক্ত মেয়ে বলে তার বিব্রম ঘটে গিয়েছিল ।

সে ধরতে পারে নি যে নন্দিতার মধ্যে নাটকীয় কিছুই নেই—না তার বেশভূষায়, না তার চাল-চলনে ।

সে শুধু নিজেকে সাধারণ স্বাভাবিক করে নিয়েছে । উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাকে পুরুষ মালিকের মন জুগিয়ে চলতে হবে, এ বিশ্বাস উপড়ে

ফেলে দিয়েছে। সে জেনে গিয়েছে যে জগতের কোন পুরুষের চেয়ে সে নীচ নয়, দুর্বল নয়, হেয় নয়।

পুরুষ জাতটাকে সে ঘৃণা করে, রাজা সম্রাট গুণ্ডা জাতীয় জীব বলে মনে করে।

সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে যে ফুরিয়ে গেছে রাজা সম্রাট গুণ্ডাদের মেয়ে নিয়ে রানীগিরি বৌ-গিরি বেশা-গিরি চালানোর দিন!

মাহুষের জাতের হিসাবে কে মেয়েমাহুষ, এইটুকু মেনে নেওয়ার বেশী কোন মেয়েলিপনার বালাই তার নেই। সকলের সঙ্গেই তার এমন সহজ সরল স্পষ্ট ব্যবহার যে প্রথম প্রথম সমরেশের বার বার খটকা লাগত যে এটা নন্দিতার কোন বিকারের লক্ষণ না বাহাদুরী।

ব্যাপারটা বুঝতে সময় লেগেছে অনেক দিন। তারপর সমরেশ টের পেয়েছে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে বিচার বিবেচনা করে নন্দিতা মাহুষের সঙ্গে মেলামেশার এই কায়দাটা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল, সম্ভ্রমে নীতিটা পালন করে চলতে চলতে এখন সেটা প্রায় ধাত দাঁড়িয়ে গেছে, স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

নইলে মেলে না, মানে হয় না। এমন ধারালো বুদ্ধি যার, বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে যার শক্তি হওয়ার রকম দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়, হাবাগোবা মেয়ের সরলতা নিশ্চয় তার পক্ষে স্বাভাবিক!

বিকার বা বাহাদুরীও নয়। কারণ, তার সহজ স্বচ্ছ সরলতায় কখনো ছেদ পড়ে না, ব্যতিক্রম ঘটে না।

বহুদিন ধরে নন্দিতার চরিত্রের এসব বিচার বিশ্লেষণ চলছিল মনে মনে, একদিন ঘটনাচক্রে রাত প্রায় দশটার সময় নন্দিতাকে শূন্য ঘরে একা পেয়ে তার সরলতা নকল করেই সে যেন নিজের চিন্তাগুলি তার কাছে পেশ করে দিয়েছিল।

নন্দিতা বলেছিল, ও বাবা, আমায় নিয়ে তোমার দিবাবাত্রি এত চিন্তা-



ভাবনা! এ তো ভাল কথা নয়! সাবধান, শিখিলে গিয়ে ভাবের রসে ডুবে  
বেগুনা মুকিলে পড়বে। আমি বরসে বড়, কান মলে দেব।

সমরেশও হেসে বলেছিল, তোমায় নিয়ে ভাবের রস? তোমার রসকব  
আছে নাকি?

: আছে। তবে খুব ঘন রস—প্রায় দানা বাঁধা। তোমার কাঁচা প্রাণে  
সইবে না।

: তোমায় কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে।

: ভাল লাগতে দোষ কি? ভাল লাগাটা ভালবাসা হয়ে উঠতে দিও না,  
তাহলেই মুকিলে পড়বে। হৃদিক দিয়ে মুকিল—তোমার ভালবাসা আমি যদি  
মেনে নিই তাহলেও মুকিল—মেনে না নিলেও মুকিল।

: কি রকম?

: রকম বড় সাংঘাতিক। ধরো আমার লোভ ছাগল, সাধ হল যে কচি  
ছেলেটার সরল খাঁটি ভালবাসা একটু চেখে দেখি—ভালবাসা মেনে নিলাম।  
এই পাকা বুড়ীর সঙ্গে ভালবাসার কারবার চালাতে গিয়ে দু’দিনেই তুমি  
ছিবড়ে বনে যাবে! আমায় ছেড়ে রেহাই নিলেও সারাটা জীবন নীরস  
শুকনো হয়ে থাকবে। আর আমি যদি কান মলে দিই, তোমার একটা  
বিকার জন্মে যাবে, মেয়ে জাতটার ওপরেই চিরকাল বিতৃষ্ণা বোধ করবে।

সমরেশ একটু হেসে বলেছিল, তোমার হিসেব আগাগোড়া ভুল। আমরা  
ব্যাটাছেলেরা ভালবাসার খাতিরে মরতেও রাজী হই। সত্যি যদি তোমায়  
ভালবাসি—মুকিলের ভয়ে তোমায় রেহাই দেব ভেবেছ? দু’দিনে  
আমায় ছিবড়ে করে দেবে জেনেও তোমায় পাওয়ার জন্য প্রাণপণে লড়াই  
করব।

নন্দিতা হেসে বলেছিলেন, এসব কলেজে শুনে শেখা কথা।

বাপের চেয়েও বনমালীর অভাবটা সমরেশের বেশী হাড়ে হাড়ে টের শায়।

দায় হাড়ে নিয়ে ছ'বছরেই প্রাণ থেকে রসকষ সব যেন শুকিয়ে গেছে।  
জ্ঞাকামি, ছেলেমানুষী তো কবেই ঝরে গিয়েছিল, এবার শুকিয়ে যাচ্ছে  
দেহমন। এখন মেরুদণ্ডটা না বঁকে যায়।

মট করে না ভেঙ্গে যায়।

সাত ভাই চম্পার একটি বোন ছিল পারুল। বোন ডাক দিলেই সাত  
ভাই ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে সাড়া দিত। মা আরেকটি বোন বিয়েতে পারলেই  
সে হয়ে যেতে পারত সাত বোনের এক ভাই সমরেশ।

সাত বোন ডাকাডাকি করলে এক ভাই তাকেই কি ঘুম ভেঙ্গে জেগে  
জেগে সাড়া দিতে হত?

তাই তো মনে হয় ব্যাপার দেখে।

চার বোনের বিয়ে মহিম চুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, অভাবের কষ্ট  
কোনদিন সহিতে হবে না এরকম পরিবার এবং পাত্র দেখেই অনেক টাকা  
খরচপত্র করে বিয়ে দিয়েছিল।

সুখে হোক দুঃখে হোক ছ'বোন স্বামীপুত্রের সংসারে খেয়ে পরে বেঁচে  
বর্তে আছে। মাঝে মাঝে কারণে অকারণে দিদিদের কিছা ভগ্নাপতিদের  
চিঠিপত্রে সেটা জানা যায়।

বিবাহিতা তিন নম্বর বোনটিকে তার স্বামী বিরাম ত্যাগ করেছে। কিছা  
হয়তো তার বোন সত্যিই ত্যাগ করে এসেছে বিরামকে।

ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করতে পারে না সমরেশ।

মহিম বেঁচে থাকার সময় বুঝবার কোন চেষ্টাই করেনি, দরকার ছিল না।  
গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়ে প্রীতিকে এক কাপড়ে বাপের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে  
দিয়ে গিয়েছে শুনে রেগে টং হয়ে গিয়েছিল।

পণ ধরেছিল, বিরামকে সে চাবকে আধমারা করে দিয়ে আসবে—  
একেবারে মারবে না।

প্রীতিকে একেবারে বিধবা করবে না।

মহিম বুঝিয়ে ধমক দিয়ে রাগারাগি করে অস্থির হয়ে তাকে ঠেকাতে পারত কিনা সন্দেহ।

মা তার গালে কষিয়ে দিয়েছিল একটা চড়। খুব জোরেই চড়টা মেরেছিল। মা'র মশলা-বাটা, বাসন-মাজা কড়া পড়া হাতের চড়ে গালটা যেন জলে পুড়ে ফেটে গিয়েছিল সমরেশের।

ছেলেবেলা মায়ের চড় খেয়েছিল কিনা মনে নেই। এত বয়সে সজ্ঞানে মার প্রচণ্ড চপেটাঘাতে নিজের বোনের বিস্ত্রী অপমানের প্রতিশোধ চাবুক মেরে উত্তুল করার ঝোঁকটা বিগড়ে গিয়েছিল।

তিনদিন বাড়ী থাকে নি।

আত্মীয় স্বজন কারো বাড়ী যায় নি।

বেলা আটটা নাগাদ মায়ের হাতের চড় খেয়ে রাজি দশটা নাগাদ এদিক ওদিক পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে, এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে বসে বিশ্রাম করে, পকেটের গণ্ডাচারেক পয়সায় দুটো চায়ের দোকানে ছ'বার চা বিস্কুট খেয়ে—হাজির হয়েছিল কুমারের বাড়ী।

মতলব ছিল, ছ'একটা টাকা ধার চেয়ে নিয়ে কোন হোটেলের এক পেট খেয়ে দূরগামী কোন রেল বা জাহাজে লুকিয়ে উঠে গা-টাকা দিয়ে থেকে দূর দূরান্তরে চলে যাবে।

তারপর যা হয় হবে।

কুমারের হাসি কথা মুখের ভাব আজও মনে আছে।

হেসে বসেছিল, ছ'টো টাকা ধার করতে এসেছিল? দেব। ছ'টাকা কেন, পাঁচ টাকা দেব। মুন্সিলে পড়েছিঁস্ বুঝিনি ভাবিস বুঝি? গ্যাট হয়ে বোস্ দিকিনি—পেট জলছে, হুঁসাবুটা গিলে নিই।

ছোট বোন স্মিত্রাকে ডেকে হুঁসাবু আনতে বলেছিল। প্রতিমার বদলে এনামেলের চলটা-ওঠা বাটিতে হুঁসাবু নিয়ে এসেছিল কুমারের বিধবা মা।

ময়লা ছেঁড়া কাপড়।

স্নান শীর্ণ মুখ।

তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, এত রাতে তুমি? কি হয়েছে বাবা?

কুমার বলেছিল, কটি আছে মা?

একবার ঢোক গিলেই কুমারের মা হেসে বলেছিল, শুকনো কটি কি দিতে আছে অতিথি বন্ধুকে? ভাবিস নে, দুখানা পরোটা তোর বন্ধুকে দিতে পারব। খাঁটি ঘিয়ের নয় অবশ্য—ভেজ তেলের।

মল্পের ডাল আর কুমড়োর ছেঁচকি দিয়ে পেট ভরে পরোটা খেয়ে গাঢ় ঘুম আসার প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় ঝিমিয়ে গিয়েছিল সমরেশের দেহ-মন।

কিন্তু যেতে হবে। দূরদূরান্তরে চলে যেতে হবে।

উচিত কাজ করতে চাওয়ার জ্ঞান যে দেশের মা ছেলের গালে এমনভাবে চড় কষায়, সে দেশের ধারে কাছে সে থাকবে না।

খেয়ে উঠে চোখ টান টান করে বলেছিল, এবার আমি যাই।

কুমার বলেছিল, এত ব্যস্তবাগীশ কেন রে তুই? বোস্ না একটু।

কুমারের মা বলেছিল, তোকে খানিকক্ষণ বসতে হবে সন্মু। একটা দয়াকরী কথা আছে। হাতের কাজ সেরে এসে বলছি।

কুমারের বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সমরেশ।

ভোরবেলা মা গিয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনতে।

কুমারের বাড়ী থেকেই নিশ্চয় খবর পৌঁচেছিল।

রান্না ঘরেই ভাঙা-চোরা ঘরোয়াভাবে পেরেক ঠুঁকে মেরামত করা জল-চৌকিটাতে বসে কড়ায়ে অল্প তেলে শাকটা নাড়তে নাড়তে চলে পড়ে গিয়ে মা বিছানা নিল তার দায় ঘাড়ে নেবার ক'মাস পরে।

সমরেশ চালু করেছিল দৈনিক দু'চার পয়সায় শাক সকলে ভাগাভাগি করে খাওয়ার ব্যবস্থা।

শাকের ভাগটা খেতে হবে সকলের ।

পালং সস্তা হয়েছিল । মনে আছে একেবারে আধসের কিনে এনেছিল ।

পালং শাক নাকি ভিটামিনে বোঝাই ।

সেই আধ সের শাক কড়ায়ে নাড়তে নাড়তে কাত হয়ে আছড়ে পড়ল,  
ডাক্তার ডেকে আনতে আনতে অজ্ঞান হয়ে গেল ।

ডাক্তার বলল, রাতদিন শুয়ে থাকতে হবে ।

হৃদয়ের গণ্ডগোলের ব্যাপার ।

এই হৃদয়ের ডাক্তারি নাম কি হার্ট ?

বাড়ীতে চারটি বোন ।

আগে খেয়াল হয়নি, আজকাল সমরেশও জেনেছে ছেলেমেয়ের নামকরণ  
নিয়ে তার বাপের কি বাতিল ছিল ।

ছ’টি বোনের নামকরণ হয়েছিল সতী, আরতি, প্রীতি, ব্রততী, প্রণতি,  
স্বনীতি ।

নামের বাহার !

বাহারের নামের চার বোন আর জগদম্বা ও হরিমতী নামী দুই পিসীর  
দায় একা সামলাতে সামলাতে সমরেশ বুঝে নিয়েছে বাপের এই ছেলেমেয়ের  
নাম রাখা নিয়ে থাপছাড়া ঘোঁকের মানে ।

ছুটো মেয়ে জন্মাবার পর সে জন্মেছিল পুত্রসন্তান ।

বাঁচবে তো ?

মেয়ে সন্তান জন্মেছে ছুটো ।

মরুক বাঁচুক ।

পুত্রসন্তান সে বাঁচবে তো ?

## চার

মহিম আর বনমালী যে দায় সামলাত, মহিমের মরণের পর একা বনমালী আরও কিছুকাল সে দায় সামলে এসেছে—সে দায় সামলাচ্ছে ছেলোমাহুদ সমরেশ !

লোকে অবশ্য জানে না কিভাবে সামলাচ্ছে ।

সমস্ত সংসারটা যে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে সবাই তা জানত ।

ওদিকে কারবারের অবস্থা কাহিল, এদিকে মহিমও নেই বনমালীও নেই ।

কদিন চালাতে পারবে সমরেশ ?

আগের মত সমারোহের সঙ্গে না হলেও সমরেশ মাসের পর মাস চালিয়ে যায় ।

সংসার এবং কারবার !

পিসী হরিমতী গোটা তিনেক দোকান পান মুখে পুরে দিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে চিবিয়ে নিয়ে ভাঙ্গা বালতিটায় একগাদা পিক ফেলে বলে, সমু বেঁচে থাক, রাজা হ' ।

বুড়ো মাহুদেরা বলে, সমু, তুমি যে তাক লাগিয়ে দিলে বাবা ! বাপের দায়টা এই বয়সে এমন করে কাঁধে তুলে নিলে ? কেউ টের পেল না মহিমের জ্ঞান ? সাদ আল্লাদ বয়েসের ধর্ম সব বিসর্জন দিয়ে সোজাসুজি বাপের ঘোয়ালটা ঘাড়ে নিলে ! একটু এদিক ওদিক হতে দিলে না !

সমবয়সী ঘোয়ান মাহুদেরা বলে, এ কি রকম বুড়োটে ভারিকি হয়ে গেলি সমর ? তুই এমন ম্যানা মেয়ে যাবি, কেউ আমরা ভাবতে পেরেছি ! ব্যাপার কি বল দিকি নি ? বোমা বানাচ্ছিস, না চোরাবাজারে ঢুকেছিস ? না, মন্ত্রী হবার সাধনা জুড়েছিস ?

কিশোরী বলে, সময়টা, কেন এমন হয়ে গেলেন ? কেন এমন মুবড়িয়ে গেলেন ? কি হয়েছে সব কিছু খুলে বলুন না আমাদের, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি !

নন্দিতা এবং অন্ত কয়েকজন মেয়ে বদ্ধ নানাভাবে নানা ভাষায় একই উপদেশ দেয়, ছ'চার মাস বাইরে ঘুরে আসুন না ? আপনি গেলে বাড়ীতে কেউ ব্যাটা ছেলে থাকবে না ভাবছেন ? আমরা পালা করে আপনার বাড়ীতে থাকব—ব্যাটা ছেলের বা কিছু আপনি করেন, সব আমরা করে দেব ।

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের একঘেয়ে গা-বাঁচানো কথা শান্ত নিরুদ্বেগ মুখের ভাব বজায় রেখে শুনে যায়—যেন সবিনয়ে শুনছে ।

একটা নিখাস ফেলে ।

মাথা নত করে খানিকক্ষণ যেন গভীর ভাবে চিন্তা করে ।

ধীরে ধীরে যেন অপরাধীর কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত সুরে বলে, কি করব বলুন ? বাবা ছিলেন, আড়ালে ছিলাম । বাবা একলাই সব সামলাতেন । বাড়ীতে এখন আমিই একমাত্র পুরুষ । ছ'টা বোন, তিনটির অবশ্য বিয়ে হয়েছে, দুটো স্বামীরা ঘর করে । সেজটাকে স্বামী খণ্ডর নেয় না । তার মানে দাঁড়াল চারটে বোনকে সামলানো । একটা বিয়াতো, তিনটে অবিয়াতো । বাচ্চা ভাই আছে দুটো । সেজো মাসী একটা মেয়ে নিয়ে সাত বছর আছে, মেজ পিসী দুটো বয়স্কা ধুমশো মেয়ে আর দুটো বাচ্চা ছেলে নিয়ে আছে । কী করি বলুন তো, উপায় কি ?

তার দায়ের ফিরিতি শুনে বাক্যহারা হয়ে থাকে প্রৌঢ় আর বুড়োরা । কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা কথাবার্তায় সমারোহ সুরু করে দিয়ে তারা জীকিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে আত্মহুসন্নিতার প্রৌঢ়টে বুড়োটে খেলায় ।

সমবয়সী যোয়ানদের সমরেশ হাসিমুখে বলে, একদিন এসে দেখে গেলেই পারিস ভাই অবস্থাটা ? আজ পর্যন্ত কটা মেয়ের দায় সামলেছিস বল দেখি

ভাই ? একা আমি বাপের ঘরেই এগারটা মেয়েছেলের স্বনব্বাট পেয়েছি  
বাড়ে !

কিশোরদের বলে, বদলে গেছি কেন ? তোমাদের সঙ্গে খেলি না কেন ?  
বড় হও, সংসার বাড়ে চাপুক তখন বুঝবে ।

সমরেশ খুব ভোরে ওঠে । প্রায় শেষ রাত্রে । যেদিন নিজে থেকে ঘুম  
ভাঙ্গে না, প্রীতি তাকে তুলে দেয় ।

প্রীতি ঘুমায় সবার শেষে । জাগে সকলের আগে ।

আজকাল মাঝে মাঝে সমরেশের মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়, উঠে জলটল  
খেয়ে বেশ খানিকক্ষণ বইটাই পড়ে কসরৎ করে ঘুমোতে হয় ।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে স্বচক্ষে প্রীতিকে ঘুমোতে না দেখলে তার মনে খটকা  
থেকে যেত যে রাত্রে প্রীতি সত্যি ঘুমায় কিনা !

ভোর রাত্রে ডাকাডাকি করে প্রীতি তার ঘুম ভাঙায় না । কল ঘর থেকে  
ঘুরে এসে ভিজে হাতটি সমরেশের হুঁচোখে বুলিয়ে কপালে রাখে ।

হৃদয়ে ডাকে, সমু ?

আচমকা না জাগিয়ে আস্তে আস্তে তাকে জাগায় । হঠাৎ কাউকে জাগিয়ে  
দিলে তার নাকি অসুখ হয় ।

বিয়ের পর বছরখানেকের মধ্যে বোধ হয় এসব নিয়মনীতি সে তার অপদার্থ  
স্বামীর কাছ থেকে শিখে এসেছে ! আগে তার এসব বাতিক ছিল না ।

বড় বোন কিন্তু পিঠোপিঠি । ঠিক চোদ্দ মাসের তফাৎ তাদের বয়সের ।  
ছেলেবেলা থেকে নাম ধরে ডেকে এসে দিদি বলাটা আর রপ্ত করা সম্ভব  
হয়নি ।

: কনকনে শীতের ভোরে বরফের মত হাতটা হোয়ালি ? ইয়াক করে  
উঠেছে একেবারে ।



: মিছে কথা না সমু। আমার বুকি খেয়াল নেই? সইরে সইরে হাত ছুঁয়েছি।

: ঠেলা দিয়ে ডেকে তুললেই হয়?

: হি! যুমন্ত মাল্লবকে ওভাবে ডেকে তুলতে নেই।

আশে পাশে পাঁচ সাতটা সাইরেন তবে এবার আকাশ চিরে আর্তনাদ স্তব্ধ করল কেন হাজার হাজার মাল্লবকে জাগিয়ে দিতে? কুমার বলে, এমন জীবন্ত উদাত্ত আওয়াজ নাকি জাগতে আর নেই—এই আওয়াজে অনেক যুগের যুম ভেঙ্গে জগতের মাল্লব জেগে উঠছে!

উপরে নীচে ছোট বড় শোবার ঘরগুলির দুয়ারে দাঁড়িয়ে যুমন্ত ভাইবোন মালীপিসীদের বিছানায় টাঙ্গানো মশারিগুলির দিকে চেয়ে সমরেশ আশ্চর্য হয়ে ভাবে, তার কানে কেন এমন কর্কশ লাগে কারখানায় এই তীক্ষ্ণ ভেঁ বাজা?

প্রীতি আগেই উনানে আঁচ দিয়েছিল, বন্ধ ঘরে ধোঁয়ার কুরাশা জমে আছে।

নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হয়।

কী করে এরা এভাবে জানালা দরজা বন্ধ করে যুমোয়?

কতবার কতভাবে চেষ্টা করেছে ওদের এই স্বভাব শোধরাবার জন্য। সকলের প্রতিদিন শাক খাওয়ার নিয়ম চালু করার সময়ও সকলকে ধমকে দিয়েছে যে এভাবে বন্ধ ঘরে যদি তারা যুমোয়, কারও অসুখ হলে ওষুধপত্র আসবে না, চিকিৎসা হবে না।

কে কার কথা শোনে!

বেশী করে শাক খাওয়ার নিয়ম মেনে নিয়েছে বিশেষ গোলমাল না করেই, রাত্রে জানালা খুলে শোবার ব্যবস্থা তারা মানতে পারে নি।

বাড়ীর কর্তা বলে নেহাৎ তার খাতিরেই বোধ হয় কোণের জানালার একটা পাট একটু ফাঁক রাখে।

শীত কেটে গিয়ে সামনের গরমের দিনে এবার যখন ক্যান চলবে না, তখন ওরা কি করবে ?

: তোমাদের দম আটকে আসে না ?

: শীতে কৈপে মরে ঘুম না আসার চেয়ে একটু দম আটকানো ঢের ভালো ।

শীত ! পুরানো হলোও তুপাকার লেপ তোষক, তবু ওদের শীত ঘোচে না !

জগা পিসী উঠেছে ।

কলে মুখ ধুতে গিয়ে জগা পিসীকে ভিজ়ে কাপড়ে পুব পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে ঘুরে ঘুরে নানা কায়দায় প্রণাম করতে দেখে হঠাৎ সমরেশের প্রাণে আশা জাগে—আজ কি কোন বিশেষ দিন, আজ কি তার ছুটি আছে ?

পরক্ষণে খেয়াল হয়, ছুটি থাকলে ক্যালেন্ডারে আজকের তারিখ লাল রঙে ছাপা থাকত, আপিসে গতকাল ছুটির নোটিশ জারি না করে কর্মচারী কজনের কাছে সেও কি রেহাই পেত ?

: আজ কি গো পিসী ?

ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে প্রণামের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে যেতে জগা পিসী বলে, পোষ সংক্রান্তি থেকে তো করছি বাবা । মধুর বাপের বাড়ীর নিয়ম—তোদের নেই । তিনদিন একশে আটবার করে দিকপূজা করতে হবে ।

রান্নাঘরে গিয়ে পিঁড়িতে বসতেই প্রীতি ধোঁয়াটে পানীয়ের কাপ এগিয়ে দেয় ।

উনানে চাপানো বার্লির স্রসপেনটা নেড়ে চেড়ে নামায় ।

ঠিক যেন মায়ের মত মুখখানা ।

মায়ের মত মুখ কিন্তু মায়ের সঙ্গে কী অমিল নিয়েই গড়ে উঠেছে ওর প্রকৃতি !

সংসারে একমাত্র প্রীতির সঙ্গেই মার ছিল সব চেয়ে বেশী রকম ঝগড়াঝাঁটি আর খিটিমিটি ।

প্রীতির ছিল এক ব্রহ্মাঙ্গ । মা খুব রেগে গিয়ে কপাল চাপড়ে তাকে যা-তা বলতে শুরু করলে সেও কপাল চাপড়ে চীৎকার করে বলত, জানি গো, জানি । স্বগুরুবাড়ীতে নেয় না, তোমার ঘাড়ে খাচ্ছি—আমি তো হবই তোমার ছু'চোখের বিষ, উঠতে বসতে সাধ মিটিয়ে আমায় তো তুমি গালাগাল করবেই ।

মা সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে যেত ।

মহিম মরার পর, কারবারের সঙ্কট সংসারে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে সব কিছু ওলোট পালোট করে দিতে আরম্ভ করার পর, মা খিটিমিটি বন্ধ করে দিয়েছিল প্রীতির সঙ্গে ।

প্রীতিকেই যেন তার ভাল লাগত সবচেয়ে বেশী ।

কড়িয়ে শাক নাড়তে নাড়তে ঢলে পড়ে গিয়ে মা বিছানা নিয়েছে । শাক নাড়া থেকে সংসারের সব ঝন্ঝাটে প্রীতি হয়েছিল তার সহকারিণী ।

মা বিছানায় পড়ে আছে অনেকদিন ।

তাকে দেখে কল্পনা করা যায় না জীবিত আর মৃত মিলিয়ে এতগুলি সন্তানকে সে প্রসব করেছে ।

এতগুলি নতুন মানুষকে যে জন্ম দেয়, মোটে তিনজনকে রোগের কবল থেকে সামলাতে না পারলেও বাকী এগারজনকে বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রাখে—তার নাকি এই দশা ?

ওই-মা ক'মাস আগেও একা হাল ধরে চালাত ভাত ডাল তরকারী বাঁলি পাঁচন তৈরীর সমস্ত হাজ্জামা ।

আরেক কাপ গরম পানীয় আর ছোটো বাসি সের্কা রুটি এগিয়ে দিয়ে প্রীতি বলে, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিস সমু ।

: কেন ?

প্ৰীতি ঘূৰে বসে। ডাগৰ ডাগৰ চোখের স্নেহ-ভরা দৃষ্টি বুলিয়ে যায়  
সমরেশের সৰ্ব্বদে।

ভোর হয়ে আসছে। ছেঁড়া, জোড়াতালি দেওয়া মশাৰি ঢাকা বিছানায়  
ঘুমন্তদের মধ্যে নড়াচড়া এপাশ ওপাশ করা আরম্ভ হয়েছে কিছুক্ষণ থেকে।

রোজই বার্লি আল হয়। ছোট বড় কেউ না কেউ অস্থখে পড়ে রোজই  
বালি খায়।

ভাগ্যে এ বাড়ীতে কচি শিশু নেই!

ভাগ্যে একমাত্র প্ৰীতি ছাড়া এ বাড়ীতে বিবাহিতা নারী নেই—শুধু কুমারী  
আর বিধবা।

ভাগ্যে—

গরম পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে আরেকটু হলে  
সমরেশের বিষম লাগত।

নাঃ, প্ৰীতির বিয়ে হয়েছে দশ বছরের বেশী, স্বামীৰ ঘর করতে পারল  
না বলে তার কোলে কচি শিশু নেই, এটাকে কোনমতে ভাগ্য বলা  
যায় না।

এত ভোরেই কপালে সিঁহুরের নতুন ফোঁটা পড়েছে, সঁখিতে সিঁহুরের  
নতুন ছোঁচাচ লেগেছে। কী শাস্ত নিৰ্বিকার প্ৰীতির মুখের ভাব, কী ধীর  
স্থির তার চালচলন।

মা বিছানা নেবার পর আরও যেন ধীর আর শাস্ত হয়েছে সংসারের  
ঝন্ঝাট ঘাড়ে নিয়ে।

ধরতে গেলে সে তো একরকম বিধবাই! শুধু একটা নিয়ম রাখতে  
সিঁহুর পরেছে। সত্যিসত্যি বিধবা হলে সিঁহুরের চিহ্ন মুছে ফেলবে,  
আর পরবে না।

কিছু যেন এসেও যাবে না তাতে।

আগের দিন অনেক সময় দিয়ে বেছে রাখা ছিল ঢাল ডাল আর কুটে

রাখা হয়েছিল তরকারী। কাজ করবার লোকের কোন অভাব নেই কিন্তু খুব সকাল সকাল রান্না না চালালে চলে না।

এলুমিনিয়ামের একটা ছোট হাঁড়িতে মুঠোর হিসাবে কিছু বাছা চাল, চামচ হিসাবে কিছু ডাল আর গুণতি হিসাবে কয়েকটা আলু ছেড়ে দিয়ে প্রীতি ঘুরে বসে।

মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করে, পাঁচদিন মাছ আনিস নি! শুধু মুখের স্বাদের কিষা সখের ব্যাপার নয় তো। এত খাটছিস—তোরও তো একটু মাছ মাংস খাওয়া দরকার? পাঁচদিন মাছ আনিস নি।

: মাছের যা দাম!

উনানের তলাটা খুঁচিয়ে দিয়ে প্রীতি বলে, বাজারে গিয়ে কাজ নেই। পচা হোক যেমন হোক আতপ চাল আছে, এবেলা সিদ্ধ-পোড়া দিয়ে চালিয়ে দেব। আধসেরের মত আলু আছে—

: কোথেকে এল? কাল যা আলু এনেছিলাম, রাতে দম রেখে ফুরিয়ে দিস্ নি?

: দিয়েছি তো। এত ওরা ভালবাসে আলুর দম! পুহুটা তো দমের নামে পাগল। ক’দিন ধরে দম দম করছে সবাই, করব না? এক হাতা ডাল আর দুটো দমের আলু—এই দিয়েই তো শুকনো রুটি গেলা। শাক পাতার বদলে ওইটুকু দম পেয়েই সবাই কত খুসী! কিন্তু কি জানিস সমু—

: আমি সব জানি, শুধু আলু কোথায় পেলি সেটা ছাড়া।

: কোথায় আবার পাব? জমিয়েছি।

হাসিমুখে তেজের সঙ্গে কত হাঙ্কা হুরে কথা শুরু করেছিল, কী ভাবে হাসিটা উপে গিয়ে শুধু তেজের ভাবটা বজায় থাকে!

অবিকল প্রায় মার মত মুখ পেয়েছে, কিন্তু মায়ের খাতটা একটুও প্রীতি পায় নি।

এই কথা কটা বলতে গিয়ে মা কি ভাবে আকুল হয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিত কল্পনা করে সমরেশ চুপ করে থাকে।

গলায় ভাবাবেগের বাধা জমলে পুরুষেরা যেমনভাবে গলা খাঁকারি দিয়ে ধাতস্থ হয়, তেমনিভাবে গলা খাঁকারি দিয়ে প্রীতি বলে, 'আলু কিছু সত্যি ধারে আনি নি। আমি কি শুধু আনি পয়সাই এখানে ওখানে লুকিয়ে রাখি ভাবিস, তোর ট'গাক একদম ফাঁকা হলে ঠেকা দেওয়া চলবে বলে? আলুও আমি একটা ছু'টো করে জমাই। আধ সেরের বেশী জমে গেছে। আলু সিদ্ধ ভাত হবে আর কালকের ফুলকপিটার যে ডাঁটা আছে তাই দিয়ে একটা চচ্চড়ি হবে, বাস্। চার পয়সার পালং আমি আনিয়ে নেব—তাকে বাজারে যেতে হবে না।

সমরেশ গম্ভীর হয়ে বলে, ব্যাপার কি বল্ দিকি? শুরু করলি পাঁচদিন মাছ আনি না দিয়ে—তারপর বার বার বলছিস বাজারে যেতে হবে না?

প্রীতি শান্ত কণ্ঠে বলে, ব্যাপার আর কিছুই নয়—একটা সোজা হিসাবের কথা। বাজার খরচ আরও কমিয়ে দেব, বাড়ীর সকলের জন্ম মাছ ডিম আনতে হবে না—বাইরে দোকানে বসে তোকে একটু মাংস ডিমটিম খেতে হবে।

: আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। বাজারে যাচ্ছি, আজ মাছ কিনা মাংস হবে।

: তুই বড় ছেলেমানুষ সমু।

সমরেশ এবার একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বলে, প্যাচাল না পেয়ে আসল কথাটা বল্ দিকি এবার? দিদিগিরি ফলাস না।

: আসল কথাটা? বলছি তো—ব্যস্ত হোস কেন? মনটা ঠিক করছি বুঝিল না!

বলে সে উঠে গিয়ে তারে बुलানো গামছাটা টেনে কল ধরের দিকে চলে যায়।

সমরেশ ভাবে, সে বুঝি জানিয়ে গেল ফিরতে তার খানিকক্ষণ দেরী হবে।

কারণ যাবার সময় সে বলে যায় যে খানিকটা চিঁড়ে আর তেলিগুড় দিয়ে সকলের রুটি খাওয়ার জন্ত যে পিণ্ডটা উনানে চাপানো আছে সেদিকে সে যেন একটু নজর রাখে ।

কিন্তু প্রীতি ফিরে আসে অলক্ষণের মধ্যেই ।

প্রগতি উঠে বিছানায় বসেই শীত আর আলস্য জয় করে উঠবার আয়োজন করছে দেখে বলে, বলেই ফেলি । ওরা উঠলে আজ আর বলা হবে না । খুব গুরুতর কথা কিন্তু, মন দিয়ে শোন । সবাইকে নিয়ে একলা তুই হিমশিম খাচ্ছিস ! আমি ঠিক করেছি আর তোর ঘাড় ভেঙ্গে খাব পরব না, নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেব ।

সমরেশ ভাবে, সর্বনাশ ! কে জানে কি মতবল গজিয়েছে প্রীতির মগজে ? স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে ঠিক করেছে নাকি ?

প্রীতি রাত্রে সেকা রুটিগুলি তাওয়ায় একটু উন্টে পাণ্টে গরম করে নেয় । তারপর বলে, তোকেও অবশ্য একটু হাঙ্গামা পোয়াতে হবে । তবে আমাকে খাওয়ানো পরানোর হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবি । মাসে মাসে পাঁচ দশ টাকা তোকে সাহায্যও করতে পারব ।

সমরেশ এবার সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে বলে, আবার ফেনাতে শুরু করলি ? সোজাসুজি বল না কথাটা ?

প্রীতি দমে না গিয়ে বলে, বড় ব্যস্তবাগীশ তুই ? বলচি কথাটা গুরুতর— একটু ধৈর্য ধরে শুনতে পারিস না ?

কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে থাকে । তারপর আচমকাই বলে, খোরপোষের মামলা করব ।

: ও !

সেরকম চমকে বা ভড়কে যায় না সমরেশ—প্রীতি যে রকম কল্পনা করেছিল । প্রীতি বোধ হয় আজ আরও ভাল করে বুঝতে পারে সংসারের দায় ঘাড়ে নিয়ে ভাইটি তার কম পোড় খায় নি ।

বয়স খুব বেশী বেড়ে না গিয়ে থাক, সেদিনের ছেলেমানুষ সমরেশ  
অল্পদিনে অনেকখানি পেকে গেছে।

আর পাওনা ছিল না, তবু আরেক কাপ চা সমরেশ নিজেই ঢেলে নেয়।  
কারো কম পড়লে প্রীতি নিশ্চয় পূরণ করে সামলে নেবে।

: খুবই কষ্ট পাচ্ছিস, না? তাই এসব উদ্ভট ভাবনা মাথায় আসছে?  
যেন মামলা করলেই বিরাম তোকে খোরপোষ দিতে রাজী হবে। আইন এত  
সোজা ভাবিস? প্রমাণ করতে হবে বিরাম মাতাল গুণ্ডা দাগী কয়েদী।  
তোকে মার ধোর করে, খেতে পরতে দেয় না—আরও অনেক কিছু প্রমাণ  
দিতে হবে। এতকাল ঘর করিস নি কেন, এতকাল খোরপোষ দাবী করিস  
নি কেন—

: চূপ্ কর তো সমু। একদিকে এত সব গুরুতর ব্যাপার দিব্য বুকিস—  
অন্যদিকে তুই এমন হান্ধা আর ছ্যাবলা! আমি কি হিসেব নিকেশ না করেই  
ঠিক করেছি এটা? উকিলকাকার সঙ্গে পরামর্শ করছি না দু'তিন মাস ধরে?

উকিলকাকা মানে পাড়ার যাদব উকিল। আগে খুব দুরবস্থা ছিল,  
ওকালতি সুরু করার প্রথম আট দশ বছর। মানুষটা নাকি ছিল নীতিবাগীশ,  
লিখিত আইন যা আছে তাই নিয়ে সোজাসুজি মামলা জিততে চেষ্টা করত,  
কোন রকব মারপ্যাচের ধার ধারত না, আইনেও যে আবার অনেক রকম  
ফাঁকি চলে এটা মানত না।

মকেল জুটত না। খেতে পেত না মানুষটা।

তারপর কবে নীতি বদল করে সে আইনের মারপ্যাচে আর অন্ত অনেক  
রকম কলা-কৌশল ও তদারকে মকেলের স্বার্থ আইন মতেই হোক অথবা  
আইনে ফাঁকি দিয়ে হোক রক্ষা করার নীতি গ্রহণ করেছিল অনেকেই তা  
জানে।

ঘোয়ান বড় ছেলেটা যক্ষ্মায় মরে যাওয়ার পর—প্রায় বিনা চিকিৎসায় মরে  
যাবার পর।



তিন চার বছর সময় লেগেছিল নীতির রূপান্তরকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে। বছর পনের পরে, পঞ্চাশ ডিঙানো বয়সে আজ বিষম রকম পশার বাদবের।

আইনের প্যাচ আর ফাঁকির কৌশল খাটিয়েও সহজে হাসিল না হলে সাধারণ আইন বিশেষ আইনের আওতার উর্ধ্বে যারা আছে, তাদের কোন একজনকে ধরে হুকুম আর ধমকের জোরে অনেক মক্কেলের কাজ হাসিল করে দেয়।

সমরেশ বলে, তবেই দফা সেরেছিস।

প্রীতি একটু হাসে।

: তুই দেখি ভড়কে গেলি একেবারে। আমি কি সোজাসুজি উকিল-কাকার সঙ্গে পরামর্শ করেছি? উকিল-কাকার ছ'নম্বর বোটা আমার সই হয় জানিস না? ছ-মাস ধরে মীরাকে দিয়ে কথা চালাচ্ছি। ইস্ উকিল-কাকাটা কি বজ্জাত রে সমু, কি বলব তোকে! সইকে দিয়ে আমার ছ'একটা গয়না বাগাবার কত চেষ্টা করেছে। সইটা শক্ত মেয়ে নইলে—

সমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বুঝলাম, সারাদিন বাড়ী থাকি না, পাড়ায় ঘোঁট পাকিয়ে বেড়াস। ওসব কথা বাদ দে দিকি। বিরাম কেন তোকে থোরপোষ দিতে বাধ্য হবে সেই কথাটা বল?

কড়ায়ে ডাল ভাজতে শুরু কয়েছিল প্রীতি। চারিদিক ফর্সা হয়ে এসেছে। একে একে ঘুম-ভেঙ্গে উঠে হাই তুলছে তার পঁচিশ থেকে তের বছরের আইবুড়ো বোনেরা। মিনতি কেবল বালিশটা ঝাঁকড়ে শুয়ে থাকার চেষ্টা করছে ডাকাডাকি গ্রাছ না করে।

ডাল পুড়ে গন্ধ ছাড়ছে।

নাকে কি লাগে না প্রীতির?

প্রণতি ছুটে আসে। জগা পিসী গলা চড়িয়ে ডাক দেয়।

চঠাং আধপোড়া ডালগুলি নাড়তে শুরু করে প্রীতি বলে, আদালতে

সব কথা খুলে বলতেই হবে, তোকেও বলি। জানাজানি তো হয়ে যাবেই। তবে সে পর্যন্ত গড়াবে মনে হয় না। ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করার কথা তুললেই তোদের ওই বিরামবাবু কৈদে কেটে খোরপোষ দিতে রাজী হয়ে আপোষ করবে।

সোজা ভাই-এর মুখের দিকে চেয়ে শ্রীতি আবার বলে, তোরা জানিস আমার ওরা ত্যাগ করেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে। আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়। আমি নিজে চলে এসেছি। সইতে পারলাম না—কি কবব? গয়না গাঁটিও কেড়ে নেয় নি—সাহস পাবে কোথায়? সব বাজ্রে তোলা আছে। একটা শুধু বোকামি করেছে, ওরা যা দিয়েছিল সেগুলো ফেরত দিয়ে এসেছি। মনটা কাঁচা ছিল তো, নিজের অধিকার বুঝতে শিখি নি।

সমরেশ কথা কয় না। বুলানো জামার পকেট থেকে একটা বিড়ি এনে কাঁটার কাঠি ভেঙে উনানে জালিয়ে বিড়িটা ধরায়।

উনান ধরাবার জন্ত তার জামার পকেট থেকে দেশলাইটা নিয়ে এসে শ্রীতি কোথায় রেখেছে কে জানে?

একটা দেশলায়ের দাম তিন পয়সা।

অর্ধেকের বেশী খরচ হয়েছে। দেড় পয়সার মত একটা দেশলায়ের বাজ্রের জন্ত সে বোনের সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি করা যায় যে বোন সম্রাট পুরুষদের পক্ষপুষ্ট তার স্বামীটিকে শুধু ডাক্তারি পরীক্ষার ভয় দেখিয়ে আইন খাটিয়ে খোরপোষ আদায় করতে চায়?

না খেয়ে মরা কত মানুষের মরণকে আইন-সম্মত ডাক্তারি পরীক্ষায় স্বাভাবিক রোগে ভুগে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সে খবর কি শ্রীতি রাখে না?

একটুকরো রোদের ফালির ছোঁয়াচ লেগেছে ঘান্ধব বাবুদের তিনতলা বাড়ীর ছাতের আলসেয় রাখা টবের ফুলের চারাগুলিতে।

যত্নের সীমা নেই। তবু ছ'টো একটার বেশী কুঁড়ি ফলে না কোন চার্নাতে।

ছেলেবেলা মামাবাড়ী গিয়ে এমনি কুয়াশাবিহীন কন্ কন্ করা শীতের স্নাত্তির শেষে এলোমেলো ভাবে দূর দূরান্তরে ছড়ানো তাল নারকেল গাছের ডগায় এমনি গৃহ সোনালী রোদের ছোঁয়াচ লেগে ভোর হতে দেখেছিল কতবার।

মা যেতে পারুক বা না পারুক, ভায়ীরা মরুক বাচুক, একমাত্র ভায়ে তাকে মামারা প্রতি বছর রাজপুত্রের মত সমাদরের সঙ্গে নিয়ে যেত, পায়ের মিষ্টি মিষ্টান্ন পিঠা পাটালি খাইয়ে খাইয়ে একেবারে লেজের গোবরে হওয়ায় মত পেট খারাপের অবস্থায় পৌঁছলে ইঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে কয়েকটা কড়া কবিরাজী বাড়ি আর পাঁচন খাইয়ে মোটামুটি সামলে দিয়ে তাকে ফেরত পাঠাত।

সে সব কিছুই ভোলেনি সময়ের। পেটে অতিরিক্ত বোঝাই নেবার কষ্টে শেষ রাতে ছটফট করতে করতে ছ'তিন বার প্রাণের ভয় ত্যাগ করে ঘাটের পাশের জঙ্গলের ধারে আর ঘাটে যাওয়া আসা করে। আরও খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা তার মনে ছাপ রেখে গেছে জেলখানার কয়েদী হবার মত।

যদিও জেলে যাবার কোন অভিজ্ঞতা তার নেই।

একমাত্র প্রীতি ছাড়া বোনেরা কে আগে উঠবে কে পরে উঠবে কোন নিয়ম নেই।

কোনদিন আগে ওঠে ওদের মধ্যে বড় স্নমতি, কোনদিন সে ওঠে সকলের শেষে।

কোনদিন ওদের সবার আগে ওঠে সবার ছোট স্ননীতি।

ঘড়ির হিসাব ধরলে মাঝখানের ছ'জন, প্রণতি আর প্রভাতী ওঠে প্রায় ঘড়ি ধরে একই সময়ে।

গরম কাপড়ের কোন অভাব নেই—আরও কয়েক বছর চলে যাবে। সকলেই শীতকালে বেশ দামী দামী নতুন পুরানো আলোয়ান গায় দিতে পায়।

সমরেশের শালটা ছিল মার প্রথম বয়সের সখের জিনিষ—শীতের দিনে কোথাও যেতে হলেই শুধু গায়ে চড়ত।

এত পুরানো হলেও, কয়েক যায়গায় পোকায় কেটে ফুটো করে দিয়ে শীত ঠেকানো যায়।

শ্রীতির মত স্মৃতিও পিঠোপিঠি বোন—ছোটর দিকে। কুড়ি পেরিয়ে স্মৃতি একটু মোটা হয়ে গেছে।

আজ্ঞে বাজে তরকারী দিয়ে পচা চাল আটা খেয়েই কিনা কে জানে। কিন্তু মুখখানা যেন লক্ষ্মী প্রতিমার ছাঁচে গড়া।

ধীর স্থির মেয়ে।

তার খেয়াল থাকে না, রোজই প্রায় গায়ের লেপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসতে গিয়ে ছেঁড়া শাড়ীর জন্ত লজ্জা পেয়ে তারপর সামলে নেয়। আরও দুতিন বোনেরও এই লেপটা দিয়েই শীত কাটছে।

খসা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে আলগা খোঁপাটা আঁটতে আঁটতে স্মৃতি একটা হাই তোলে।

জিজ্ঞাসা করে, ছাই রঙের উলটা কাল এনেছিস সমু?

পিঠোপিঠি বড় বোন শ্রীতিকে সমরেশ যেমন নাম ধরে ডেকে তুই বলে কথা কয়, পিঠোপিঠি বড় ভাই তাকেও স্মৃতি তেমনি নাম ধরে ডেকে তুই বলে কথা কয়।

ছেলেবেলা থেকেই এটা চালু হয়ে গেছে।

সমরেশ বিড়িতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিতে যাবে, শ্রীতি কড়ায়ে ডাল সম্ভার দিতে দিতে চেঁচিয়ে বলে, ও উলটা দু'দিন পরে আসবে মতি—সমুয় হাতে এখন পয়সা নেই। বাদামী উলের কাজটা সার না আগে, সেন-গিন্নী তাগিদ দিচ্ছে?

: চুপ কর মুখপুড়ি। সমু আগে ওই উল এনে দেবে তবে আমি সেন-গিন্নীর কাজে হাত দেব।

স্মৃতি আরেকবার হাই ভোলে। টগবগ আওয়াজ তুলে কড়ায়ে ফুটেছে পাতলা ডাল। উনানের তলা থেকে ঘুঁটের ছাই নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে সে সমরেশের কাছেই উবু হয়ে বসে।

রাত্রির এঁটো বাসনের ভুর থেকে একটা বাটি টেনে নিয়ে থুথু ফেলে বলে, একছিলুম তামাক দেব? বিড়ি না টেনে বাবার মত তামাক খেলেই পারিস্!

আজ আচমকা সমরেশের একটা অদ্ভুত কথা মনে আসে—স্মৃতির কি একটু রূপের দেমাক আছে? তার হাই ভোলার মধ্যে পর্যন্ত একটা যেন বিশেষ ভঙ্গি আছে!

বোনটি তার স্মন্দরী কিনা আগে কোনদিন সেটা খেয়ালও করে নি। ওর বিয়ের চেষ্টা শুরু করে তার প্রথম নজরে আসে স্মৃতি সত্যিই খুব স্মন্দরী—ওকে দেখে কেউ অপছন্দ করবে না।

স্মৃতিকে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে সমরেশ টের পায়, রূপের দেমাক থাক বা না থাক, নিজের রূপ সম্পর্কে স্মৃতি বেশ সচেতন।

স্মৃতির পর তিন বছর ফাঁক দিয়ে জন্মেছিল প্রণতি।

লম্বা ছিপছিপে গড়ন, মুখটাও একটু লম্বাটে, স্মৃতির মতই গায়ের রঙ। মুখের গড়ন ওরকম লম্বাটে না হলে তাকেও বেশ স্মন্দরীই বলা যেত।

মনে হয় একটু হাঙ্কা প্রকৃতির ফাজিল ধরনের মেয়ে—সময় সময় সবার ছোট স্মৃতির চেয়েও তার ছেলোমাস্মী ভাবটা যেন বেশীরকম উথলে ওঠে।

স্মৃতি বলে ছ্যাবলামি—কিন্তু প্রীতি কিছা সমরেশ কিছুই বলে না। প্রণতির স্বভাবের আরেকটা দিক আছে, আর কোন বোনের মধ্যে যা দেখা যায় নি।

যেমন চালাক চতুর তেমনি সব বিষয়ে চটপটে। কোনদিকে কিছু করার সুযোগ সুবিধা নেই তবু ছেলেবেলা থেকেই অনেক কিছু করার জন্য তার অদম্য উৎসাহ।

আজও সে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি।

অল্প মেয়েরা ঘরে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছে, একমাত্র প্রগতিকেই মহিম কয়েক বছর স্কুলে পড়িয়েছিল।

স্কুল খতম হয়েছে কিন্তু তার পড়ার চাড়া শুকিয়ে যায়নি।

তার ক্লাসের আগের চেনা মেয়েরা প্রমোশন পেয়ে উপরের ক্লাসে উঠেছে, সে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছে তাদের অকেজো বই। পাড়ার স্কুলে পড়া মেয়ের কাছে প্রায় প্রতিদিন পড়া জেনে নিয়ে নিয়মমত পড়ে গেছে—পড়া বুঝতে চেয়ে চেয়ে জালিয়ে মেরেছে সমরেশকে।

সমরেশ বলেছে, কেন মিছে জালাচ্ছিস? লেখাপড়া তোরা হবে না, আমার সময়ও নেই, সাধ্যও নেই খরচপত্তর করে তোকে পড়াই।

প্রগতি এতটুকু দমে না গিয়ে বলে, খরচপত্তর করে পড়াতে বলেছি তোমাকে? একটা বই কিনে দিতে বলেছি? শুধু তো পড়াটা একটু বুঝিতে দিতে বলছি!

সমরেশ কিছুদিন জালাতন হয়ে বোনের উৎসাহ আর চেষ্টার বহর দেখে আর জালাতন বোধ করেনি। বরং এই ভেবে লজ্জাই বোধ করে যে আজও লোকের কাছে বড়লোক বলে গণ্য হয়েও পয়সার জন্ত প্রগতির পড়া বাতিল করতে হয়েছে।

উঁচু ক্লাসের বই প্রগতি মেয়ে-বন্ধুদের কাছ থেকে যোগাড় করতে পারেনি। উপরের দু'তিনটা ক্লাসের বই স্কুলের চরম পরীক্ষা পর্যন্ত দরকার হয়।

ফাজিল চপল মেয়েটার একদিন সে কি বুকফাটা কান্না! পড়া বন্ধ করে বিগড়ে যাবার ছমকি দিয়ে, বাড়ীর সকলের কষ্ট করা আরও খানিকটা চরমে তুলে স্কুলের চরম পরীক্ষার জন্ত দরকারী বইগুলি কিতে দিতে সমরেশকে বাধ্য করেছিল।

প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে সে পাস করেছে।

আরও পরীক্ষা পাসের অসাধ্য সাধনের চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে

থেকেই । কিন্তু বই পড়ার নেশা তার কাটেনি । ভোল পালটে গল্প উপস্থাস  
রম্য রচনা পড়ার নেশায় দাঁড়িয়েছে ।

আর কিছু না পেলে গুরুতর বিষয়ে বোকা-হাবাদের জন্ত সহজ কিন্তু নীরস  
করে লেখা প্রবন্ধের বইও সই !

তার এই বই পড়ার নেশার জন্ত সমরেশকে মাসে মাসে একটা লাইব্রেরীর  
চাঁদা গুণতে হয় । তাছাড়া পাড়ার কয়েক বাড়ীর মেয়ে বোয়ের সঙ্গে একটা  
স্থায়ী বন্দোবস্তও করে ফেলেছে প্রণতি—যে সব বাড়ীতে লাইব্রেরীর বই আনা  
হয়ে থাকে ।

বন্দোবস্তটা এই যে বই এনে ফেরত দেবার আগে অন্তত একবেলার জন্ত  
বইটা প্রণতিকে দিতে হবে ।

একবেলার জন্ত ধার করে আনা এমনি কোন বই কি প্রণতি কাল রাত  
জেগে পড়েছিল ?

দেবী করে সবার শেষে ঘুম থেকে উঠে প্রায় স্নমতির মতই কয়েকবার  
হাইতুলে সে বিছানা ত্যাগ করে ।

অল্পমান যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণও পাওয়া যায় ।

হাই তুলতে তুলতে বিছানা ছেড়ে উঠলেও মুখে চোখে জল দিতে দিতেই  
যেন চান্দা হয়ে ওঠে প্রণতি ।

তাকে রাখা টাইমপিসটার দিকে একবার তাকিয়ে যেন লাক দিয়ে উঠে  
তার মাথার বালিশের তলা থেকে ঘরোয়া ভাবে মোটা করে বাঁধানো—যে  
রকম কালো মোটা নোংরা বাঁধাই দেখেই টের পাওয়া যায় বইটা কোন  
পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পত্তি—বইটা নিয়ে তরতর করে বাইরে রওনা দেয় ।

সমরেশ ডেকে বলে, নতি শোন !—নতি ?

: দাঁড়াও, আসছি ।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে আসে । ঘরে তৈরী পাত্তের মাজন হাতে  
নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজতে শুরু করে বলে, কানাইদা আপিস বাওয়ার

আগে বইটা না দিয়ে এলে বেলা চটে লাল হয়ে যেত। ছপুয়ে খেয়ে দেয়ে বই না হলে বাবুর ঘুম আসে না। ভারি তো পড়ে, একটা বই পড়তে চার পাঁচ দিন লেগে যায়।

শ্রীতি বলে, দাঁত মেজে এসে চা রুটি খেতে খেতে বকবক কর না নতি ?  
তোর জন্মে হাঁড়ি নামিয়ে আবার চা গরম করব ?

: খোঁচা দিয়ে কথা বল কেন ? সোজাসুজি বললেই হয় !

ছ'মিনিটে কি করে সে কলঘরে গিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে আসে সে-ই জানে।

ফিরে এসেই ভজি করে বলে, শুকনো পোড়া রুটি আর ট্যাকটেকে চা-টুকু দয়া করে দাও গো সেজ্জিডি। ইস, আমি তোমায় কীভাবে সারাদিন খাটিয়ে মারি !

: মারিস না ?

সমবেশ টের পায় যতই ছ্যাবলামি করুক প্রগতি জানে যে এবার কোনরকম একটা জবাব দিলেই শ্রীতি রাগে ফেটে পড়ে ধমক দেওয়া শুরু করবে।

শ্রীতির প্রশ্নটা কানে না তুলেই সে সমবেশকে বলে, বুঝলে না বই-এর ব্যাপারটা ? বই হল বেলার ছপুরবেলার ঘুমের ওষুধ। চার পাঁচ দিন ঢোঁক ঢোঁক গিলে বই শেষ করে আমায় দেয়। পরদিন কানাইদা আপিস যাওয়ার আগে বইটা ফিরিয়ে দিতেই হবে—আমার সঙ্গে এই হল কড়ার।

সমবেশ বলে, কানাই তো ফিরবে রাত আট ন'টায়। আজ ছপুরে বেলার তবে চলবে কি করে ?

: তুমি কিছু জান না বোঝ না, ভাব যে সবাই বুঝি তোমার মত কাজ-পাগলা মানুষ !

খিল খিল করে হেসে উঠেই হঠাৎ হাসি বন্ধ করে প্রগতি মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।



তার লজ্জা পাবার কারণটা খেয়াল করে সমরেশ মনে মনে একটু হাসে। সে ভুলেই গিয়েছিল যে সকাল সকাল হাজিরা দিয়ে রাত আটটা ন'টায় ছুটি গেলেও আপিসের কাজে এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করাটাই কানাই-এর আসল ডিউটি। বিয়ের আগে আপিস থেকে কাজে বেরিয়ে হ'এক ঘণ্টা এদিক ওদিক আড্ডা মেরে কাটাত, বিয়ের পর আজকাল বাড়ী এসে খানিকক্ষণ বেলার সঙ্গে কাটিয়ে যায় !

ট্রাম-বাসের পয়সা খরচ করে এতদূর আসে ! বৌও কোন কোন মাহুষের নেশা দাঁড়িয়ে যায় বৈকি !

হাঁটু পর্যন্ত নামে প্রণতির মোটা চুলের গোছা। সমরেশ লক্ষ্য করে যে লম্বা আর গোছ থাকলেও প্রণতির খোঁপাটা হয়েছে অস্বাভাবিক রকম প্রকাণ্ড। তাতে তারার রূপালি গুটি-ওয়াল কাঁটা আটকানো। এই ফ্যাশনের খাঁটি রূপার গুটিওয়া মাথার কাঁটা সে স্নাকরার দোকান থেকে কিনে বা অর্ডার দিয়ে তৈরী করে দেয় নি—কাঁটাগুলি পাঁচ ছ'পয়সা দামের নকল জিনিষ।

সাগরজোজের বেলাতেও এরকম সব ছেলেমাহুষী হাঙ্কা ফ্যাশন রপ্ত করেছে প্রণতি।

সুন্নীতির ডাকনাম সুহু।

চা আর শুকনো পোড়া রুটি খেয়ে সে কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারে না।

যাদবের তিনতলা বাড়ীর ছাদের অলিন্দে বসানো টবের চারা থেকে নেমে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে আড়ালহীন আনাচে কানাচে।

আরাম করার সময় নেই। মাথায় একটু তেল দিয়ে তেলো হাতটা শীতে-ফাটা গায়ে বুলাতে বুলাতে কলঘরে যেতে যেতে সমরেশ প্রণতির জঙ্গ রীতিমত উদ্বেগ অস্থত্ব করে।

অস্ত্র বোনেরা যেমন হোক বোকামি হাবামির পর্যায়টা পার হয়ে  
সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধির স্তরে পৌঁছেছে।

ওরা কেউ সহজে বোকা বনবে না।

কিন্তু বিষম চালাক এবং উত্তোঙ্গী কারও সভ্য হৃন্দর মার্জিত মেয়ে-ধরা কাঁদে  
প্রগতি স্বেচ্ছায় সানন্দে আটকে গিয়ে ঠকতে পারে—ওর বেলা ভরসা করতে  
সে মনে জোর পায় না।

## পাঁচ

কত মাহুষ আড্ডা মেরে সিনেমা দেখে গায়ে কুঁদিয়ে দিন কাটায়, আপিসের দায় পালনের ফাঁকে কানাই কিছুক্ষণের জগ্ন বেলার সঙ্গ লাভের সময় করে নেয়।

তার নিজের কত দায়।

কবে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে সেটাই দাঁড়িয়েছে চিন্তা।

এভাবে কতদিন ঠেকাতে পারবে তাও জানা নেই। সে তো জানে দায় কি ভাবে সামলে চলেছে। ডুবে তলিয়ে যেতে কতদিন বাকী ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে।

কুমারের দায়টাও তার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা হয়।

এমন সঙ্কল্প আর হাশ্চকর মনে হয় ব্যাপারটা।

সেদিন সুমিত্রা এসে বলে, সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে নাকি সমরদা? একবার যে উকি মারতেও যাও না?

: আমার ব্যাপারটা বুঝি তোমার জানা নেই কিছু? একেবারে সময় পাই না, করব কি।

: রেখে যাওয়া বাপের টাকার কাঁড়িটা আরও বাড়াতে খুব ব্যস্ত, না?

টাকার কাঁড়ি! কুমার সব জানে কিন্তু তার বোন বিশ্বাস করে না তাদের বড়লোকত্ব তার বাপের আমলেই ফুরিয়ে গিয়েছিল।

সমরেশ একটু হেসে বলে, টাকা বাড়াবার সুযোগ পেলে কে ছাড়ে বল? তোমাদের খবর কি?

সুমিত্রা বলে, বেশ ভদ্রতা করতে শিখেছ তো? যাই হোক, মা তোমায় একবার যেতে বলেছে। সময় নেই বললে চলবে না—জরুরী ব্যাপার।

: কি ব্যাপার?

: গিয়েই শুনো।

সুমিত্রার মুখ স্নান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ নিজের মনে নথ দিয়ে টেবিলের কাঠটা খোঁড়ে।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, একটা টেবল কুথও জোটে না? কী স্নন্দর ছিল তোমার সেই টেবল কুথটা।

সমরেশ নীরবে একটু হাসে।

পাঁচ ছ' বছর আগে প্রগতি সখ করে বানিয়ে দিয়েছিল টেবিলের সেই ঢাকনিটা।

দু'একদিনের মধ্যে বোনেরা মিলে ওর চেয়েও স্নন্দর ঢাকনি তার টেবিলের জন্তু বানিয়ে দিতে পারে—দয়া করে সে যদি শুধু দামী কাপড় আর রঙীন সূতো এনে দেয়।

সুমিত্রা হঠাৎ মুখ তুলে বলে, আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছি। মা বলেছে, দাদা যখন বাড়ী থাকবে না তখন যেও। দাদার বিষয়ে কথা কিনা। ছপুরে খেতেই যেও আজকালের মধ্যে একদিন?

সমরেশ হেসে বলে, কুমারকে নিয়ে এমন জরুরী ব্যাপার? মাসীমা নিশ্চয় ওর বিয়ে দেবার জন্তু পাগল হয়েছে, ও নিশ্চয় বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না, মাসীমা নিশ্চয় ওকে বুঝিয়ে রাজী করানোর কথা বলতে আমার ডেকেছে!

সুমিত্রা নীরবে স্নান মুখে মাথা নাড়ে।

: তবে কি? একটু আভাস দিয়ে গেলে হত না? ভাবনা চিন্তা করে যাবার সময় পেতাম।

: আমি কিছু বলতে পারব না। গিয়ে সব শুনো! কাল যাবে, না পরশু ছপুরে খেতে যাবে বলা। ভাতটা রেঁধে রাখতে হবে তো!

: কাল পরশু কেন, আজকেই। যেতে যেতে দেড়টা দুটো বেজে যাবে কিন্তু।

: তা বাঙ্ক ।

কুমারের মা তাকে ভাত দেয় না, ভেজিটেবল ঘিয়ের লুচি আর ঘোকান থেকে কিনে আনা রান্না করা মাংস খাওয়ার—ঘরে রান্না ডাল তরকারী ভাজাও দেয় ।

সমরেশের মনে পড়ে যায়, মার হাতে চড় খেয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসার দিন রাত্রে কুমারের মা তাকে নিরামিষ ঘিয়েরই পরোটা খাইয়েছিল ।

খেতে বসে সমরেশ বলে, খেতে খেতেই বলুন মাসীমা, আমার একদম সময় নেই ।

কুমারের মা আগের মতই আদরের সুরে বলে, ব্যাটাছেলের সময় না থাকাই স্নেহের কথা বাবা । রাশি রাশি কাজ করবে, রাশি রাশি পয়সা কামাবে, দিনরাত ব্যস্ত হয়ে থাকবে । তবে শরীর দিয়ে তো কাজ, শরীর ঠিক থাকলে কাজও ঠিকমত করা যায় । শরীর বিগড়ে গেলে এক ঘণ্টার কাজ দশ ঘণ্টা খেটেও করা যায় না ।

সমরেশ ভাবে, সেরেছে ! এমন লম্বা উপদেশমূলক ভূমিকা দিয়ে শুরু ? ব্যাপার তো তবে সত্যি খুব গুরুতর ।

নিরামিষ ঘিয়ে টাটকা ভাজা আরও কয়েকখানা ফুলকো লুচি তার পাতে দিয়ে কুমারের মা কিন্তু আসল প্রসঙ্গে আসে, কুমারের ভূমি ছেলেবেলার বন্ধু, ভায়ের বাড়ি । কুমারের কি অসুখ হয়েছে লুলোচুরি না করে আমায় বলতেই হবে বাবা । ওর জ্ঞান বুদ্ধি কম, ঝোঁকের মাধ্যম চলে—ওর ওপরে ছেড়ে দিলে চলবে না । আমায় কিছু বলে না, হেসে উড়িয়ে দেয় । জানলে বুঝলে ব্যবস্থা হয়তো একটা করতে পারব । গোপন করতে পারবে না, তোমায় বলতেই হবে কুমারের অসুখটা কি ?

সমরেশ একটু হতভম্ব হয়ে যায় । কুমারের অসুখ ? তাকে বলতেই হবে কুমারের অসুখের খবরটা ?

১. গমরেশ থাওয়া বন্ধ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করে। হঠাৎ কোন  
জবাব দিতে ভরসা পায় না।

সুমিত্রা বলে, আমিও টের পেয়েছি সমরদা। দুঃখে কষ্টেও দাদার  
চিরদিন হাসিখুসী ভাব তো? আগে বেপরোয়া চালিয়ে যেত—আজকাল  
বেশ কষ্ট হচ্ছে জের টানতে। শোন তোমায় বলি। পরশু ছুটি ছিল  
তো? ছুটির দিন দাদা ঘরে থাকে না, খাতে নেই। পরশু অনেক বেলায়  
বাড়ী ফিরে থেয়ে দেয়ে উঠে সটান গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমরা সবাই তো  
ভয়ে মরি। চারটের পর দাদা যখন বিছানা ছেড়ে উঠল, মুখ ফুলে  
চোল হয়ে গেছে। চা করে দিলাম, জিঞ্জেরস করলাম, শরীর খারাপ হয়েছে  
দাদা? হাসতে পারল না। বলল কি জানো? বাঃ, বেশ তো  
হয়েছে চা-টা। তা' ব্রিটিশ মালিকদের এত ঘৃণা দিয়ে চা খাই—বেশ  
হবে না!

সুমিত্রা কঁদে ফেলে।

: দাদাকে তুমি বাঁচাও সমরদা। আমাদের বাঁচবার জন্তু দাদা স্নাইসাইড  
করছে।

স্নাইসাইড করছে!

কথাটা কানে বাজে। ঝন্ঝন্ করে বাজে। স্নাইসাইড করার মানে ছিল  
ঝোঁকের মাথায় চটপট কোন উপায়ে মরে যাওয়ার চেষ্টা। পরনের কাপড়  
কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে, বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, দোতলা  
তিনতলা বাড়ীর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে, বিদেশী ব্লেন্ড দিয়ে শিরা কেটে,  
কোন লাটকে মারার চেষ্টা করে ফাঁসি গিয়ে, কতভাবেই না স্নাইসাইড চালু  
হয়েছিল গত শতাব্দীর জগতে।

একটু রকমারি রোমাঞ্চ।

: কী ভাবছ সমরদা?

ভাবছে?

সমরেশ চমকে ওঠে। ওদের কথা শুনতে শুনতে সে নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল নাকি !

ধাতস্থ হয়ে বিষন্ন এবং গভীর হয়ে সমরেশ বলে, এসব কিছুই তো আমার জানা ছিল না মাসীমা। কুমারের অসুখের কথা বলছেন ? কুমার আমার কাছেও বোধ হয় সব গোপন করেছে। হয়তো কিছুই হয়নি কুমারের—সামান্য ব্যাপার।

: সামান্য ব্যাপার নয় বাবা। সামান্য ব্যাপার হলে কি এভাবে তোমার ডেকে এনে জ্বালাতন করি ? আমি টের পেয়েছি বাবা, কঠিন কি অসুখ ঘেন হয়েছে কুমারের।

তবে তো মুন্সিলের কথা !

কুমারের মা বলে, ওকে না সামলালে, চিকিৎসা না করলে, ক'মাস যে আর বাঁচবে—

কুমারের মা নীরবে কাঁদে। ধপধপে ধোপছরন্ত ধুতিটার আঁচল দিয়ে কয়েকবার চোখ মোছে।

চোখে লেগে থাকা জল আর চোখটাই ঘন ঘন চোখের জলে প্রায় ভিজে যাওয়া আঁচল দিয়ে মোছে।

আসল চোখের জল ঝরেই গিয়েছে বুষ্টির মত।

সমরেশ বিব্রতভাবে বলে, কাঁদবেন না মাসীমা। অসুখ যদি হয়েই থাকে, চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, সেরে যাবে।

: অসুখ যদি হয়েই থাকে মানে ? না সমু, লুকোতে পারবে না। আমাকে বলতেই হবে ওর কি অসুখ হয়েছে। জানলে আর কিছুই না পারি, সেবা শুশ্রূষাটাও তো থানিকটা ঠিকমত করতে পারব ?

: আমি তো কিছুই জানি না মাসীমা ?

মুখ হাঁড়ি করে মা ও মেয়ে চুপ করে থাকে।

ছেলেবেলার বন্ধু, প্রাণের বন্ধু নিশ্চয়—সমরেশের চেয়ে কে এতবার এত ঘন ঘন বাড়ীতে এসে এসে বন্ধুত্ব করেছে।

সে বলে কিনা কিছুই সে জানে না বন্ধুর এমন নিদারুণ অসুখের ব্যাপার সম্পর্কে।

এ কেমন বন্ধু ?

বেগতিক দেখে সমরেশ মিনিটখানেক গভীর ভাবনায় ডুবে যাবার ভান করে, পকেট থেকে আনমনে একটা বিড়ি বার করে আনমনে ধরাবার ভানও করে।

ভেবেচিন্তে জোর দিয়ে বলে, মাসীমা, ভাবছেন কেন ? কুমারকে হাসপাতালে নিয়ে যাব, কাকাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেব কি হয়েছে। তেমনি কঠিন রোগ হলে কি কেউ গোপন করতে পারে ? মিছে ভাবছেন আপনারা।

কুমারের মা যেন আকাশ থেকে নেমে বলে, ওর যে কঠিন অসুখ তুমি তা জান না বলতে চাও ?

: ওর কঠিন অসুখ হয়েছে জানবার পরেও আমি কি চুপ করে থাকতাম মাসীমা ?

হুজনে চুপ করে থাকে।

ফেলে ছড়িয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সমরেশ।

মরিয়্য হয়ে কুমারের মা বলে ওর অসুখটা তুমি সহজে জেনে আমাদের জানাতে পার সময়।

: আমার কিছু জানতে হবে। দরকার হলে কুমার নিজেই আমাদের জানাবে।

বলে সে উঠে দাঁড়ায়।

অর্থাৎ কাল্পনিক রোগ সম্পর্কে মা ও মেয়ের আশ্বাস উৎকর্ষা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় বা সাধ্য তার আর নেই।



সুমিত্রা গলা চড়িয়ে প্রায় রেডিওর চড়া গানের আর্তনাদের হুঁরে বলে,  
দাদাকে বুঝিয়ে দিও সমরদা, রোগ গোপন করতে নেই—চিকিৎসা করে  
দাদাকে বাঁচাতে আমি মরে যেতে রাজী আছি।

কুমার যে রোগা হোয়ে গেছে দেখলেই টের পাওয়া যায়।

কিন্তু কঠিন অসুখ ?

সমরেশও রোগা হয়ে গেছে।

প্রায় শুকিয়ে গেছে তার মুখের যৌবনের শ্রীটুকু।

বাপের যার বড়লোক বলে খ্যাতি থাকে, অল্পভাবে বেপরোয়া অসংযমের  
বাহাহুরি আর বিকৃত চড়া স্মৃতি ভোগ করার মজায় অপচয় না করলে স্কুল  
ডিজিয়ে কলেজ ডিস্‌বোর সাধনায় খানিকটা শুষে নিলেও স্বাস্থ্য আর নব  
যৌবনের শ্রী তার মূলধন থাকারই কথা।

কলেজ ডিঙানো স্থগিত রেখে এত বড় দায় ঘাড়ে নিয়ে সমরেশ যে রোগা  
হয়ে শুকিয়ে গিয়েও স্বাস্থ্য আর যৌবনশ্রীর আমেজটুকু আজও বজায় রাখতে  
পেরেছে, সেটাই তার বাহাহুরি বলতে হবে।

আটটা সাড়ে আটটায় সমরেশ বাড়ী ছাড়ে—চা আর একটি রুটি খেয়ে  
জরুরী দরকার হলে আরও সকালে বার হয়, কিছু হবে না জেনেও আশার  
তাড়নায় কোন বৃহৎ ব্যক্তির বাড়ীতে যাবে।

প্রতিদিন নিজের সঙ্গে কি লড়াইটাই তাকে যে করতে হয় জোড়াতালি  
দিয়ে সংক্ষেপে কাজ সারার ঝোঁকটা সামলাতে।

আসল কাজটা ঠিকমত না করার ঝোঁকটা বোধ হয় বংশগত, নিজের  
মারাত্মক রোগটাও জেনে শুনে হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে খানিকটা  
পরিশ্রুত জল আর রঙীন সিরাপ খেয়ে আরাম হওয়ার অন্ধ বিশ্বাসের  
মত।

রাত দশটায় বাড়ী ফিরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বরফের মত ঠাণ্ডা জল দিয়ে

কোন রকমে মুখ হাত ধোয়। কল বন্ধ হয় বিকালেই—হু'তিন বালতির বেশী জল জোটে না—সারাদিন পথ আর বাসের ধুলোবালি নোংরামিতে খানিকজুগ এবং নানা রোগের ডাষ্টবিন কারবারের পুরানো গুদামখানার আপিসে ন'দশ ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়ী ফিরে হাত পা ধোবার জল পায় এক ঘটি।

ভর্তি নয়। তিন পোয়াটেক।

মুখ হাত ধুয়ে টেবিলের সামনে চেয়ারে একটা সিগারেট ধরায় একটু আরাম করার জন্ত।

তার পড়ার জন্ত কেনা হয়েছিল এই টেবিল—বই খাতা বেতন ইত্যাদির বাৎসরিক খরচের মানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে।

দামী টেবিলটা ঠিক আছে—চেয়ারটা একটু নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সারাই করে লাভ নেই, বাতিল করে নতুন চেয়ার কেনাই উচিত—তবে, টেবিলে ঝুঁকে বসা যাবে আরও দু'এক বছর।

সারাদিন খেটেখুটে মাঘের শীতের রাতে বাড়ী ফিরে এক ঘটি জলে দেহমনের মানি আর নোংরামি ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে বাপের পুরানো বালাপোষটা গায়ে জড়িয়ে চেয়ারে বসে সারাদিনের বরাদ্দ তিনটে সিগারেটের শেষটা ধরিয়ে কয়েক মিনিটের আরামটা ঠিকমত ভোগ করা যায় না এই চেয়ারে বসে।

হেলান দেবার উপায় নেই। স্কুল-কলেজের বৈতরণী পার করার জন্ত মোটা কাঠে তৈরী হলে হয় তো ঠিক থাকত, ভেঙ্গে চুরে খসে ঝরে গেছে নক্সা-কাটা দামী সূদৃশ চেয়ারের পিছনের দিকটা।

মনের ভুলে একবার আরাম করে হেলান দিয়ে বসতে গেলেই কপালে জুটেবে চিংপটাং।

আজ ওরকম কোন আরামই হিসাবে ছিল না সমরেশের।

মালকাবারি ব্যাপারে ভোর রাত্রি থেকে কাটা ছাগলের চেয়েও বেশী রকম

ছটকট করছিল ছোট বোন সুনীতি—গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরতে না পারা উপরের স্তরের জন্তু আর নীচের স্তরের মানুষের মত।

চিকিৎসা আছে।

কয়েকটা ইনজেকশনেই সারানো যায়।

কিন্তু বেশ কিছু টাকা লাগবে।

এতগুলি মানুষের এই বিরাট সংসারের খাওয়া পরা আর মুখ খুবড়ানো কারবারটা চালিয়ে যেতে প্রাণপাত করেও কিছুতেই সে ব্যবস্থা করতে পারছে না প্রতি মাসে দু'তিন বেলা তার ছোট বোনটার কাটা ছাগলের মত ছটকট করার আধুনিকতম চিকিৎসার।

জগা পিসী অবশ্য প্রতিবারই বলে, বিয়ে দিয়ে দেনা, সেরে যাবে। আমার সারে নি?

বিড়ি ধরিয়ে খবরের পাতায় চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে সমরেশ বলে, তোর তো আট বছরে বিয়ে হয়েছিল পিসী। মাসের কষ্টে দু'বার বিয়ে হয়েছিল নাকি তোর?

শ্রীতি যাই ভাবুক আর যাই বলুক, পুষ্টিকর খাত্তের অভাবে সমরেশ রোগী হয় নি।

তাকে কাবু করেছে চিন্তা-জর।

বাড়ীতে যতই কড়াকড়ি ব্যবস্থা করে থাক, লোকমান ও ঋণের ভারে টলমল কারবার থেকে খোবল দিয়ে দিয়ে টাকা নিতে যতই তার বিল্লী লাগুক, এটুকু জ্ঞান তার আছে যে এমনিতে যদিও বা সামলে যাবার কোন আশা থাকে, তার দেহ ভেঙ্গে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কুমারের অজানা রোগের খবর জানবার ভূমিকা-স্বরূপ তার মা তাকে দেহ-রক্ষা সম্পর্কে যে ছাকা নীতিকথা শুনিয়েছিল, সেটা তার কাছে শুধু

শুনবার ও বলবার ছাঁকা নীতিকথা ছিল না, অত্যন্ত বাস্তব প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছিল।

নিজের প্রাণটির জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করতে তার বিধা ছিল না। খ্রীতি তাকে বাইরে ডিম মাংস খেতে উপদেশ দিয়েছে—খ্রীতি জানে না যে গোড়ার দিকে তাই সে খেত—বাড়ীর সকলকে বাদ দিয়ে একা একা ভাল জিনিষ খেতে বিক্রী লাগলেও খেত।

তার এত দায়, এত খাটুনি। বাড়ীর সবাই তো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। ভাল ভাল খাত্ত ওদেরও দরকার কিন্তু তার দরকারের মত জরুরী নয়।

আজকাল ওসব কিছু সে খেতেই পারে না। দোকানের মাংস দূরে থাক, চিন্তাজ্বর তার একসঙ্গে দুটো হাফ বয়েল ডিম খাওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত হরণ করেছে।

একটা ডিম খেয়ে সে আজকাল উল্গার তোলে!

খ্রীতিও এটা জানে না।

কারণ, বাড়ীতে খাওয়ার পাট একরকম সে তুলে দিয়েছে।

সকলের দুর্ভাবনা দূর করার জন্ত বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছে, অসময়ে আমি আবোল তাবোল খেতে পারি না। দুপুরবেলা বাইরে খেতেই হবে, রাতে খিদে পেলে বাড়ীতে এসে খাব বলে খিদে চেপে কাজ করতে পারব না। বাইরে সকাল সকাল হোটেল খেয়ে নেব, রাজে আমার জন্ত শুধু আধ পো দুধ আর দু'খানা টোষ্ট রাখবে—শুতে শুতে খিদে পেয়ে যায়।

খ্রীতি বিশ্বাস করে নি, সংশয়ভরে বলেছে, বাইরে ছাই পাশ কি যে তুই খাস সে তোর ভগবান জানে—চেহারা যা হচ্ছে দিন দিন দেখে তো কান্না পায়।

সমরেশ তাকে বুঝিয়েছে, সেটা খাটুনির জন্ত।

খাটতে হয়।

বাস্তব সমস্যা নিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি আর চেয়ারে বসে চিন্তা করা ছোটোই তো খাটুনি।

কিন্তু খাটুনির চেয়ে তাকে বেশী কারু করেছে ছুশ্চিন্তা—কি করে সামলাবে, কি উপায় হবে।

ছুশ্চিন্তা? সর্বক্ষণের আতঙ্কই বলা যায়!

একটি সিগারেট টানার আরাম দিনান্ত পেরিয়ে রাত দশটায় কয়েক মিনিট ভোগ করে, গরু ছাগলের খাওয়ার যোগ্য পচা গমের দামী আটার একটি ঝুটি আলুর দমের একটি আলু আর পালাং পেঁয়াজ বাঁধা কফির মেশাল হেঁচকি দিয়ে থেয়ে উঠে সমরেশ নিজের হাতে তৈরী করা কড়া খানিকটা তামাক নিয়ে গাঁজা খাবার মত ছোট কন্দিটাতে সযত্নে সাজায়, একটি টিকা ধরিয়ে ভেঙ্গে টুকরো করে কন্দিতে সাজিয়ে বাপের কেলে বাওয়া গড়গড়ার জল বদলিয়ে, নলটা একটু সামলে স্তমলে নিয়ে টান দিতে সুরু করে। ধোঁয়া টেনে নিয়ে অন্তত আধঘণ্টা মশগুল হয়ে থাকার উপায় সে আবিষ্কার করেছে।

বাজারে বিক্রি মদে কে কোন মশলা দেয়, যারা দিয়ে থাকে তারা ছাড়া কেউ জানে না।

বাজারের তামাকে কি মশলা মেশানো হয় তামাক বেচার কারবারের কর্তারা ছাড়াও অল্প কেউ কেউ সেটা জানে।

একথা অবশ্য ঠিক যে জানার বোঝার কোন অর্থই হয় না যারা জানতে চায় বুঝতে চায়।

অনেকেই বিপাকে পড়ে মদ আর তামাকের নেশা থেকে রেহাই পেতে চায়। রেহাই যদি পেতে চাইবে তবে ঝাঁকড়ে ধবেছিল কেন ইচ্ছাশক্তি ভোঁতা করে দেওয়া নেশাকে অত বেশী আগ্রহ আর আনন্দের সঙ্গে? বহুকাল মজা লুটবার পর স্বাস্থ্য বা পয়সার অসুবিধা দেখা দিলে রেহাই চাইলে চলবে কেন।

এতদিন যারা মজা জুটিয়ে এলো, তাদের বুদ্ধি আর দরকার নেই মুনাকার ?  
এইসব কথাই ভাবছিল সমরেশ ।

ভাবছিল মানে শক্ত কাঠের আস্ত টেবিলটার গায়ে ঠেকানো অনেক দামী  
হাঙ্কা ভাঙ্গা চেহারটার বসে সারাদিনের বরাদ্দ তিনটে সিগারেটের শেষটা  
ধরিয়ে টানছিল—রাত্রের সামান্য আহারের পাট সেয়ে নিয়ে নিজের তৈরী  
তামাক খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে যথারীতি আবার পরদিন ভোর থেকে সারাদিন  
খাটার জন্য তৈরী হতে ।

সুনীতি তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ।

সিগারেট ছিটকে যায় ।

অলস সিগারেটটা সিমেণ্টের মেঝেতে পড়েছে চেয়ে দেখেই সমরেশ জীবন  
থেকে সিগারেট বাতিল করার সিদ্ধান্ত করে নিশ্চিত হয়—তার মুখের  
সিগারেটটা চুরি চামারি করে যোগাড় করা সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী ওই অদাছ  
মেঝেতে পুড়েছে—সে হিসাবটা বরং কবে দেখবার চেষ্টা করবে শুধু বিড়ি টেনে  
খুসী থেকে ।

ছ'চার মিনিটের মধ্যে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে সিগারেটটার স্পেশালভাবে  
তৈরী মেশাল দেওয়া মশলায় অলস টুকরাটুকু । তা যাক । সব দায় সামলে  
নিশ্চিত মনে দামী টিনের সিগারেট যত খুসী খেয়ে যাবার অবস্থা যতদিন না  
হবে ততদিন শুধু যে নিজের পয়সায় বরাদ্দ তিনটে সিগারেটও খাবে না তাই  
নয়, কেউ অফার করলেও সিগারেট হোঁবে না ।

: এবারও সেরকম হল সূ ? ওষুধ খেয়ে কোন ফল হল না ?

: ডাক্তারি চিকিৎসাটা করালে না । ভারি ওষুধ খাওয়াচ্ছ । সন্তা  
ওষুধে এরকম ভীষণ ব্যথা সারে ?

: খেয়েছিস সূ ?

: কি খাব ? কাল থেকে বুকের যন্ত্রণায় খাস ফেলতে পারছি না । কতকণে

তুমি কিভাবে, ততক্ষণ বাচব কিনা জানতাম না দাদা। চুপচাপ সব সহ করেছি। আর পারছি না।

সুনীতি তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শান্ত শব্দ হয়ে যায়।

সমরেশ ধীরে ধীরে তার মাথা চুলকে দেয়, তাকে আদর করে বাপের প্রতিনিধির মতই মেহ দিয়ে ভরসা দিয়ে দায় নিয়ে।

ডাক্তারের কাছে কি ছোট্টা যাবে এখন বোনের এই দুঃসহ'যাতনার প্রতিকারের জন্ত? বাকীতেই হয়তো আনা যাবে ওষুধটা।

কিন্তু দেহমন সাড়া দেয় না।

: একটা ওষুধ দিচ্ছি, সেয়ে যাবে।

নিজেই ডাক্তারি করে। অসহ্য রকম মাথা ধরলে বা অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমের জন্ত ছটফট করলে সমরেশ একটা বড়ি খায়।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত অজ্ঞান অবশ মনে হবে দেহমন, জেনেও খায়। এখনকার যাতনা তো ঘুচে যাক।

আগামী কালের ভোঁতা নিস্তেজ কষ্টকর অবসাদের ব্যাপার বোঝা যাবে আগামী কাল।

কয়েকটা বড়ি বাড়ীতে মজুত থাকে। সুনীতিকে সে অবশ্য আস্ত বড়ি দেয় না, দাড়ি কামাবার স্নেহ দিয়ে ছ'খণ্ড করে আধখানা বড়ি তাকে খাইয়ে দেয়।

আরও আধ ঘণ্টা কেটে যায়। সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। ঘুমানোর জন্ত ওই বড়ি খাওয়ার বদলে সে নিয়ম ভঙ্গ করে টেনে যায় আরও দুটো সিগারেট।

আজই বিকালে প্যাকেটটা কিনেছিলে। এক সঙ্গে দশটা সিগারেট কিনলেও কঠোরভাবে দিনে কেবল তিনটে টেনে নিজের নিয়ম পালন করে আসতে পেরেছে বলেই কিনেছিল।

আজ রাত্রেই আয়াসটুকুর জন্ত একটা খাবে, বাকী ন'টাতে চালিয়ে দেবে তিনদিন এই ছিল তার হিসাব।

কিন্তু আর তো কোন দরকার নেই ওই নিয়ম পালন করার। কাল থেকে সিগারেট ছোঁবে না—কতকাল ছোঁবে না কে জানে। কি হবে পয়সা দিয়ে কেনা সিগারেটগুলি জমিয়ে রেখে ভোরে উঠে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে?

তার চেয়ে সাধ মিটিয়ে যটা খুসী টেনে যাক—শেষ টান না হলেও অনির্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রাখা সিগারেট টানা।

সমরেশের মনেও পড়ে না যে সে পরদিন থেকে সিগারেট একেবারে বর্জন করলেও এমন কিছু মাহুষ এখনো তার কারবারের আপিসে আসা-যাওয়া করে যাদের তাকে চা সিগারেট অফার করতে হয়।

হ'এক প্যাকেট সিগারেট মজুত রাখতে হয়। নিজের জন্ত কেনা বলেই পরদিন থেকে আর সিগারেট খাবে না সিদ্ধান্ত করেছে বলেই, এ প্যাকেটটা ওই কাজে না লাগিয়ে নর্দমায় ফেলে দেওয়া ছেলেমাহুষী ছাড়া কিছুই নয়।

সমরেশ ভাবে, সত্যি সে কি অমাহুষ? বাপ ঠাকুর্দা কারবার দিয়ে অনেক টাকা কামিয়ে পাড়ার বড়লোক খ্যাতি অর্জন করেছিল বলে, আজও পাড়ার লোকে তাকে বড়লোক ভেবেছে বলে, সে কি মাহুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি?

এমনি বিগড়ে গেছে তার চেন্তনা যে কোনদিন ওই বাপ ঠাকুর্দার মত হতে পারবে না জেনেও খানিকটা ওদের মত হবার জীবন পণ করেছে?

স্বনীতির এই প্রাণান্তকর যাতনার চিকিৎসা আছে জেনেও কিছু না করেই হাত পা গুটিয়ে বসে আছে?

তার বিছানায় বসে স্বনীতি তার দেওয়া আধখানা বড়ি খেয়েছিল। ইতিমধ্যে চোখ তার ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছে।

: ঘুমোবি না স্ব? আমাকেও তো ঘুমোতে হবে?

: যাই দাদা।

স্বনীতি চলে যাবার পর হু'মিনিটের মধ্যে সমরেশ একটা আন্ত বড়ি গিলে ফেলে।

চিন্তা-জর আর বেশী ঠেকিয়ে চলার সাধ্য তার নেই।



## ছয়

নন্দিতার মার মর মর অবস্থা।

সমরেশ তাই বড়ই সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, মায়ের এমন অবস্থা, পনের বিশ মিনিট বসতে বলতে সাহস পাচ্ছি না।

: ভীষ্ম কাপুরুষ, সাহস পাবে কোথায়? আমার মা অন্তর্থে ভুগছে, তাই জন্তু তোমার কেঁচোর মত বিনয়! মা তো ভুগছে ছ'মাসের ওপর। চিকিৎসা চলছে, কারো কিছু করার নেই। আমি খানিক আগে ফিরি পরে ফিরি তাতে কি আসবে যাবে?

শুনে স্বস্তি পেয়ে গড় গড় করে সমরেশ বলে যায় তার প্রাণের কথা—  
এতদিন ধরে মিলে মিশে নন্দিতাকে সে ঠিক কি ভাবে সব দিক দিয়ে ভাল করে বুঝে ফেলেছে।

নন্দিতা চুপচাপ শুনে যায়, সমরেশের কথা শেষ হলে বলে, তবেই সেরেছে। সত্যি সত্যি প্রেমে পড়লে নাকি আমার? ওদিকে ঝুঁকো না, সাবধান! ছ'জনকেই পচা সেকলে প্রেমের ডোবায় ডুবে মরতে হবে। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর। নেহাৎ যদি পাগল হয়ে গিয়েই থাক, দরজা বন্ধ কর।

সমরেশ চমকে যায়, ভড়কে যায়। তার মুখ থেকে তীব্র ধিকারের একটিমাত্র শব্দ বেরিয়ে আসে, ছি!

: ছি বৈকি। রাত দশটায় একলা পেয়ে প্রাণের সাধটা জানানোর মধ্যে ছি ছি কিছু নেই। অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রেম কিনা তোমার! পচা প্রেমের ডোবায় আমাকে জড়িয়ে সারাজীবন নাকানি চোবানি খেতে চাও। একটা ব্যামো পাঁড়িয়ে গেছে তোমাদের সত্যি। জানো যে সামাজিক ভাবে এক হওয়া সম্ভব নয়, ছ'জনে মিলেমিশেও কিছুতেই আমরা জের টানতে পারব না—

: চুপ কর !

সমরেশের প্রাণফাটা কাতরতা পুরুষালি বজ্র-গর্জনের আর্তনাদে ফেটে পড়লেও নন্দিতা বিচলিত হয় না।

জোর গলায় বলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছাড়া মন ওঠে না জানি। মা বোন বোঁ সবাই বিনা সর্তে চিরজীবনের জন্তু ক্রীতদাসী হবে—নইলে জমবে না।

সমরেশ ধাতস্থ হয়ে বলে, আমি তোমায় জেনেছি বুঝেছি, আমায় ঠকাতে পারবে না। তুমি ভাবছ, আরও অনেক ছুঁতিন বছর ভাবসাব চালাবার পর একদিন একলা পেয়ে প্রেম জানালেই তুমি সোজাসুজি দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা দাও,—এটা আমি বিশ্বাস করব! অত বোকা আমায় ভেবে না। চারটে বোকা বোন নিয়ে আমি দিন চালাই। সব ঝন্ঝাট আমাকে সামলাতে হয়।

: চারটে বোকা বোনের দায় নিয়ে সামলে চলে মেয়েদের আসল ব্যাপার কি বুঝেছ?

: বুঝেছি যে মেয়েরা মোটেই বোকা হাবা নয়, পচা প্রেমের ডোবায় ফাঁকি তারা কেউ মারে না। মেনে নেওয়ার ভান করে নিজের বাঁচে, সন্তানকে বাঁচায়।

: ও বাবা, তুমি দেখছি অনেক কিছু বুঝে গিয়েছ। মেয়েরা প্রেমের ভান করে, পুরুষটা টের পায় না?

: টের পায় বৈকি। প্রথমে না পাক, অল্পদিনেই টের পায়। কিন্তু টের পেলেই বা উপায় কি? মেয়েদের এই ভানটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই বলেই পুরুষরা আবার ভানটা ধরতে না পারার ভান করে। ভান মেয়েদের একচেটিয়া নয়।

সমরেশ বুঝতে পারে না নন্দিতাকে। নন্দিতা বুঝতে পারে না সমরেশকে

রবীন্দ্রনাথের খাঁচার পাখী বনের পাখীর মত বিপরীত বোঝাবুঝির ব্যাপার তাদের নয়—খাঁচার তো শিক ভেঙ্গে গেছে, বনের তো বুক পুড়ে গেছে।

হ'জনে একেবারে হু'ভাষায় কথা কয় না। হ'জনের একেবারে বিপরীত চেষ্টা। নয় যে এর জগৎ ওর জগৎ একেবারে হুরকমের দুটো জগৎ হয়ে যাবে।

জগৎ তাদের একাকার হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীর ছেলে সমরেশ আর তার চেয়ে হু'এক বছরের বড় উচ্চশিক্ষিত আধুনিক চাকুরীজীবী পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে নন্দিতার জগৎ।

ঠিকভাবে না জড়িয়ে এলোমেলো ভাবে প্যাচ কষে কষে জড়িয়ে যাওয়ার কলে হয়েছে বিভ্রাট।

প্রেম কেন প্রয়োজন হয় মানুষের ? প্রত্যেক মানুষের ?

নারী পুরুষ নির্বিশেষে ?

সমরেশ ভাবে ! ভাবনার কুল কিনারা পায় না।

প্রাণে অবশেষে জিজ্ঞাসা জাগে, প্রেম কি ? কিসের জন্ত প্রেম ?

কে জানত এমন অকস্মাৎ মরে যাবে ভবানীর বিরাট কিন্তু প্রায় শূন্য বাড়ীর আদরিণী মহারানী সরমা।

আরেকদিন ঝোঁকের মাথায় সমরেশ ছপুরবেলায় হাজির হয় ছোটমামার বাড়ীতে। তার মাথায় একটা প্র্যান এসেছে। বনমালীর হিসাব নিকাশ বাবু দিয়ে প্র্যানটা কার্যকরী করা যায়।

মামীকে ধরে যদি হাসিল করা যায় প্র্যানটা।

সরমা শুনে ছিল।

আজ আর সে ভদ্রতা জানিয়েই সমরেশকে ঝি ঝিগুনীর হাতে সমর্পণ করে পাশ ফিরে শোয় না।

খাটে বসিয়ে ক্ষীণস্বরে বলে, কিছু খাবি ?

ঃ খাব না মামীমা ।

ঃ কিছু থা । তুই এসে যে কিছু খেয়ে যাস সেটা আমার জেনেও সুখ,  
দেখেও সুখ ।

খাটে লাগান একটা বোতাম টিপতেই সুন্দরী এসে দাঁড়ায় ।

ঃ ওকে খেতে দে । কাল যা যা বানাতে বলেছিলাম সব বানিয়েছিস তো ?

ঃ সব বানিয়েছি মা ।

ঃ সবরকম কিছু কিছু সাজিয়ে এনে দে । আমার সামনে সমু খাবে,  
আমি দেখব । কদিন না বলেছি তোদের সমু এলে যত রকম খাবার থাকে  
সব ওকে দিবি, খেতে পারুক আর না পারুক, ফেলনা যাক ?

তিন চার মিনিটের মধ্যে খাটের পাশে হাজির হয় উপরে কাঁচ বসানো  
ঘরোয়া ছোট টিপয় আর আনুসঙ্গিক ইম্পাতের চেয়ার ।

সাত আট রকমের খাবার আসে দামী পাণ্ডে সুসজ্জিত হয়ে কিন্তু দেখলেই  
টের পাওয়া যায় যে ছ'একটি ছাড়া বাকী সব হোটেল রেস্তোরাঁ ময়দার দোকান  
থেকে কিনে আনা হয়েছে ।

সরমা যেন ক্ষেপে যায় ।

বলে, রামসিংকে ডাক তো ।

রামসিং এসে সেলাম জানিয়ে দাঁড়ালে কথা টেনে টেনে বলে, ঝি রাখুনি  
সবকো নিকাল দেও বাড়ীসে ।

রামসিং আরেকবার সেলাম ঠুঁকে বলে, বহত আচ্ছা, হজুর ।

বালিশে আছড়ে পড়ে সরমা বলে, যা দিয়েছে তাই থেকে বেছে বেছে  
খা সমু ।

হঠাৎ এমন রেগে উঠে নির্জীব হয়ে শুয়ে পড়া এবং তার কাতর অস্বাভাবিক  
কণ্ঠস্বর সমরেশকে বিহ্বল করে দেয় ।

সে বলে, ছোটমামী, আমার তো খিদে নেই ।

সরমা সাড়া দেয় না ।

কয়েক মিনিট নিশ্পন্দ হয়ে পড়ে থেকে সে আছাড়ি বিছাড়ি শুরু করে।  
সমরেশ তাকে ডাকে, সাড়া পায় না।

দু'তিন মিনিট স্থিতি করে বৈকি সমরেশ।

তারপর সে টেলিফোন করার চেষ্টা করে ভবানীকে।

ভবানীর নিজের বাড়ীর টেলিফোন বলেই বোধ হয়,—হঠাৎ কোঁকের বশে তাকে টেলিফোনে কিছু বলতে চেয়ে কানেকশন পেতে দেরি হলে সরমা ভয়ানক চটে যেত বলেই বোধ হয়—ভবানী বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল যে তার বাড়ীর টেলিফোনের ডাক অল্প অনেক বাজে লোকের তাগিদ ডিঙিয়ে তার কাছে তাড়াতাড়ি পৌছবে।

ভবানী বোধ হয় জরুরী কাজে ডুবে গিয়েছিল।

তার একটু রিঅাক্টিবুর্গ কণ্ঠস্বর তার বেয়ে ভেসে আসে, কি হয়েছে, কি হয়েছে, কেন বার বার বিরক্ত করছ সমু?

সমরেশের মাথায় ঝিলিক দিয়ে যায় যে তার মত মামীর ডাক নামও সমু—তার মামা বিরক্ত হয়েও ওই নামেই তার মামীকে আদর ভরা শাসনের সুরে ডাকে!

ভড়কে গিয়ে সে সরল সহজ ভাষায় বলে, আমি সমরেশ কথা বলছি, আপনাকে এখুনি ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে বাড়ী আসতে হবে। ছোটমামী বোধ হয় মরে যাচ্ছে।

: মরে যাচ্ছে মানে?

: অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তার পরেই পাগল হয়ে যাবার মত করছে। শীগ্গির আসুন—তাড়াতাড়ি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ চাপ।

: তুমি পালাবে না তো?

: পালাব মানে? আমি আছি। শীগগির আসুন, কি করব ভেবে পাচ্ছি না!

বলতে বলতে হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ে ঝাওয়ার অবিলম্বে তার কি করা উচিত সে বিষয়ে ভবানী টেলিফোন বলে দিলেও সে শুনতে পায় না।

তাতে বিশেষ কিছু আস যায় না। কারণ, ভবানীর উপদেশ কানে না গেলেও ডাক্তার ডেকে আনার কথাটা হঠাৎ খেয়াল করেই তার হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ বিপদ ঘটায় মাথা বিগড়ে যাবার জন্ম নয়। স্বাভাবিক কারণেই আগে ডাক্তার ডেকে তারপর মামাকে খরর দেওয়ার কথাটা তার খেয়ালে আসেনি।

ছেলেবেলা থেকে তার মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে এ বাড়ীতে তার কিছুই করার নেই। ছোটবড় ব্যাপারে হোক আর বিপদ আপদে হোক—যা কিছু করার এ বাড়ীর মানুষেরাই করবে।

তার কিছু করতে চাওয়া উচিত নয়।

কাছাকাছি গোটা তিনেক ডাক্তারখানা আছে। কিন্তু দুপুরবেলা ডাক্তারখানায় কি ডাক্তার থাকে।

সমরেশ নীচে নেমে সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করে, কাছাকাছি ডাক্তার আছে ?

সুন্দরীর নীচের ঘরে রেডিও শুনছিল! সরমা দরওয়ানকে ডেকে বাড়ীর সব ঝি ঝাধুনীদের সরাসরি বিদায় করার হুকুম দিলেও ওরা সবাই নিশ্চিন্ত মনে বসে জটলা পাকাচ্ছে দেখেও রামসিং শুধু উকি দিয়ে যায়। কিন্তু মাথা ঘামাবার দরকার হয় না। সে আগেই টের পেয়েছিল যে সরমা মাঝে মাঝে ওইভাবে রেগে উঠে দরওয়ানকে ডেকে ওদের তাড়িয়ে দেবার হুকুম দেয়—কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যায় হুকুম দেওয়ার কথা।

সুন্দরী বলে, পাশের বাড়ীতেই যে মস্ত নাম করা ডাক্তার। ডাক্তার কি হবে ?

: মামীমা মরে যাচ্ছে।

মস্ত বড় ডাক্তার। বাইরে লটকানো নাম পড়ে সমরেশ স্বস্তি বোধ কর। আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে কদাচিত্ এলেও অনেক বছর ধরে অনেকবার তো এসেছে ছোটমামার বাড়ী, পাশের বাড়ীতে এমন একজন নামকরা ডাক্তার থাকে এটা কোনদিন খেয়ালও করে নি!

কলিং বেলটা টিপে ধরে থাকে। রোগা লম্বা যোয়ান বয়সী একজন লোক দড়াম করে দরজা খুলে খাবড়া মেয়ে কলিং বেল থেকে তার হাতটা ধসিয়ে দিয়ে ধমকের সুরে বলে, কি ইয়াকি হচ্ছে?

সমরেশ কিছুমাত্র ভড়কে না গিয়ে মাথা উঁচু করে আরও জোরালো ধমকের সুরে বলে, ইয়াকি নয়। ভবানীবাবুর স্ত্রী মরে যাচ্ছেন—ডাক্তারবাবুকে এখুনি যেতে হবে! ভবানীবাবুকে ফোন করা হয়েছে, উনি আসছেন।

মোটাসোটা গিন্নিবারি গোছের একজন মহিলা কোথা থেকে সামনে এসে হাজির হয়ে বলে, সরমার রোগ তো নিত্যি লেগেই আছে। খেটেখুটে এসে সবে মাহুষটা একটু শুয়েছে, বিকেলে গেলে হয় না? এমন কি গুরুতর ব্যাপার হল হঠাৎ! তুমি কে হও সরমার?

সমরেশ জোর গলায় বলে, আমি ভবানীবাবুর ভাগ্নে। মামীমা মরে যাচ্ছে—ডাক্তারবাবুকে এখুনি যেতে হবে।

: ও, তাই বল।

পাশের বাড়ীর জরুরী বিপদে পাশের বাড়ীর ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে যেতে এত সময় লাগে!

মিনিট দশেক পরে ঘুম ভাঙানোর জন্ত জুঁক ও বিরক্ত ডাক্তার ব্যানার্জি প্যান্টালুনের ওপর একটা হাওয়াই কোট চাপিয়ে ব্যাগ হাতে নেমে এসে বলে, চলো যাই।

সরমার জ্ঞান খানিকটা ফিরেছিল। বিছানায় ছটকট করছিল। সরমাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার ব্যানার্জি একটা ইনজেকসন দেয়।

গভীর বিষমুখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার ছটফটানি লক্ষ্য করে।

মিনিট পনের পরে সরমার ছটফটানি আছাড়ি পিছাড়ি খাওয়ায় পরিণত হলে আবার তাকে পরীক্ষা করে আরেকটা ইনজেকসন দেয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সরমা যেন শান্ত হয়ে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর সরমার নাড়ী পরীক্ষা করেই সে ধীরে স্তব্ধে বেরিয়ে যায়। সমরেশ ভাবে, হঠাৎ কি হল?

ছটফট করছিল, বেশ তো শান্ত হয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাশে চলতে চলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সমরেশ প্রশ্ন করে, মরে গেছে, না? কেন মরল ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার ব্যানার্জি সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়ায়, ধীর শান্ত মিষ্ট ভাষায় বলে, আমার তো তা বলার কথা নয়। আমি এসেছি চিকিৎসা করতে, যদি পারি মরণ ঠেকাতে। যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, তবু দেখলাম মরে গেছেন, আমার কিছুই করার নেই! তাই চলে এলাম।

একটু থেমে ঝাঁঝের সঙ্গে আবার বলে, তোমার মামীমা কেন মরেছেন জানো? তোমার মামার বোকামির জন্ত! হার্ট খারাপ ছিল, হিষ্টিরিয়ার জন্ত ড্রাগ খেতেন। আমি বারণ করেছিলাম, পাশের বাড়ীর ডাক্তার কিনা, কলেজে পড়া বয়স থেকে দেখে আসছেন, আমার পরামর্শ তাই কানেও তুললেন না।

ভবানীর মোটর এসে থামে।

: কি ব্যাপার ব্যানার্জি? আজ আবার কি হল? সেই হিষ্টিরিয়ার নতুন আরেক ব্যাপার তো? তার প্রশ্ন কানে না তুলে, তার দিকে না তাকিয়ে ডাক্তার ব্যানার্জি গট গট করে এগিয়ে পাশের গেট দিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যায়।

ভবানী জিজ্ঞাসা করে, ব্যানার্জি কি বলল রে?



সমরেশ কেঁদে বলে, মামীমা মরে গেছে ।

কে জানত ছোটমামীর মরার পর ছ'মাস কাটতে না কাটতে নন্দিতাকে ভবানী বিয়ে করে ঘরে আনবে !

নন্দিতা ভবানীর ঘরের বৌ হতে রাজী হবে এটাও ছিল কল্পনাভীত ব্যাপার !

সরমা মারা যাবার মাস চারেক পরে নন্দিতা একদিন সমরেশকে বলে, তোমার ছোটমামার আফিসে একটা ভাল চাকরী খালি আছে, বাগিয়ে দিতে পার ?

: যে চাকরী করছ তাই কর, ছোটমামার আপিসে চাকরী করে কাজ নেই ।

: তোমার দেখছি খুব মামাভক্তি !

: এরকম থাসা মামা হলে ভক্তি হবে না ?

নন্দিতা একটু ভেবে বলেছিল, আচ্ছা বেশ, চাকরী তোমায় বাগিয়ে দিতে হবে না, তুমি শুধু একদিন আমাকে সঙ্গে করে তোমার ছোটমামার বাড়ী নিয়ে যাবে ।

সমরেশ আশ্চর্য হয়ে বলে, মামার বাড়ীও তুমি চেনো, মামার সঙ্গে তোমার পরিচয়ও আছে—ক'বার ভোজ খেয়ে এসেছো । আমার সঙ্গে যেতে হবে কেন ?

নন্দিতা হেসে বলে, ও চেনার কোন মানে হয় ? কোন উপলক্ষে বাড়ীতে ভোজ খেতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে একমিনিটের চেনাপরিচয়ে ? তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে, আরেকবার পরিচয় করিয়ে দেবে—তারপর তুমি যা খুসী করো, যেখানে খুসী যেও ।

: মামা কিন্তু আমায় তেমন পছন্দ করে না ।

: তা হোক । তবু আসল সম্পর্কের ভাঙে তো !

সমরেশ আপশোষের স্বরে বলে, বাড়ীতে মামার পাত্তা পেতে কদিন ঘুরতে হয় ছাধো । আপিসে গেলে হয় না ?

: না বাড়ীতে গিয়েই পাশ্চা পেতে হবে।

প্রথম দিনেই তারা কিন্তু ভবানীর পাশ্চা পায়, সকাল সাতটার মধ্যে তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়ে।

ভবানী ঘুমোচ্ছিল।

সাড়ে আটটায় তার ঘুম ভাঙ্গে।

ন'টায় সে নীচে নামে।

মোটাকৈ একটা সিগার হাতে নিয়ে ধীরে স্নেহে ভবানী বাইরের ঘরে তার চেয়ারে বসামাত্র সমরেশ সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতার পরিচয় দিতে সুরু করে, উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওনার নাম—

: ওকে আমি চিনি সমু—পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না।

নন্দিতা মিষ্টি করে হেসে বলে, মনে আছে কি নেই কে জানে, ভাবলাম আপনার ভাণ্ডেকে সঙ্গে করেই আসি। ওর সঙ্গে আমার অনেকদিনের চেনা-পরিচয়।

বাড়ীঘর আসবাবপত্র দাসদাসী তেমনি আছে, সরমা তার শোয়ার ঘরেই আড়াল হয়ে থাকত। মনে করলেই হয় যে সরমা যথারীতি তার ঘরে খাটে শুয়ে আছে!

অন্তের পক্ষে হয় তো সেটা সম্ভব ছিল, কিন্তু সমরেশ এ কল্পনার লেশটুকু বরদাস্ত করতে পারে না। বুদ্ধি করে ডাক্তার ডেকে আনলেও তার আশা ব্যর্থ করে তারই চোখের সামনে সরমা মরে গিয়েছিল। তার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয় যে ছোটমামী ঘরেই আছে, ঘরে গিয়ে ঊকি মারলেই তাকে দেখা যাবে।

এমন উদ্ভট কথা ভাবতে গিয়েও তার দম আটকে আসে। কাজের ছুতায় ভাড়াভাড়ি সে বিদায় নেয়।

নন্দিতার বাবা একেবারে ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে নিমন্ত্রণ করতে আসার আগে সে কল্লনাও করতে পারে নি নন্দিতা আপিসের চাকরীর সন্ধানে ছোটমামার নাগাল ধরতে গিয়ে একেবারে তার বাড়ীতে বৌগিরির চাকরা বাগিয়ে বসবে !

কুমার বলে, একরকম তো কতই হচ্ছে ভাই। এক একজন মানুষ থাকে বৌ না হলে দিন চলে না। ছ'একটা আলগা আছে, বাঁধা আছে—মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে নতুন নতুন জাগায় হৈ চৈ করেও আসে—কিন্তু বাড়ীতে যেমন তেমন একটা বৌ না হলে দিন কাটে না। একটা অভ্যাস হয়ে যায় আর কি—নেশা দাঁড়িয়ে যায়।

সমরেশ বলে, আমি ছোটমামার কথা ভাবছি না। ছোটমামার বাইরে যতই ভড়ং থাক, ধাতটা যে সংসারী জমিদারের—তা আমি জানি। দরকার হলে ছোটমামা দশটা বিয়ে করবে। কিন্তু নন্দিতা রাজী হল কি বলে ?

: মানুষ নিরুপায় হলে এরকম অনেক কিছু করে। স্নাইসাইড করার চেয়ে ভালো তো ? নন্দিতারা কখনো স্নাইসাইড করে না ! ভবানীবাবুর কত টাকা সেটাও তো দেখতে হবে।

: তাইতো ভাবছি। কিন্তু ভেবে বুঝে উঠতে পারছি না কি করে নন্দিতাও শেষে টাকার লোভে কারু হল।

: শুধু টাকার লোভে নয়, বিপাকে পড়ে ওদের অবস্থা কাহিল দাঁড়িয়েছে জানিস না ?

নেহাৎ ঘটনাচক্রে নয়, নন্দিতার চেষ্টাতেই সমরেশের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

সমরেশ অবশ্য তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে কিন্তু নন্দিতা অত্যাধিকারের মেয়ে।

সাধ করে ধারে কাছে না ভিড়ুক, কোন নিমন্ত্রণ না রাখুক, নন্দিতা এসে পাকড়াও করবে এই অসময়ে বাড়ী ছেড়ে পালাতে সমরেশ রাজী ছিল না।

খুব ভোরে মোটর চেপে একেবারে তাদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়ে নন্দিতা একদিন তাকে পাকড়াও করে।

সমরেশও কম চালাক নয়। একা তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ সে নন্দিতাকে দেয় না।

সে সোরগোল তুলে দেয় যে ছোট মামার নতুন বৌ এসেছে—জাগো, জাগো, সবাই জাগো!

আদর অভ্যর্থনা জানাও ছোটমামার নতুন বৌ-কে!

বাড়ীর সকলের কাছেই সমাদর জোটে নন্দিতার, এত ভোরে তার আসবার কারণ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়, পাঁচজনের সামনে সাধারণভাবে সমরেশের সঙ্গে কথাবার্তাও সে বলতে পারে অনেক—কিন্তু একান্তে তার সঙ্গে আসল কথা বলার সুযোগ একেবারেই সে পায় না।

মাঝে মাঝে একটু বিন্ময়ের সঙ্গেই সে সমরেশের মুখের দিকে তাকায়। তার মনের ভাব বুঝতে সমরেশের কষ্ট হয় না। সে আশ্চর্য হয়ে ভাবছে যে বোঝাপড়ার প্রস্তুতি বাদ থাক, কৈফিয়ৎ দেবার কিছুই নেই ধরে নেওয়া হোক, সাধারণভাবে তার মনের ভাব আর হিসাব-নিকাশটা জানবার জন্যও কি এতটুকু কৌতূহল নেই সমরেশের? হাঙ্কা সুরেও কি সে কোন মন্তব্য করবে না বন্ধু থেকে এমন আচমকা তার ছোটমামী হয়ে যাওয়া সম্পর্কে?

নন্দিতার বিদায় নেবার সময় সমরেশ নিজে থেকে বলে, চলো তোমায় পৌছে দিয়ে আসি

শ্রীতি হেসে বলে, আহা, ও যেন নিজেকে নিজেকে যেতে পারবে না ! বাড়ীর  
গাড়ীতেই তো এসেছে ।

: গাড়ীতে একটু হাওয়া খেয়ে আসি ।

নন্দিতা হাই তোলে, গাও তোলে । বলে, না এবার যাই । বাবাকে  
একবার দেখে যাব, বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ।

গাড়ী ছাড়তেই নন্দিতা বলে, তোমার ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না ?  
জালা হয়েছে, রাগ করেছে, তামাসা করছ, না—?

: ওসব কিছু নয় । রাগ করব কেন ? জালাই বা হবে কেন ? তুমি হলে  
এখন গুরুজন, তোমার সঙ্গে তামাসা করতে পারি !

ড্রাইভার কথা শুনছিল । সমরেশকে ইশারা করে নন্দিতা আলোচনা  
স্থগিত রাখে ।

বাপের বাড়ী পৌঁছে গাড়ী ছেড়ে দেয় ।

মিনিট দশেকের মধ্যে সে সমরেশকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামে । তার বাবার  
শরীর আজ অনেকটা ভালই আছে ।

: নন্দিতা প্রশ্ন করে, একবার তো জিজ্ঞাসাও করলে না কি করে  
অসম্ভবকে সম্ভব করলাম ?

: অসম্ভব কিসের ? ছোটমামা তো আবার বিয়ে করার জন্ত লাফাচ্ছিল—  
অনেক ভাগ্যে তোমায় পেয়েছে !

নন্দিতা একটু হেসে বলে, সে অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা বলছি না,  
আমার নিজের দিকের কথা বলছি ! একবার ভাবলেও না আমি নিজেকে  
কি করে রাজী করলাম ?

সমরেশও হেসে বলে, ওটা বোঝা সোজা কথা—টাকার লোভ সামলাতে  
পার নি !

নন্দিতা মাথা নেড়ে বলে, আমিও ভাই ভাবছিলাম—একটা কিছু  
ধরে নিয়েছ, তাই চুপচাপ । না, শুধু টাকার লোভ নয় । অত সস্তা আমায়

ভাবতে পারলে ? টাকাটাই অবশ্য আসল কথা—কিন্তু টাকার লোভটা বড় কথা নয়। খুব শাড়ী-গয়না পরব আর মজা করব, ওসব সখ আমার কোনদিন ছিল না, এখনো নেই জানো তো ?

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করে, তোমার তাড়া নেই তো ?

সমরেশ বলে, তাড়া আছে, তবে আমাদের কথা শেষ করা যাবে না এমন তাড়া নেই।

: তা হলে হাঁটতে হাঁটতেই এগোই চল। কয়েকটা হিসাব করলাম। বই তিনটে ছাপানোর হিসাব, বাবার হিসাব, ভাইবোনদের হিসাব—ভাবলাম কি জানো ? চাকরী যদি বা পাই তাও হবে দাসীগিরির সামিল, অথচ কাজের কাজ কোনটাই হবে না, কোন ইচ্ছা মিটবে না। তার চেয়ে টাকাওয়া মানুষটার বৌগিরি করলে দোষ কি ? একটা স্বামীর মন যুগিয়ে সামলে চলা ভারি কাজ !

: সইতে পারবে ? সব হিসাব তো কষেছ, নিজের সহশক্তির হিসাব কষেছ তো ? আগের মামীকে ড্রাগ্‌স সঞ্চল করতে হয়েছিল, বিছানা নিতে হয়েছিল।

: ভড়কে দিও না ! আমি কি ওরকম নরম মেয়ে ?

: তা হলে তো ভালই হয়েছে। মামীর কথা ভাবলে মনটা একটু খুঁতখুঁত করে, তা ওসব কেটে যাবে।

এবার নন্দিতা একটু মুখ ভার করে বলে, কিন্তু সম্পর্ক তুলে দিলে তো চলবে না ! তোমরা সবাই বাতিল করে দিলে আমি নিজের মনে জোর খুঁজে পাব কোথায় ?

সমরেশ তাড়াতাড়ি বলে, সম্পর্ক তুলব কিরকম ? সবে তো সম্পর্ক তৈরী হল। সম্পর্কটা গড়ে উঠতে দাও। তুলে গিয়ে মামার সামনে তোমার সঙ্গে আগের মত ইয়ার্কি দিয়ে বসলে কি হবে জানো, মামা কানটি ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেবে। মামা ভীষণ বৌ-কনাস্—ওই ভয়েই তো যাই না। বৌ-

পাগলা মাছ, টাটকা মডার্ন বৌ পেয়েছে, মাথাটা একটু বিগড়ে আছে নিশ্চয়।

নন্দিতা সায় দিয়ে বলে, তা ঠিক বলেছ। এমন ভাব করে যেন কোনদিন বিয়ে করেনি, বৌ ছিল না, অনেক ভাগ্যে একটা বৌ পেয়ে গেছে—কে কখন কেড়ে নেয়। আগের জনের সঙ্গেও এই রকম করত ?

: করত বৈকি। আমার আদর আর পাহারার চোটেই তো হিষ্টিরিয়া জন্মে গিয়েছিল।

: এত তাড়াতাড়ি কি করে ভুলে গেলে ভাবি। মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যাই, মাঝে মাঝে ঘেমা করে।

সমবেশের মুখ গভীর হয়ে যায় কিন্তু গলার আওয়াজ বদলায় না।

: ছাপা হোক বা না হোক, তুমি না তিনচারখানা বই লিখে শেষ করেছ ? তোমার এটুকু বিচারবুদ্ধি নেই ! আগের বৌকে মামা ভোলেনি।

: ভোলে নি ?

: না, এখনো কষ্ট হয়—কিন্তু মামার শোক দুঃখ সব মনে মনে—তুমিও কোনদিন টের পাবে না। মামাব সোজা হিসাব। যে গেছে সে তো গেছেই, কেঁদে মরলে বা সব ত্যাগ কবে সম্যাসী হলে সে কি আর ফিরবে ? মামা মনে কবে না যে আগের মামীর জায়গায় তুমি এসেছ, আগের মামীকে আদর করার কোন সম্পর্ক আছে। তুমি নতুন পৃথক আরেকটি বৌ, তোমায় নিয়ে পাগল হবার মধ্যে আগের বৌকে ভুলে যা়াব প্রস্নই আসে না !

নন্দিতা যেন বেশ খানিকটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই বলে, তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালই হল মনে হচ্ছে। এ কথাগুলি জানা আমার খুব দরকার ছিল।

সমরেশ সহজভাবেই বলে, মামাকে তুমি আমার চেয়েও ভালভাবে জানবে বুঝবে নিশ্চয়ই, তোমায় বললে দোষ হবে না। মামা আসলে হল আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষ। হৃদয়হীন বলা যায় না, কারণ মামার হৃদয় আছে—কিন্তু

যাদের আপন মনে করতে পারবে শুধু তাদের জন্ত হৃদয়টা রিজার্ভ করা । আমি একমাত্র ভাগ্যে কিন্তু আমি আপন হতে পারি নি, আমার জন্ত তাই একফোটা দরদ নেই, মরি ঝাঁচি এসে যায় না ! কিন্তু তুমি নিজের বৌ, আদরের চোটে তোমায় অস্থির করে দেবে, পাগল করে দেবে, তোমার আরাম বিলাস স্নেহের জন্ত সব সময় ব্যাকুল হয়ে থাকবে ।

খানিকক্ষণ নীরবে তারা পথ চলে । রাজপথ ক্রমে ক্রমে বেশী বেশী ব্যস্ত ও কোলাহল-মুখর হয়ে উঠছে ।

সমরেশ আবার বলে, যা আন্সার করবে তাই পাবে, খুসীমত যখন তখন যেখানে সেখানে যাওয়া আর সকলের সঙ্গে বেশী মেলামেশার স্বাধীনতাটুকু ছাড়া ।

নন্দিতা বলে, এও যে বিষম কথা হল !

: বৌ-গিরি করবে, মানিয়ে চলবে হিসাব করেই তো তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছ ? আরামে থাকবে ভাবছ কেন ? আজ্ঞে বাজ্ঞে চাকরী করা কি কম ঝন্ঝাটের ব্যাপার !

বাড়ীর কাছাকাছি পৌছে গিয়ে নন্দিতা বলে, সময় করে মাঝে মাঝে এসো ।

: আসব ।



## সাত

মহাসমারোহে নন্দিতার তিনখানা মোটা মোটা বই পন্ন পন্ন বেয়িরে  
সাময়িক একটা আলগা হৈ চৈ সৃষ্টি করে বই-এর বাজারে ।

বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে ।

মোটা বই ।

কাগজ ভাল ।

ছাপা ভাল ।

বাঁধাই ভাল ।

মলাটে তেরঙ্গ ছবি ।

দাম বে-হিসাবী রকম কম !

কয়েকটা কাগজে গা-বাঁচানো চিনি গোলা সরবতের মত প্রশংসা বার হয় ।  
শ'দেড়েক বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে বই উপহার যায় । বিজ্ঞাপন ছাপা হয় প্রায়  
সর্বত্র ।

তবু ছ ছ করে বই বিক্রি হয় না । বিয়ের তারিখে খানকয়েক বই শুধু  
কাটে ।

নন্দিতার বদলে রেগে যায় ভবানী ।

সমরেশকে ডাকিয়ে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নন্দিতাকে বলে, গোস্বখ্যের  
দেশ, না আছে রুচি না আছে কৃষ্টি । তোমার বই-এর কদর এদেশের লোক  
কি বুঝবে ?

সমরেশ ক্ষীণ প্রতীবাদ জানায়, এদেশের লোকের ভাষায় লেখা বই,  
এদেশের লোক যদি না নেয়—

ভবানী ব্যঙ্গ করে বলে, এদেশের ভাষাই কত বোঝে এদেশের লোক ।

নন্দিতা বলে, তুমি অস্থির হ'য়ো না। হঠাৎ হ হ করে কার কটা বই কাটে ? আস্তে আস্তে নাম হবে, আস্তে আস্তে বই কাটবে, এটাই নিয়ম।

ভবানী টেবিলে চাপড় মেরে বলে, তাই যদি হবে তবে পাঁচ হাজার ছাপালাম কেন ? চার পাঁচশো ছাপলেই হত !

নন্দিতা বলে, আমি বলিনি তোমায় ? বার বার বললাম, পাঁচশো কি হাজার ছাপো—অত দামী কাগজ দিও না। তুমি গ্রাহ্যও করলে না।

ভাবনী হঠাৎ উদার হয়ে বলে, যাক গে। তোমার লেখা বই তো, সবগুলো কপি নয় বিলিয়েই দেব।

সকলে চুপ করে থাকে।

ভবানী একটু হাসে, তুমি বই লিখেছ, আমায় মান তাতে কত বেড়েছে জানো ?

সমরেশ বুঝতে পারে নন্দিতাকে ভবানী বড় বেশী মাথায তুলে নাচাচ্ছে। তবে এখনো ভবানীর বিকৃত উগ্রতার ঝাঁঝ তার মধ্যে তেমন জ্বালাবোধ জাগায় নি—যে ঝাঁঝে ঝলসে গিয়েছিল সরমা।

মায়া বোধ করে সমরেশ।

এই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা অভ্যাগ্র মোলায়েম আদর তো আরও বেশী অসহনীয় হচ্ছে নন্দিতার ?

ভবানী বেরিয়ে যাবার পর নন্দিতা বলে, চলো একটু হেঁটে আসি, দম নিয়ে আসি।

রাস্তায় নেমে বলে, ভেবেছিলাম অল্পভাবে লাগবে, ঠোঁড় বাধবে। এত বেশী মন জুগিয়ে চলছে যে তাতেই বিস্ত্রী লাগছে। আমি যেন কচি খুকী, একটু কড়া কথা বললেই কেঁদে ফেলব—ঠিক এমনভাবে মন জুগিয়ে চলছে। এমন বিস্ত্রী লাগে !

: আদর পেয়ে বিস্ত্রী লাগছে ?

: লাগবে না ? প্রতিদানে চাইছে যে আমিও গলে যাব, আহ্লাদীর মত  
বুকে মাথা ঝেঁপে কচি খুঁকীর মত আদর চাইব ।

: আদর সহিছে না ?

: এ নাকি আদর !

খারাপ ব্যবহার নয়, আদরের চোটেই নন্দিতাকে মাঝে মাঝে ছ'এক দিনের  
ছুটি নিতে হয়, বাপের বাড়ী বা অন্য কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসতে হয় !

তাদের বাড়ীতে এসেও একটা দিন কাটিয়ে যায় । নিজে থেকেই বলে যে  
সে খাবে এবং থাকবে ।

প্রীতি আশ্চর্য হয়ে বলে, মামা রাজী হল ?

: রাজী হবে না ? আমি কি তোমাদের বড়লোক মামার জেলখানার  
কয়েদী নাকি ? স্পষ্ট বলে এসেছি যখন খুসী নিজে ফিরে যাব—নিতে পর্যন্ত  
আসবে না !

: আসবে না জানা আছে ।

সব জড়িয়ে ব্যাপারটা তাহলে কি পাড়াল ? নিজের বুদ্ধির জট ছাড়িয়ে  
বুঝতে বড়ই কষ্ট হয় ।

সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই মানুষ চিন্তার জট ছাড়াতে শিখে গেছে । জট বুঝবার  
বুদ্ধি গজায় নি ।

যে ঐক সাধারণ বুদ্ধির অতীত, যে জট ছাড়াতে গেলে নিজেকে ওই জটের  
মধ্যে জড়িয়ে পাকিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে, সে জট বাতিল করে দিয়েছে  
অনায়াসে ।

সমরেশ বলে, ছোট মামা কিন্তু কেঁউ কেঁউ করছে তোমার জন্ত । গেলেই  
কত যে ইয়েটিয়ে পাবে—

: চুপ কর দিকি ।

প্রীতি রুটি বেলতে বেলতে প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, চুপ করবে কেন ? অন্তায়

কথা বলেছে কি ? তুমি চলবে ভাবের বশে, সে দায় ওকে সামলাতে হবে নাকি ? ওর মামাকে ওর ওপরে তুমি বিগড়ে দিচ্ছ। তুমি খালি নিজের দিকটা দেখছ।

: এটা তুমি বানিয়ে বললে। আগেই বয়ঃ ওর ওপর মনটা খুব বিকল্প ছিল, আমি প্রশংসা করে করে অনেক শুধরে দিয়েছি।

: কারবারটা যদি চেষ্টা করে শুধরে দেওয়াতে পারতে তবে তো বুঝতাম তোমার মুরোদ !

: দেখাই যাক না কদর কি হয়।

সমরেশ নিজের মনে একটু হাসে।

সে জেনেছে যে কারবারের আর কিছুই করার নেই, ভবানীও সাধ্য নেই আর কিছু করে। এখন কেবল নিজেকে কতটুকু বাঁচানো যায় তারই চেষ্টা করে যাওয়া।

কারবার তুলিয়ে যাবেই।

তার সঙ্গে এতগুলি মানুষের বসত বাড়ীটাও না যায় এই হচ্ছে এখন সমরেশের সব চেয়ে বড় দুর্ভাবনা।

যে-কোন দিন হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর ভেঙ্গে পড়তে পারে, একরকম পুরানো দালানের মত কারবারের ঠাটটা শুধু বজায় আছে। সমরেশকে রোজ হাজিরা দিতে হয়।

যথারীতি রাত দশটায় বাড়ী ফিরে শোনে যে নন্দিতা নাকি সন্ধ্যা পর্যন্ত এ বাড়ীতে ছিল।

প্রীতি তাকে খেতে দিয়ে হেসে বলে, বিকাল থেকে উসখুস করতে লাগল। কেমন যেন আনমনা ভাব। টের পেয়ে গেছে তো আমার মন-মেজাজ। সন্ধ্যার সময় আরেকবার চা করে বিস্কুট আনিয়ে দিয়েছি, খেতে খেতে বললে কি জানিস ?—ও, ভুলেই গিয়েছি, উনি তো আজ সন্ধ্যার আগে ফিরবেন বলে গেছেন ! কোনরকমে চা-টা গিলে তাড়াতাড়ি একরকম পালিয়ে গেল।

সমরেশ বলে, আমার ওপর আমার মনটা বিরূপ করে দিচ্ছে, এ কথাটা না শোনালেই পারতে।

প্রীতি নির্বিকার ভাবে বলে, কি হয়েছে তাতে। দরকার হলে খোঁচা দিয়েও কথা বলতে হয়। গরু দোয়ানো দেখেছিস কখনো? বাঁট টানতে টানতে বাছুর কিরকম চুঁস্ মারে দেখেছিস? চুঁস না মারলে দুধ ছাড়ে না। তোর জন্তু টান ছিল জানি তো, তাই একটু উস্কে দিলাম, হয়তো কিছু করতে পারে।

আগে খেয়াল করেনি, দু'একদিনের মধ্যে সমরেশ টের পায় যে তার ছোটমামার সঙ্গে নন্দিতার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সমস্ত বাড়ীটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে।

তাদের কবল থেকে নন্দিতা তাকে বাগিয়ে নিতেও পারে, এ আতঙ্ক বাতিল হয়ে গেছে।

সেদিন নন্দিতাকে সকলে কেন এত বাড়াবাড়ি রকম সমাদর করেছিল এবার তার মনেটা সমরেশের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রাণটা জ্বালা করে অনেকক্ষণ!

এত সস্তা হিসাব তার আপনজনদের!

ভবানীকে দিয়ে কারবারটা শুধরে দেবার প্রসঙ্গে নন্দিতা সেদিন বলেছিল, দেখাই যাক না কদর কি হয়।

কথাটায় কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় নি। সকলেই ভেবেছিল, ওটা কথার কথা, কাজে কিছুই হবে না।

সেদিনের পর থেকেই নন্দিতার মধ্যে কেমন একটা রূপান্তর লক্ষ্য করে সমরেশ। নন্দিতা কেমন যেন হাঙ্কা অথচ আগের চেয়ে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

কথাবার্তায় আগে যেটুকুও বা নিজেকে ধরা দিত, এখন তাও দেয় না। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছে।

: ব্যাপার কি ?

: ব্যাপার গুরুতর ।

: শুনেতে পাই না ?

: শুনে কি হবে ? যথাসময়ে জানতে পারবে । তোমার মামী হয়ে আমার হয়েছে আরেক যন্ত্রণা ।

সেদিন সমরেশ আর কিছু বলে না । পরদিন ভবানী নিজেকে থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়ে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কারবারের সব বিবরণ জেনে নেবার পর সে গম্ভীর ও চিন্তিত হয়ে থাকে ।

পরদিন ভবানী দশটা নাগাদ তার অচল কারবারের অচল আপিসে গিয়ে আবার ঘণ্টাধানেক কাগজপত্র পরীক্ষা করলে সে আরও গম্ভীর আরও চিন্তিত হয়ে ঘণ্টা দুই চুপচাপ বসে থাকার পর হঠাৎ রওমা দেয় ছোটমামার বাড়ীর উদ্দেশে ।

সরমা মারা যাওয়ার পর সে আর একবারও হৃপুরবেলা অসময়ে মামাবাড়ী যায় নি ।

নন্দিতাও কি সরমার মত খাটে গুয়ে থাকবে ? দাসী রাঁধুনীর হাতে সংসার ও অতিথি সংস্কারের দায় ছেড়ে দিয়ে ?

বাড়ীতে ঘর অনেক কিন্তু শোয়ার ঘরখানা ছাড়া সরমার অন্ত ঘর প্রায় দরকার হত না, লেখার কাজের জন্য নন্দিতাকে একটি স্পেশাল ঘর দেওয়া হয়েছে ।

নন্দিতা সেই ঘরে ছিল ।

লেখা বা গুরু দেবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে নয়—সরমার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত হয়ে !

দেখে চমৎকৃত হয়ে যায় সমরেশ ।

: এ দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছ ? আগের মামী, মানে ওর নিজের মা, ফিরেও তাকাত না ।

: বেচারার শরীরের অবস্থাটা কিরকম ছিল একবার ভাবো। ওই শরীর নিয়ে বড়ি খেয়ে খেয়ে বেঁচে থেকে মানুষ আর কিছু পারে? বেচারার নিজেকে যে ক’টা বছর বাঁচিয়ে রেখেছিল তাই ঢের। দুপুরবেলা তুমি হঠাৎ?

: আগের মামীর কাছেও বেশীর ভাগ দুপুরবেলাতেই আসতাম। দেখতে এলাম তুমি কি করছ আর শুনতে এলাম কি ভাবছ।

নন্দিতা হাসে না।

: তা হলে দয়া করে বসুন। কিছু থাকেন কি? ঘরে অজস্র খাবার তৈরী হয়, ট্র্যাডিশনটা বজায় রেখেছি।

: খাব—খুব কম কিন্তু।

নন্দিতা গলা বেশী না চড়িয়েই ডাকে, বনার মা?

মাঝবয়সী বিধবা বনার মা এসে দাঁড়ায়। সুন্দরীকে তাড়িয়ে নন্দিতা নতুন লোক রেখেছে।

খাবার আসে অল্প—দোকানের টাটকা সন্দেশ আর সিঙারা। তারপর আসে চা।

বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে নন্দিতা ততক্ষণে তার লেখার টেবিলে গিয়ে বসেছে।

তাকে উপেক্ষা করেই!

টেবিলে শুপাকার গুঁড়।

জিজ্ঞাসা না করেই সমরেশ বুঝতে পারে নন্দিতার চার অথবা পাঁচ নম্বরের বই ছাপা হচ্ছে।

বিড়ি কিনে এনেছিল, চা-খাবার খেয়ে তারই একটা ধরিয়ে সমরেশ বলে, চিরদিনের মত সোজাসুজি কথা বোলো, মামী হয়েছে বলে প্যাচ ক’ষো না।

নন্দিতা হেসে বলে, প্যাচ একটু কষতেই হবে। সোজা কথা বলতে ভুলে গেছি।

: ভবেই সেরেছ।

: কি বলব না শুনে আগে থেকে ভড়কে যাও কেন? কোন্ বিষয়ে বলব সেটা তো জানাবে আগে? কিন্তু তার আগে একটা কথা আমাকে দয়া করে বলে নাও—বিড়ি কেন?

: এটাও বলতে হয়? পয়সা বাঁচাতে।

সমরেশ বিড়ি টেনে টেনে ধোঁয়া ছাড়ে।

: নন্দিতা রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু আগের চেয়ে রূপ যেন তার খুলেছে রোগা হয়ে।

আগে মুখে ছিল পড়ুয়া মেয়েদের ক্লাস্তি আর ক্রিষ্টতার একটা আবরণ সেটা কেটে গিয়ে মুখ উজ্জ্বল হয়েছে।

সমরেশ ভেবে চিন্তে বলে, সোজানুজিই বলি। এ ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝা আমার পক্ষে বিশেষভাবে দরকার। মামাকে দিয়ে তুমি আমার কারবার শুধরে দিতে চাইছ; সেজন্য কি আমার সঙ্গে তোমার কোন বন্দোবস্ত হচ্ছে?

তার শেষ প্রশ্ন শুনে নন্দিতা বলে, ও!

তারপর সে একটু হাসে।

: তা হলে ধরতে পেরেছ যে ব্যাপার গুরুতর? আমিও তবে সোজানুজি বলি। ব্যাপার গুরুতর—কিন্তু তোমার দিক দিয়ে নয়। ব্যাপার গুরুতর আমার দিক দিয়ে।

সমরেশ চুপ করে থাকে।

: আমি একটা ভয়ানক ষ্টেপ নেব স্থির করেছি। তুমি পছন্দ করবে কি করবে না জানি না। ষ্টেপটা আগেই নিয়ে নিতাম—তোমার জন্ম দু'চার মাস দেরী হচ্ছে।

ঘুমের ঘোরে সরমার ছেলে একটু কেঁদে উঠলে নন্দিতা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে একটু খাপড়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে চেয়ারে ফিরে এসে বলে, ভাবধার



কি, হার মেনে যখন পালাবই, শেষ হিসাব কষবই, তোমার জন্ত আর দু'চারটা মাস নয় সয়েই যাই।

: চলে যাবে? পালাবে?

তার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে জানিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠে নন্দিতা বলে, চলে যাব মানে? পালাব মানে? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কী আরামে আছি! কী স্বাধীন সুন্দর জীবন। ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে যেতে পারি—দু'একদিন না ফিরলেই বা কি।

সমরেশ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে। নন্দিতা কাছে সরে এছে নীচু গলায় বলে, আস্তে কথা বলো। বাইরে দু'একদিন কাটিয়ে আসতে দেয়, তাই বলে সারাদিন বাড়ীতে কি করি জানার জন্ত স্পাই রাখা কি বাদ দিয়েছে? সত্যি হার মেনেছি—আর সহিছে না। মানুষটা বাড়ীতে থাকলে তো বটেই, না থাকলেও কেমন একটা দম আটকানো অবস্থায় আছি মনে হয়। বাচ্চটার ওপর সত্যি মায়া পড়েছে, কিন্তু মায়ার খাতিরও টানতে পারব না।

সমরেশ চুপ করে থাকে।

দিন সাতেক পরে সকালবেলা সমরেশকে বাড়ীতে ডেকে নন্দিতার সামনে ভবানী তাকে বলে, কারবারের সঙ্গে বাড়ীটাও যেত, অনেক চেষ্টা করে বাড়ীটাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা ঠিক করেছি! কারবার ছেড়ে দাও। আমি সামলে লুমলে মিটিয়ে দেব।

: বাড়ীটা বাঁচবে মামা?

: দেব বাঁচিয়ে বাড়ীটাকে। তোর নতুন মামী জিদ ধরেছে করব কি। কোনও ব্যাপারে তুই কিন্তু একটি কথা কইবি না সমু। যে যা বলুক, তুই শুধু শুনে যাবি, নেহাৎ যদি চেপে ধরে তো সাফ জানিয়ে দিবি যে মামার কাছে যাও, মামা সব জানে, আমি কিছু জানি না।

বাড়ীটা বাচল।

কারবারের সঙ্গে বাড়ীটাও যেত—ভবানী অনেক কলা কোশল খাটিয়ে কারবারটা বাতিল করে দিয়ে সব দায় থেকে তাকে রেহাই পাইয়ে দিয়ে বাড়ীটা রক্ষা করল।

সমরেশকে খাতির করে বা তাদের কৃতজ্ঞতার আশায় নয়। নন্দিতাকে বশে রাখার জন্ত।

সে বোধ হয় কল্পনাও করতে পারেনি যে সমরেশের ঝন্ঝাটটা যেটার পরেই নন্দিতা এমনভাবে বদলে যাবে, ঘরবাড়ী চাকর দাসী আরাম বিলাসের সঙ্গে তাকেও তাগ করে চলে যাবে!

কোনরকম ঝগড়া ঝাঁটি না করে, কোন নালিশ না জানিয়ে, মুখে তাকে কিছু না বলে!

প্রথমটা বুঝতে পারে নি।

মাঝে মাঝে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়ে বাপের বাড়ী বা অল্প কোথাও দু'একদিন কাটিয়ে আসে, এটাকে সে লেখিকা মানুষের প্রকৃতিগত পাগলামি বলে জেনেছিল এবং মেনেও নিয়েছিল।

নন্দিতার বদলে অল্প কেউ হলে সন্দেহের বিষে জর্জরিত হয়ে যেত ভবানীর প্রাণ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় অনেক আগেই জীবনটা আরও বেশী অসহ্য হয়ে উঠত নন্দিতার। প্রকৃতপক্ষে, তার এই সন্দেহবায়ুর জন্তাই সরমা নিজের বাড়ী ছেড়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই, না জানিয়ে যেখানে সেখানে দু'একদিন কাটিয়ে এলেও নন্দিতার সম্পর্কে ভবানীর এতটুকু সন্দেহ জাগে না।

কিভাবে তার যেন বিশ্বাস জন্মে গেছে যে স্বামীর সঙ্গে ওই ধরনের ছোট-লোকামি নন্দিতা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারবে না, ওসব তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

অন্তান্তবান নন্দিতা তবু একটা শ্লিপ রেখে যেত—‘একটু বেড়িয়ে আসছি, ভেবো না।’ কোথায় যাচ্ছে, একদিন বা দু’দিন পরে ফিরবে, এসবও উল্লেখ করত।

এবার শ্লিপও রেখে দায় নি, দাসী রাঁধুনী বা দরোয়ানকে কিছু বলেও যায় নি।

জিজ্ঞাসা করে ভবানী জানতে পারে যে সে এবার বড় ছটো স্ট্রটকেস নিয়ে গেছে।

সুন্দরীকে তাড়িয়ে নন্দিতাই বনার মা কে রেখেছিল—সকলের আগে তাকে ডেকেই ভবানী জিজ্ঞাসাবাদ করে।

সরমা সংসারের কোন ঝনঝাটের ধার ধারত না। সংসার চালাবার দায়টা নন্দিতা আদায় করে নিয়েছিল।

বলেছিল, তুমি সংসার থরচ দেবে, ঝি রাঁধুনির মাইনে দেবে—ওরা আমায় মানবে কেন?

ভবানী বলেছিল, বেশ তো, তুমিই ওসব দিও। সে তো ভাল কথাই। একটা হিসেব কিন্তু রাখতে হবে তোমাকে।

তার অহুপস্থিতির সময়ে বাড়ীর খবর, সরমার খবর জানবার জন্ত সুন্দরীকে ভবানী সোজাহুজি যত বাড়তি টাকা দিত—বনার মার বেলায় ওরকম খোলা-খুলি ব্যবস্থা করে নি।

বনার মা মাসে দু’বার মাইনে পায়।

একবার পায় নন্দিতার কাছে।

আরেকবার পায় ভবানীর কাছে—পাঁচ টাকা বেশী।

প্রথমবার বুঝতে পারে নি, ছুটির দিন নন্দিতা স্নান করতে গেলে তাকে ডেকে ভবানী বলেছিল, তোমার এ মাসের মাইনে।

বনার মা বলেছিল, মাইনে তো মা আমায় দিয়েছে?

ভবানী কড়া সুরে বলেছিল, আমি কি তা জানি না? বড় বোকা তুমি।

মা কি নিজের টাকায় তোমায় মাইনে দিয়েছে, না, আমার টাকায় দিয়েছে ?  
এ মাইনেটা আমি তোমায় দিলাম ।

হাত পেতে টাকাগুলি নিয়ে কয়েকদিন বনার মা'র বুক কেঁপেছিল, রাতে ঘুম হয় নি ।

কে জানে সে কিসের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল !

তবে কয়েকদিনেই বুঝে গিয়েছিল আসল ব্যাপারটা, ফাঁকে ফাঁকে তার কাছ থেকে ভবানীর সংসার আর নন্দিতার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করার ধরন থেকে ।

সমরেশ দুপুরবেলা এসেছিল, এ খবরটা নিজে থেকে চুপি চুপি জানাতে গিয়ে ধকক খেয়ে বনার মা চালাক হয়েছে । তারপর থেকে ভবানী জিজ্ঞাসা করলে তবেই সে জবাবে খবর জানায় !

ভবানী যা জিজ্ঞাসা করে শুধু তার জবাব—বাড়তি কথা একটিও নয় ।

এবারও ভবানীর প্রশ্নের জবাবেই সে জানায়, ইঁা বাবা, জিজ্ঞেস করেছিলাম । কোথায় যাচ্ছ মা, কবে ফিরবে ?—এমন এক ধমক দিল বাবা আমায়, একেবারে কেঁচো বনে গেলাম ।

এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল ভবানীর কাছ থেকে ডবল মাইনে আর পাঁচ টাকা বেশী বখশিস পাওয়ার জন্তু—কিন্তু আজ বনার মা কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না, বাড়তি কথা বলে বসে ।

বলে, কদিন আগে ভাঞ্ঝাবু দুপুরবেলা এসে অনেকক্ষণ গুজগাজ ফিসফাস করেছিল, আপনাকে বলি নি বাবা ?

ভবানী গম্ভীর হয়ে বলেছিল, যা তুই ।

এবার দিন তিনেক চুপচাপ কাটিয়ে দিয়ে ভবানী একটু চিন্তিত হয়েই নন্দিতার খোঁজ খবর নিতে হবে স্থির করে এবং এটা করতে হবে বলে ভয়ানক রেগেও যায় ।

এত স্বাধীনতা দিয়েছে, একটু জানিয়েও কি যেতে পারে না কোথায় যাবে কদিন বাদে ফিরে আসবে।

কারবার শুটিয়ে সমরেশ কয়েকদিন চুপচাপ ঘরে বসে একটানা শুধু চিন্তা করে যাচ্ছিল যে এবার কিস্তাবে সংসার চালাবার ব্যবস্থা করবে, ভবানী আচমকা তাদের বাড়ীতে হাজির হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোর নতুনমামী কোথায় গেছে জানিস ?

সমরেশ আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনাকে বলে যায় নি ?

: নাঃ।

: পাটনায় ওর মাসীর কাছে গেছে।

ভবানী গভীর খেদের সঙ্গে ঝাঁঝালো গলায় বলে, তোকে জানিয়েছে, আমায় কিছু বলেনি।

: চিঠি লিখবে নিশ্চয়।

: আগে জানানো উচিত ছিল।

খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে ভবানী হঠাৎ বলে, তোর আগের মামীই ভাল ছিল, না রে ?

সমরেশ থতমত খেয়ে কি বলবে ভেবে না পেয়ে দার্শনিক মন্তব্য করে বসে, দু'জন মানুষ কি একরকম হয় ?

ভবানী একটু হাসে।

সিগারেট ধরিয়ে বলে, যাক্গে, যে বোকা হবে নিজের বোকােমির ঠেলা সে নিজেই সামলাবে। যে দু'বার বিয়ে করেছে সে কি তিনবার বিয়ে করতে পারে না ? তোর তিন নম্বর নতুন মামী কিন্তু গরীবের ঘরের মুখ্য মেয়ে হবে সম্মু।

ভবানী বিদায় হওয়া মাত্র সমরেশ পাটনায় নন্দিতাকে সাবধান করে চিঠি লিখে দেয়।

জবাব আসে সংক্ষিপ্ত।

তিন পয়সার একটা পোষ্ট কার্ডে .নন্দিতা লেখে—তুমি কি পাগল হয়েছ ? তোমার মামা এত বোকা নয় যে গরীব মুখ্য মেয়ের দায় ঘাড়ে নেবে । আমি ছাড়া ওর গতি নেই ।

শ্রীতি মুখ বাঁকিয়ে বলে, এ সব পাগলামি করার কোন মানে হয় না ।

: তুমি কেন করেছিলে ?

: আমার বেলা সত্যিকারের কারণ ছিল । দেখছিস না মামলা করার নামেই তোদের বিরামবাবু মাসে মাসে খোরপোষের টাকা পাঠাচ্ছে ? পাটনায় মাসীর বাড়ী গিয়ে ইয়ার্কি মারবে আর মামা টাকা যোগাবে—অত বোকা ছেলে তোর মামা নয় ।

## আট

নিজের কি ব্যারাম হয়েছে কুমার মা-বোনকেও জানায় নি। সমরেশ প্রাঙ্গণ করেছে, কুমার হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

সমরেশ ভয় দেখিয়েছে, আপনজনের কাছে রোগ গোপন করার, রোগ চেপে যাওয়ার বিপদটা ভেবে দেখেছিল? আমাকে তো অন্তত জানাতে পারিস!

: আমার কোন রোগ হয় নি, তোকে কি জানাব? একটা রোগের কথা বানিয়ে বলব?

: এরকম চেহারা হচ্ছে কেন তবে?

: কিরকম খাটতে হয় জানিস না?

তারপর কুমার বলেছে, একটু মুশ্কিল চলছে বৈকি। সেটা রোগ ব্যারাম কিছু নয়। হজমের একটু গোলমাল চলছে। ডিসপেপসিয়া নয়, সব কিছু খেয়েই হজম করতে পারি কিন্তু খাওয়াটা কমে গেছে—যতটা উচিত সে পরিমাণে খেতে পারি না। এটাকে যদি রোগ বলিস, আমার কোন আপত্তি নেই।

সমরেশ জোর দিয়ে বলেছে, এটা রোগ বৈকি! হজম হয়না বলে ঠিকমত খেতে না পেরে রোগা হয়ে যাচ্ছিস, সেটা ব্যারাম নয়? ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র খা না?

: বকিস নে। ডাক্তারের কাছে গেলেই এককাঁড়ি টাকা খরচ করিয়ে ছাড়বে—ফল হবে কচুপোড়া। যেভাবে চলতে হচ্ছে সেটা না পার্শ্বাতে পারলে ওষুধ খেয়ে কিছু হবে না। আমি বাড়তি কোন অনিয়ম করি না, যতদূর সম্ভব মেনে আর মানিয়ে চলি কিন্তু অবস্থাটায় দাঁড়িয়েছে অনিয়মের—উপায় কি!

: অবস্থাটা পান্টাবার চেষ্টা কর।

: চেষ্টা চলেছে। আমার একার তো নয়, সবার জীবনেই কম বেশী  
অনিয়ম।

সমরেশ কিছু বলে না কিন্তু সে টের পায় যে কথার মারপ্যাচে নিজের  
অসুখের কথাটা কুমার চাপা দিয়ে গেল। একটা কিছু কঠিন রোগ যে তার  
হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

কে জানে অসুখটা শারীরিক অথবা মানসিক !

কুমারের মা শুনে বলেছে, তোমার কাছেও গোপন করে গেল ? চিরকাল  
এমনি ওর একগুঁয়ে স্বভাব !

নন্দিতার সম্পর্কে তার মাথা ব্যথার কারণটাও কুমার কাউকে জানতে  
বুঝতে দেয় না।

সমরেশের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় সব কথা, কয়েকবার তার  
প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে হেসে জবাব দেয়, সাইকলজি পড়ছি, সাইকলজি নিয়ে  
গবেষণা করছি, জানিস না ? তোর ছোটমামা আর নন্দিতার সাইকলজিটা  
বুঝবার চেষ্টা করছি।

: কি লাভ হবে ?

: জানব বুঝব কেন ওরা এরকম পাগলামি করে—এটাই মস্ত লাভ হবে।  
তুই শুধু টাকার অঙ্কের লাভ শিখছিল তবু তো কারবারটা চালাতে পারলি না।  
ওদিকে তোর মন নেই, তুই করবি কি ? তোর সাইকলজি অস্ত্র রকম।  
তোর বাপ কাকা মামা দাদা ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছে—তুই কস্মিনকালে  
হতে পারবি না। এ শুধু তোর একটা ঝোঁক !

: আমার কিসে টাকা হবে ?

: তোর কিছুতেই টাকা হবে না !

: কেন হবে না ?



: বললাম তো, টাকা করার খাত তোর নয়। আবার লাখ টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে নামলেও তুই ডুবে যাবি। তবে তোর ছোটমামা যদি দায় নেয় আর তুই চোককান বুজে মামা যা বলে তাই শুনে যাস, তাহলে হয় তো হতে পারে।

সমরেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, লাখ টাকা নিয়ে আমিও কারবার ফাঁদছি, মামাও আমার কারবারের দায় নিচ্ছে!

কুমার বলে, তাই তো বলছিলাম, তোর কোনদিন টাকা হবে না—কোনরকমে চালিয়ে যাবি, এইমাত্র।

সমরেশ আরও বেশী ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, কোনরকমে চালিয়ে যেতে পারলেও তো বাঁচতাম।

কুমার ভরসা দিয়ে বলে, তা তুই পারবি। কোনরকমে চালিয়ে যাবার মানে বুঝি তো? বড়লোকামি থেকে এই অবস্থায় নেমেছিল—বড়লোকামি-গুলো ছাঁটাই করতেই যেন প্রাণ বেড়িয়ে যাচ্ছে! এ না হলে চলে না, ও না হলে চলে না,—শুধু এই দুশ্চিন্তা।

কথাটা প্রাণে লাগে সমরেশের।

সত্যই তো, কারবার চুলোয় গেছে, নন্দিতার কল্যাণে মামার চেষ্টায় কোনরকমে বাড়ীটা বেঁচে গেছে, তবু এখনো তাদের ঠাট বজায় রাখার কী অসম্ভব হাশ্বকর করুণ চেষ্টা!

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে কুমার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, তোর মামা কখন বাড়ী ফেরে জানিস?

সমরেশ বলে, ফিরলে সন্ধ্যা বেলায় ফেরে। বাড়ীতেই একটু ড্রিক্স করে। বৌ পালিয়ে গেছে, এখন কি করে বলতে পারব না।

: কাল একটা কাজ করবি? বিকালে ফোন করে জেনে নিবি ভবানী-বাবু কখন বাড়ী ফিরবেন? আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিবি।

: সকালে ষাওয়াই সুবিধে—আটটার আগে আমার ঘুম ভাঙে না। সকাল সকাল গিয়ে খানিকক্ষণ ধরা দিয়ে বসে থাকতে হবে।

কুমার মাথা নাড়ে।—সকালে নয়। সারাদিন কাজকর্ম করে আসার পর মাহুঘটা কি অবস্থায় থাকে দেখতে চাই। সকালবেলার শান্তশিষ্ট লেজ বিশিষ্ট মাহুঘটা তো অতিষ্ঠ কবে তোলেনি নন্দিতাকে।

পরদিন সন্ধ্যাব সময় কুমার ভবানীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যায়—সঙ্গে নিষে ঘাঘ সমরেশকে।

বলে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে তুই কিন্তু চলে আসবি। তুই থাকলে গ্রাণ খুলে কথা বলতে পারবে না।

: তোকে তো চেনে।

: হু'একদিন দেখেছে, ও কি আর মনে থাকে। চিনলেও হয়তো না চেনার ভান কববে।

ভবানী বাড়ীতেই ছিল। বসার ঘরে একলা বসে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিল রঙীন রসায়নের কাঁচের পাত্রে।

অহুমতি পেয়ে তাবা গিয়ে বসতে না বসতে ঘরে নতুন একটি জীবের আবির্ভাব ঘটে—সতের আঠার বয়সের প্রায় নিরাভরণা অল্পদামী রঙীন ডুরে শাড়ী পরা একটি মেয়ের!

ধীরপদে ঘরে আসে। এক প্লেট আলু সেদ্ধ পাঁপের ভাজা আর নানা রঙের ফলের কুচি ভবানীর সামনে ধরে দিয়ে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞাসা করে, ডিম সেদ্ধ দেব, না মামলেট করে দেব?

ভবানী বলে, আমায় ডিম সেদ্ধই দাও—এদের হু'জনকে চা আর মামলেট দাও।

তাদের দিকে পলকের জন্ম চোখ তুলে তাকিয়ে মেয়েটি ধীরপদে চলে যায়।

ওকে দেখেই সমরেশ নন্দিতার চিঠির মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে ।

নন্দিতা ঠিকই বুঝেছে ।

গরীব মুখ্য মেয়েকে যখন এভাবে শুধু আশ্রয় দিয়ে রাখা সম্ভব, ভবানী কখনো বোকার মত তাদের কোন একজনকে আইন সঙ্গত ভাবে বিয়ে করে ঘাড়ে নিতে চাইবে না ।

কুমারের সঙ্গে সে গিয়েছে, পিছনে পিছনে গিয়েছে, বসতে বলার পর তবু তাকেই ভবানী তখন প্রশ্ন করে : সংসার চালাচ্ছিস সমু ? কিভাবে চালাচ্ছিস ?

: সংসার চালাচ্ছি না । সংসার এবার অচল হয়েছে ।

: সংসার কখনো অচল হয় রে বোকা ? তুই চালাতে পারিস কিংবা না পারিস সে হল আলাদা কথা, সংসার চলবেই ।

কুমার ধীরকণ্ঠে বলে, আমায় চিনতে পারছেন ?

ভবানী সোজাসুজি পরিচয় অস্বীকার করে বলে, নাঃ । তবে অল্পমান করছি তুমি সমরেশের বন্ধু ।

তখন বিব্রত অন্তমনস্ক সমরেশের খেয়াল হয় যে চা মামলেট খেতে সে আজ মামাবাড়ী আসে নি, কুমারের সঙ্গে ভবানীর পরিচয় করিয়ে দিয়েই তার বিদায় হওয়ার কথা ।

সে তাড়াতাড়ি বলে, এ আমার ছেলেবেলার বন্ধু । নতুন মামীর সঙ্গেও ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা । বিয়ের সময় একলাটি খেতেখুটে সব সামলে দিয়েছিল—মনে নেই ? বাসর ঘরে বাজী হেরে তুমি যে হঠাৎ সোনার একটা হার আনতে ফরমাস করলে, অত রাতে সোনার গয়না আনতে যেতে অস্ত্র কেউ রাজী হল না, নতুন মামী ওকে ডেকে বলতেই তোমার চিঠি নিয়ে গিয়ে হার এনে দিল ?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে । ওর নাম কুমার । বিয়ের পরে নন্দিতা চার-পাঁচবার ওদের বাড়ী ছুঁতিন দিন থেকে এসেছে ।

কুমার বলে, গয়নার দোকানের লোকটা আপনাকে খুব খাতির করে টের পেয়েছিলাম। অতরাং ওপর থেকে নেমে এসে চিঠি পড়ে দোকান খুলে হারটা দিল—একটি কথা কইল না।

ভবানী হেসে বলে, কথা কইবে কেন? এমনি গিয়ে হারটা কিনলে উচিত যে দাম লাগত—তার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা বেশী চার্জ করেছে।

কুমারও হেসে বলে, তার মানেই হল আগেও আপনি ওভাবে অর্ডার দিয়ে গয়না আনিয়েছেন। লোকটা একেবারে নিশ্চিত ছিল যে দাম তো পাওয়া যাবেই, বাড়তি লাভটাও পাওয়া যাবে।

ভবানী এবার চুপ করে থাকে।

সমরেশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

: ও হো, ভুলেই গিয়েছি। আমার ওদিকে কত কাজ—আমি গেলাম মামা।

সমরেশ চলে যাবার পর, কুমার তার কাঁচের ঘাসের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, অতিথির জন্ত এ জিনিষটার ব্যবস্থা বুঝি নেই? একলাই চালান?

: তোমার চলে নাকি?

: নিজের পয়সায় চলে না—বাজে জিনিষও চলে না। এরকম ভাল দামী জিনিষ কেউ অফার করলে রিকিউজ্ করব কেন?

খাণ্ড সরবরাহ করেছিল পোষা মেয়েটি, কি ভেবে তাকে ভবানী পানীয় সরবরাহ করা থেকে রেহাই দেয়।

নিজেই আলমারি থেকে বোতল বার করে ঘাসে ঢেলে অপর দিকে এগিয়ে দেয়। ঘাসে ঢেলে নিজের জন্ত আরও পানীয় তৈরী করে খাওয়ার টেবিলের চেয়ারেই আবার বসে।

কুমার তার ঘাসে একটু চুমুক দিয়ে বলে, রোজ খান? বেশী হয়, না এক পেগ আধ পেগ খান?

: এক আধ পেগ খাই। মাঝে মাঝে বাদও যায়! এসব নিজের বশে রেখে না খেলে কি চলে?

নিজের গেলাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে কুমার বলে, আপনি তো প্রায় লাখপতি হয়ে গিয়েছেন। আপনাকে লাখপতি বলে মানতে চায়নি কিংবা পারে নি বলে কি নন্দিতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বনল না? আপনাকে ছেড়ে পাটনা চলে গেল?

: বনিবনার অভাব তো কিছু টের পায় নি। দিব্যি হাসিমুখেই ছিল। তোমাদের কিছু বলেছে?

: আমার সঙ্গে দেখাই হয় নি তিন চার মাস।

: ওর মাথায় ছিট আছে। কোন নালিশ থাকলে মাল্লব সেটা জানাবে তো? প্রতিকার চাইবে তো? বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ পালিয়ে যায়— তোমাদের বাড়ীতেও তো তিন চার বার গিয়ে রাত কাটিয়ে এসেছে। এবার বোধ হয় একটু বেশী রকম চড়েছে ছিটটা। একেবারে পাটনায় পাড়ি দিয়েছে।

: ঝগড়াঝাটি হয় নি? কথা কাটাকাটি?

: কিছু না। দু'জনে সিনেমায় গেলাম, থেয়ে দেয়ে ঘুমোলাম, নিজে সামনে বসে থেকে সকালে আমায় খাওয়াল, পাঁচ শো টাকার একটা বিয়ারার চেক চেয়ে নিল—

ভবানী এক চুমুকে তার গেলাসটা খালি করে দেয়। কুমারের জানা ছিল যে নেশা সে সত্যই করে না! আজ এত অল্প সময়ের মধ্যে দু'বার গেলাস খালি করে তৃতীয় বার তাকে মদ ঢেলে নিতে দেখে সে কিন্তু আশ্চর্য হয় না।

এর নাম বিকার।

এ একটা রোগ।

কুমার হাসিমুখে বলে, এবার তবে আমি বিদায় হই?

ভবানী ধেন ক্ষেপে যায়। বলে, যা জানতে এসেছিলেন না জেনেই বিদায় হয়ে যাবে মানে?

: যা জানতে চেয়েছিলাম জেনে গিয়েছি।

: কী জেনে গিয়েছ ? শুধু জেনে গেলেই তো হয় না, কি জানলে আমাকে একটু জানাতে হবে তো ! আমি যদি ভুল করে থাকি, আমার যদি দোষ হয়ে থাকে, জেনে বুঝে শুধরে নিতে রাজী আছি। খামখেয়ালী আলগা ভাবের কথা আমি কিছু বুঝি না—সোজা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে অপরাধটা কি করেছি। নইলে—

: নইলে ?

: আমি কিছুতেই ওর এ ইয়াকি বরদাস্ত করব না—কঠিন রকম শাস্তি দেব !

: নাগালেই যদি আর না আসে, শাস্তি দেবেন কি করে ? একেবারেই যদি ত্যাগ করে গিয়ে থাকে, কোন সম্পর্কই যদি আর না রাখে ?

ভবানী নীরবে উঠে গিয়ে একখানা খামের চিঠি এনে অবহেলার সঙ্গে তার সামনে ফেলে দেয়।

পাটনা থেকে নন্দিতা চিঠি লিখেছে।

তার শ' পাঁচেক টাকা দরকার। ভবানী যেন পত্রপাঠ টাকাটা তার করে পাঠিয়ে দেয়।

: আপনি তাহলে জানতেন যে পাটনা গেছে ?

: জানতাম বৈকি। তৌমরা জান কিনা জানবার জন্ত না-জানার ভান করেছিলাম।

কুমার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

: সত্যি মানতে পারেন নিজের দোষ ? নিজের দোষ শুণের বিচার করতে পারেন ?

: পারি। না পারলে অনেক আগে ডুবে যেতাম। এতগুলো কারবার চালাচ্ছি, এতলোকের সঙ্গে সামলে চলছি—নিজের দোষশুণ না জেনে বুঝে এটা পারা যায় ?

কুমার একটু হেসে বলে, এটাই আপনার আসল দোষ। আপনি বড় বেশী হৃদয়হীন—বড় বেশী অহঙ্কারী। নন্দিতার হিসাব নিকাশ পর্যন্ত ভাবের বশে হয়—ও ভাবে খুব বুঝি বাস্তববুদ্ধি খাটালাম। আসলে ওর সব হিসাব ভাবের হিসাব। আপনার সোজা স্পষ্ট অঙ্কের হিসাবটা ওর বরদাস্ত হচ্ছিল না।

তিনবারের ঢালা পানীয়টাও ভবানী এক চুমুকে গিলে ফেলে।

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা অ্যালকোহল তার পেটে যায়।

: তুমি আমার বড়ই উপকার করলে কুমার।

: কি ভাবে ?

: ওকে কিভাবে শাস্তি দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না—তুমি আমার বুঝিয়ে দিলে। পাঁচশো টাকা চেয়েছে, কাল আমি ওকে টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে হাজার টাকা পাঠিয়ে দেব।

: ঘুষে কি কাজ হয় ?

: ঘুষ নয়। ওকে টাকা খরচ করতে শেখাব—তারপর টের পাইয়ে দেব, টাকা অত সস্তায় জোটে না।

ভবানী চতুর্থ গ্লাসে চুমুক দিয়ে হেসে বলে, আজ রাত্রেই চিঠি লিখে তুমি ওকে সতর্ক করে দেবে তো ?

: আমার এরকম ছোটলোক ভাবলেন কেন ? আমি কেন যেচে চিঠি লিখতে যাব, আপনাদের ব্যাপারে মাথা গলাব ?

ভবানী মোটেই যেন খুসী হয় না, একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলে, কেন, জানিয়ে দিলে দোষ কি ? অনেকদিনের বন্ধু, আমি ওকে শাস্তি দেবার প্ল্যান করছি, এটা ওকে জানিয়ে দেওয়াই তো তোমার কর্তব্য ! তুমি ওকে সতর্ক করে দিলে ওকে শাস্তি দিতে আমার অসুবিধা হবে ভাবছ ? তোমার ওপর চটে যাব ভাবছ ? উচিত কাজটা না করলেই বরং তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা খারাপ হয়ে যাবে।

কুমার শান্ত ভাবেই বলে, আমায় অত বোকা ভাববেন না, আপনার মতলব আমি বুঝেছি।

: কি বুঝেছ?

: আপনি আমাকে দিয়ে নন্দিতাকে ভয় পাইয়ে ভড়কে গিয়ে কাজ হাসিল করতে চান। আমি সতর্ক করে দেব, নন্দিতা ভয় পেয়ে ছুটে এসে মিটমাট করে ফেলবে—এই হল আপনার আশা। বন্ধুর কর্তব্য পালন করতে ওকে আপনার সম্পর্কে ভড়কে দিতে পারব না বলায় আপনার তাই রাগ হচ্ছে।



## নয়

আনন্দ বেদনার একটা সীমা থাকে। আনন্দ বা বেদনা একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষের তা নয় না।

মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় আনন্দে। মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় বেদনায়। সরমার শোক আর নন্দিতার বিরহ স্বেচ্ছা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার অগত্যা উপায় নেই বলেই কি ভবানী বিয়ে করল সরমার বোন অণিমাকে ?

সরমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল নগদ বিশ হাজার, গয়না পনের হাজার। নগদ গয়না আদায়ের ব্যাপারে সে ছিল না—সব কিছু করেছিল তার বাপ।

তার পরেই হঠাৎ অবস্থা পড়ে গিয়েছিল সরমার জমিদার বাবা দেবদাসের। এখন তারা শুধু গরীব হয়েই যায় নি—দেনায় দেনায় একেবারে তলিয়ে গেছে বলা যায়।

এবার তাকেই হিসাব নিকাশ চালাতে হয়।

নগদ হয়ে যায় শূন্য।

গয়না হয়ে যায় নামমাত্র !

সরমার গয়নাগুলি তো আছে—আশানে গয়না তো পুড়িয়ে ফেলা হয়নি সরমার রক্তমাংসের দেহটার সঙ্গে।

নন্দিতাও ভাগ বসায় নি সে গয়নায়।

বিয়ে হয় বিনা সমারোহে।

ভবানী বৌ-ভাতের একটা ভোজ দেয়। আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেও বাছা-বাছা কয়েকজনকে শুধু বলে।

সমরেশ আর কুমারকে বোধ হয় বলে নিছক বোঁকের বশে। অথবা ওরা নন্দিতার প্রিয়পাত্র বলে গায়ের জ্বালার জলও হতে পারে। অথবা এ আশাতেও হতে পারে যে ওদের কাছ থেকে নন্দিতা বৌভাতে সমারোহের অভাব, তার গম্ভীর উদাসীন ভাব এসব বিবরণ শুনবে।

পরিবেশন বা অল্প কিছু নিয়ে মেতে থাকার উপায় মেই, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বসতে ছুজেনই অস্বস্তি বোধ করে, সমরেশ ও কুমার বাড়ীর সামনের বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে।

সেদিন আলাপ করে ভবানীর সাইকোলজি কুমার কি বুঝেছিল সমরেশ কখনো জানতে চায় নি। আজ সে হঠাৎ প্রশ্ন করে, সেদিন আমার ব্যাপারটা কি বুঝলি? ছ'নম্বর মামী পাটনা পালিয়ে গেল কেন?

কুমার বলে, দেখলাম যে তোর মামা বিশেষ ধাতের মানুষ—সেকেলে সংস্কারও আছে, আবার অনেক কিছু ড্যাম কেয়ার করার একেলে গোয়াতু-মিও আছে। নন্দিতা বোধ হয় ছেলেমেয়ের মা হওয়া এড়াতে সরে গেছে, ওই রকম ব্যাপার নিয়েই সম্ভবত বড় রকম গোলমাল হয়েছে। পৌরুষ আছে পুরোমাত্রায়, পুরোমাত্রায় কেন, তার চেয়ে বেশী। কিন্তু কি যেন ব্যাপার আছে তোর মামার মধ্যে, তোর মামার জিদের সঙ্গে তোর মামাকে তাই বাতিল করে দিয়েছে।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, অসুখ বিসুখ কিছু ছিল নাকি?

কুমার বলে, আমি তো কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নি! একদিন কথায় কথায় বলেছিল, ওর নাকি মা হবার কথা ভাবলেই আতঙ্ক জাগে। ব্যাপারটা শুধু মানসিক অথবা শারীরিক কোন কারণ আছে জানি না। পাটনায় একটা চিঠি লিখে তামাসা করে প্রশ্ন করেছিলাম—ভবানীবাবু কটি ছেলেমেয়ে দাবী করেছিলেন। জবাবে লিখেছিল যে শুধু একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—বিয়ের আগে চুক্তি হয়েছিল ছেলেমেয়ে চাইবে না। তাই তোর মামার কাছে ছুটি নিয়েছে কিছুকাল বাইরে ঘুরে মা হবার সাহস সংগ্রহ করার চেষ্টা করে আসবে।

: আমায় বলেছিল, হার মেনে পালাচ্ছে, সহ্য না। কোন কারণ না থাকলে মা হতে ভয় পাওয়ার কোন মানে হয়?

: মানে? এটম বোমা হাইড্রোজেন বোমার যুগেও অনেক মানসিক

বিকশয়ের কোন মানেই আমরা বুঝি না। বুঝি না বলে বড় বড় বুঝি  
আওড়াই। ক্রয়ডের উদ্ভূত খিমোরী নিয়ে কত বছর আমরা নিষ্ফল  
মারামারি করেছি মনে আছে তো ?

বেলার ভাই স্মৃধীর এসেছে কদিন আগে। বাজারে তার সঙ্গে দেখা  
হয় সমরেশের।

বাজার করা ঝকমারি উপায় দাঁড়িয়েছে—এতগুলি পোষা নিয়ে  
এক বাড়ীতে সবার রুচি আগে মোটামুটি এক রকম—কোন রান্না খুব পছন্দ  
কোন রান্না এক রকম চলে যায়।

আজকাল রান্না খাওয়া নিয়ে বাড়ীতে ছোট বড়র মধ্যে নিত্য মন  
কষাকষি।

সেটা অবশ্য লোহা পেলে লোহা ধেষে হজম করা যৌবনের একটা  
পরীক্ষা ও প্রমাণ। খাত্তের নানা বৈচিত্র্য তারা দাবী করবে—গুধু পুষ্টিকর  
নয়—মুখবোচক খাদ্য।

স্মৃধীবাবু বয়স যৌবনের কোঠা পেরোয় নি—কিন্তু মুখখানা জীর্ণ শীর্ণ,  
অর্ধেক চুল পেকে গেছে।

: কদিন আছেন ?

স্মৃধীর বলে, আর বলেন কেন ? একমাস ধরে বোন যাবেন হত্যা দিতে,  
ওকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার দায় চেপেছে আমার ঘাড়ে।

: হত্যা দিতে যান নাকি ?

: হ্যাঁ, ছেলেপুলে চাই। কেনরে বাবা, বেশ তো আছিল ছুজনে। সামান্ত  
মাইনে, জিনিষ পত্র এমন মাগ্‌গি—তোর কি সাধ্য আছে ছেলেপুলে  
ভালভাবে মালুষ করার ? ছেলেপিলে দিয়ে তুই করবি কি ?

সমরেশ হেসে বলে, ছেলেপুলে চাওয়াটা স্বাভাবিক। আথ উপোষী

চাষী লাঙল চষছে, কেন খেয়েও তারা ছেলেপুলে চায়। শ্রমিকেরা কীইবা  
পায় আমাদের তুলনায়? তারাও ছেলেপিলে চায়।

কারবারের দায় থেকে রেহাই পেয়েছে নন্দিতার অমুগ্রহে।

এ বড় সহজ রেহাই পাওয়া নয়।

কাজটা করেছে ভবানী।

কিন্তু করিয়েছে নন্দিতা। তার খাতিরে প্রায় চার মাস পিছিয়ে দিয়েছে  
ভবানীকে ছেড়ে যাওয়ার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা।

তবু সমরেশ যেন কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ করে না।

মনে হয়, নন্দিতা এ ভাবে কারবারটার দায় থেকে তাকে রেহাই দেবার  
দায়িত্ব না নিলেই বোধ হয় ভাল করত।

মামাকে দিয়ে হয় তো কারবারটাও বাঁচাতে পারত—অথবা নতুন কোন  
কারবারে নামতে পারত।

শুধু বাড়ীটা এখন তার সম্বল।

সম্বল না বিপদ কে জানে!

এত বড় বাড়ী বলেই তো এতগুলি মানুষ ভিড় করে এসে জমে আছে।

ওদের খাওয়া পরা চালাবার কোন উপায় তার হাতেও নেই, জানাও নেই।

উপায় করে দেবার জ্ঞান মামাকে যে চেপে ধরবে নন্দিতার জ্ঞান সে  
উপায়ও বজায় নেই।

নন্দিতার খাতিরেই ভবানী তাকে কারবারের সঙ্গে একেবারে তলিয়ে  
যাবার বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

তাকে ত্যাগ করে নন্দিতা দূর দেশে গিয়ে থাকলে সে এখন কোন মুখে  
ভবানীকে গিয়ে বলবে যে আমার বিরাট সংসার চালাবার উপায় করে দাও?

আল্গা আল্লা ভাবে বাড়ীর লোকের আদর অভ্যর্থনা শুধু স্বীকার  
করে নিয়ে সমরেশকে ডেকে তাদের কথা বলার জ্ঞান তৈরী করা আড়ালে বলে  
ভবানী বলে, বাড়ীটা নাকি বিক্রি করতে চাইছিল?

: ভাবছি তো। এতগুলো পেটে রোজ চাল ডাল শাক পাতা কত লাগে জান মামা ?

: জানি। কিন্তু বাড়ী বিক্রি করে কদিন চালাবি ? আয় না থাকলে জমা টাকা খরচ হতে কদিন লাগে ? মাথা গুঁজবার জায়গার জন্ত ভাড়াও তো গুণতে হবে।

: তাও তো আমি ভাবছি।

: তোর নিজের বাবুগিরি বাদ দিয়ে সংসারে মাসে কত লাগে ? একটু কষ্ট করে টেনেটুনে যদি চালাস ?

: সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো। আমার মধ্যে তুমি বাবুগিরি করা দেখলে ?

: একটুও করিস না বলেই তো। তোর বেশ দেখেই লোকে ভড়কে যাবে, তাকে কোন কনট্রাষ্ট দিতে লোকে ভরসা পারে না। কনট্রাষ্ট দিতে যারা রেকমেণ্ড করে তারাও তোর বেশ দেখে রেকমেণ্ড করতে সাহস পাবে না।

: কী করব তা'হলে ?

: আমার সঙ্গে আয়।

তাকে সঙ্গে নিয়ে ভবানী বড়বাজার এলাকায় সাহেবী পোষাকের বড় দোকানে যায়—সাহেবী এলাকার দোকানে যায় না।

সমরেশের জন্ত দু'সেট ভাল সাহেবী পোষাক অর্ডার দেয়।

তাতাতাড়ি দিতে হবে বলে বেশী মজুরি কবুল করে।

গাড়ীতে উঠে বলে, দু'টোতেই বছর কেটে যাবে। একটা ধোয়াবি, একটা পরবি। সবাই জানবে তুই খাঁটি পোষাক পরে কাজে বার হোস, তুই কাজের মানুষ—টাকা দিয়ে তুই টাকা বানাতে পারিস।

: পারবো তো ?

: নন্দিতা বুঝি বলেছে পারবি না ? নন্দিতার এই একটা ভারি বিল্লী

স্বভাব—যোয়ানদের দমিয়ে দেয়। তোর। যোয়ানরা যদি না পারিল, তবে কারা পারবে বল দিকি ?

সমরেশ হঠাৎ ছেলেরা হুঁচকিত বনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, নতুন মামীর চিঠি পেয়েছো মামা ?

: পেয়েছি বৈকি। আবার টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছে। এত টাকা দিয়ে কি করে রে তোর নতুন মামী ?

: কে জানে কি করে !

যেচে এসে কেন এমন উদারভাবে আত্মীয়তা দেখানো ভবানীর ? এতো খাপ খায় না তার প্রকৃতির সঙ্গে ! সে গিয়ে কাঁদাকাটা করলেও বরং কথা ছিল, একটা মানে বোঝা যেত।

নিজে থেকে এসে ভবানী তার সংসার চালাবার উপায় করে দেবে, সে যাতে দাঁড়াতে পারে সেজন্তু নিজে হাল ধরবে—এ ব্যাপার বড়ই রহস্যময় মনে হয় সমরেশের।

নন্দিতাকে খুসী করার আশায় ?

তার জন্তু নন্দিতার টান আছে, সে তার ভাল চায়। কারবারের বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবার জন্তু ভবানীর কাছে আশ্রয় করার মধ্যেই তার প্রমাণ ছিল।

তার জন্তু কিছু করলে নন্দিতার মন নরম হবে, এই কথা কি ভেবেছে ভবানী ?

কথাটা মনে লাগে না সমরেশের। অল্প অবস্থায় যদিও এটা কল্পনা করা যেত, এখনকার পরিস্থিতিতে ভবানীর এভাবে তার ভাল করে নন্দিতাকে খুসী করতে চাওয়া উদ্ভট মনে হয়।

শ্রীতি বলে, এমনিতেই মনটা নরম হয়েছে, নিজের বোনের সংসারটা ভেসে যাবে ?

সমরেশ মাথা নেড়ে বললে, তেমন মন আমার নয়, এমনিতে নয়ম হবে।

তার সম্পর্কে ভবানীর এই নূতন রকম উদার মনোভাবের কারণটা হঠাৎ একদিন স্পষ্ট হয়ে যায়।

ভবানী তাকে অল্পযোগ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুই আর আমার বাড়ী যাস না কেন রে সমু?

: কি অবস্থায় আছি জান তো—

: অত ভাবছিস কেন? বললাম না আমি একটা হিল্লো করে দেব? আমার সঙ্গেই বরং চ’—তোরা কেউ যাস না বলে কাল তোর নতুন মামী কাঁদছিল।

নতুন মামী!

নন্দিতা নয়—আরেক নতুন মামী!

সমরেশ বলে, কাঁদছিল? আচ্ছা বেশ, আমি আজকেই যাব কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব না মামা।

: কেন রে?

: নতুন মামী ভাববে তুমিই ডেকেডুকে নিয়ে গেছ। আমি নিজে থেকে যেচে গেলে খুসী হবে।

: তুই তো ভারী ঢালাক হয়ে উঠেছিস সমু!

: এ জগতে বোকা হয়ে থেকে কোন লাভ আছে? বাবা যদি একটু কম বোকা হত তাহলে কি আর আমার এ দশা হয়!

ভবানী স্নেহে হেসে বলে, এত আপশোষ করিস না। বললাম না আমি সব ঠিক করে দেব?

সেদিন দুপুর বেলা সমারেশ মরা মামী সরমার বোন নতুন মামী অগ্নিমার সঙ্গে দেখা করতে যায়।

ভুবনের মা বলে, দুপুরবেলা ছাড়া বুঝি তোমার বাছা মামাবাড়ী আসার সময় হয় না!

হঠাৎ রেগে গিয়ে সমরেশ টেঁচিয়ে বলে, আমি কখন মামাবাড়ী আসব সেটা কি তোমার খুসী মত ঠিক হবে ?

তাকে আসতে দেখে অণিমা কি ওৎ পেতে ছিল ?

আচমকা ঘরে ঢুকে সে বলে, ভুবনের মা, তুমি আজকেই এ বাড়ী ছেড়ে বিদেয় হবে। তোমায় আমি রাখব না ! এত বড় আশ্পর্ধা হয়েছে তোমার, ওনার ভাঙের ওপর তুমি চোপা কর !

: চোপা তো করি নি মা ।

: করেছ—আমি সব শুনেছি ।

ভুবনের মা কাতরভাবে বলে, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে বলছিলাম !

অণিমা ধমকের স্বরে বলে, কে তোমায় ওসব ভাবনা ভাবতে বলেছে ? মাইনে পাবে, রান্না করবে—আমার ঘরোয়া ব্যাপারে তোমার মাতব্বরির করার দরকার ?

ভুবনের মা আর দেৱী করে না, সমরেশের পা চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে, আমায় ক্ষমা করেন। আমি না বুঝে কথা বলেছি ।

তখন নরম হয়ে অণিমা বলে, যাক গে, এবারের মত ধরলাম না, আর যেন কোনদিন এরকম না হয় ।

সরমার বিয়ে হয়েছিল তের বছর বয়সে—অণিমার বয়স উনিশ কুড়ির কম হবে না ।

ভুবনের মা'র গিন্নি-পল্লু-মার্কী ফপরদালালিকে শাসন করে যে অপরূপ অভ্যর্থনা সে তাকে জানায় তার মধ্যেই সমরেশ প্রমাণ পায় সরমার মতই সে কিভাবে কয়েক মাসে ভবানী আর তার ঘরবাড়ী দখল করে ফেলেছে ।

মোটামোট গড়ন । সরমার চেয়েও গোলগাল মুখ । ছোট ছোট চোখে শাণিত দৃষ্টি ।

গায়ে গয়নার বড় অভাব ।

তার বেশী গয়না নেই এ মিথ্যাটা বাতিল করার জন্তই যেন শুধু গলায়



পরেছে খুব দামী একটা হার আর হাতে পরেছে কয়েক গাছা চুড়ি আর হীরে।  
বসানো এমন একটা গয়না সমরেশ বার নাম জানে না।

শেষের দিকে সরমা দোতলায় যে ঘরে দিনরাত্রির বেশীর ভাগ সময়  
বিছানায় শুয়ে কাটাত তার উপরে তিন-তলায় ছোট একটা ঘরে অগিমা তাকে  
নিষে যায়।

বলে, আমি উচুতে থাকতে ভালবাসি, তাই এই ঘরটা বেছে নিয়েছি।  
তুমি এসেছ বলে কী খুশীই যে হয়েছি ভাঙ্গে। দিদি খালি তোমার কথা  
বলত। দিদির বাঁচাবার জন্য তুমি কি রকম পাগলের মত ডাক্তার ডেকে  
এনেছিলে, তোমার মামাকে ফোন করে ডেকে এনেছিলে, সব আমি জানি।

বলতে বলতে তার গলা ধরে আসে, চোখ ছল ছল করে।

অগিমা হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, সমরেশ বুঝতে পারে, নিজেকে একটু  
সামলাতে গিয়েছে।

বুঝতে পেরে তার প্রজ্বাই জাগে! আট দশ বছরের বড় দিদি ছিল যে  
সংসারের রাণী, তার মরার ছ'মাসের মধ্যে পছন্দসই একটা মেয়েকে বিয়ে  
করে, মেয়েটা পাগলামি করে তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর আবার তাকে  
বিয়ে করে এনে সেই সংসারে রাণী করে দিয়েছে একটা মানুষ—এর মানে  
সে যেন অ আ ক খ'র মত বোঝে।

ফিরে এসে আবার বলে, দিদির কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি!

বলে, আজ কালো চেপে গেলাম, দিদির শরণের খবর শুনে কম কাঁদি নি  
কিন্তু আমি।

: কেঁদে কোন লাভ হয় না বুঝলে বুঝি তার পরে?

: বাপ দাদা অনেক করে বুঝিয়ে দিল। তোমায় কিন্তু সর্বনা আসতে  
হবে। দিদির কথা ভেবেই আসতে হবে। দিদি পারে নি, জানই তো  
অনুখে কি রকম কাবু হয়ে পড়েছিল—আমি তোমার আগের অবস্থা  
ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করব।

: তবেই তুমি আমার দফা সেরেছে।

অগিমা হাসে।

হাসলে ঠিক সরমার মতই তার সমস্ত মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ে হাসিটা।

: খারাপ কিছু করব ভাবলে নাকি ভায়ে? তুলে যেওনা, আমি দ্বিধার  
বোন। আত্মীয়স্বজনের দিকে একদম তাকায় না মাহুশটা—আমি ওকে  
টের পাইয়ে দেব, আত্মীয়স্বজন অত তুচ্ছ নয়। আপনজনকে বাদ দিয়ে  
বড়লোকামি চলে না। তোমায় যদি ও নতুন এক কারবারে কামেমি না করে—

: নতুন একটা কারবার কামেম করতে কত হাজার টাকা লাগে হিসাব  
রাখো?

: সে তোমার মামা বুঝবে।

একটা কথা খেয়াল করে এমনই আশ্চর্য হয়ে যায় সমরেশ যে বেশ  
খানিকক্ষণ সে আনমনা হয়ে থাকে।

তার ভাব দেখে অগিমাও কথা কয় না।

সরমা অনেক চেষ্টা করেও ভবানীকে টলাতে পারে নি, মৃত মহিমের  
ছেলে বা তার কারবারের জন্ত বিশেষ কিছু করিতে সে রাজী হয় নি।  
বিপাকে পড়ে বোনেরা এসে ঘাড়ে চাপতে পারে অনেকটা এই আশঙ্কায় তার  
ব্যবসার মাদ্রাজের ব্রাঞ্চে সমরেশের একটা ব্যবস্থা করে দিতে রাজী হয়েছিল।

নন্দিতা মামী হয়ে চেষ্টা করে তাকে দিয়ে কারবারের সর্বনাশ গ্রাস  
থেকে অন্তত বাড়ীটা রক্ষা করে কারবার গুটিয়ে রেহাই পাবার ব্যবস্থা  
করিয়ে দিয়েছিল।

তারপর অগিমা মামী হয়ে এসে একেবারে পাটে দিয়েছে ভবানীর  
মনোভাব—তার অচল অবস্থা সচল করে দেবার দায় নিতে ভবানী রাজী  
হয়েছে। স্বামীকে এমনভাবেই বশ করে ফেলেছে অগিমা!

তার কোন একেবারে বেতন আর কমিশনের লোভান্ধাঙ্গি ব্যবস্থা নয়,  
স্বাধীনভাবে তার নিজের কারবার গড়ে তোলার ব্যবস্থা।

অগিমার খৈর্য ভল হয়।

: এক মনে কি ভাবছ ?

: কি ভাবছি ? ভাবছি আমার জন্ত তোমার এত দরদ জাগল কেন।  
কেউ পারে নি—তুমি কেন মামাকে আমার দায় ঝাড়ে নিতে রাজী করালে।

অগিমার মুখ খুশীতে উজ্জল হয়ে ওঠে, তারপরেই যেন মেঘে ঢেকে গিয়ে  
দু'চোখে ধারাবর্ষণ শুরু হয়।

সমরেশ বিব্রত ও আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে।

নিজের মনে খানিক কেঁদে চোখ মুছে অগিমা বলে, দিদি তোমার  
কত ভালবাসত, তুমি দিদির কত ভালবাসতে—জানি না ভেবেছ ? বললাম  
তো, দিদির মুখে কত গল্পই যে শুনেছি তোমার। অস্থে কি রকম মনমরা  
হয়ে গেল, শুধু তোমার কথা বলতে গিয়ে মুখে হাসি ফুটত। কি বলতে  
জানো ? একমাত্র তোমার নাকি ঝাঁটি দরদ ছিল দিদির জন্ত।

অগিমা আবার একটু কেঁদে নিয়ে আবার চোখ মুছে বলে, তোমার  
মামার কাছে দিদির মরার ঘটনাও শুনেছি। দিদি মরতই—কিন্তু তুমি না  
এলে, বুদ্ধি করে ওনাকে ফোন করে ডাক্তার না ডাকলে দিদির নাকি এমন  
বহুনা হত যে পাগল হয়ে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ত, নয় কাপড়ে স্পিরিট  
ঢেলে জালিয়ে দিত—

এটা জানা ছিল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সমরেশ বলে, মামীমার কি হয়েছিল আজও  
আমি জানি না।

: আমিও ঠিক বুঝি না। ডাক্তার ব্যানার্জি নাকি বলেছেন যে কিছুদিন  
হার্টের কি গোলমালের সঙ্গে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল। ছোটো একসঙ্গে  
না হলে দিদি নাকি ঝাঁচত।

সময় বেশ কখন তার হৃৎনয়ন নতুন মামীর সঙ্গে কখন দেখা করতে যাবে ভবানীকে কিছুই জানায় নি। দিনটার সময় তার ভবানীর সঙ্গে দেখা করার কথা। হিসাব করে আধঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে সে মামাবাড়ি এসেছিল, মামীর সঙ্গে দশ পনের মিনিট কথা বলে বিদায় নিয়ে ভবানীর আপিসে চলে যাবে।

চারটের আগে বিদায় নেওয়া হয় না। কথায় মশগুল হয়ে থেকে দেয়াল-ঘড়িতে মিষ্টি আওয়াজে তিনটে বাজতে শুনে সচেতন হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্ত তার বড়ই আতঙ্ক জেগেছিল। সময় সম্পর্কে ভবানী ভীষণ কড়া মানুষ। গোড়াতেই এরকম টাইম খেলাপ করার জন্ত না জানি সে কি বকম রেগে যাবে!

তারপরেই সময়শেষের খেয়াল হয় যে নাঃ, ভাবনার কাষ্টন নেই। অগিমার সঙ্গে ভাব করার জন্ত ভবানীই তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে। দেবী করার জন্ত রেগে গেলেও নবতম মামীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার দেবী হয়েছে জানালেই ভবানীর রাগ জল হয়ে যাবে।

সে খুলীই হবে তার কৈকিয়ৎ শুনে।

চারটে বাজলে সে বলে, এবার তো আমার উঠতে হয়।

অগিমা বলে, এসো গিয়ে। রোজ আসবে কিন্তু।

সময় বেশ হেসে বলে, আমার জন্ত নিজে যা করলে নিজেই তা পণ্ড করতে চাও? এতবড় সংসার ঘাড়ে, মামা নতুন কাজে নামাচ্ছে, রোজ আসতে হলে—

অগিমা বাধা দিয়ে বলে, দ্বিদি ঠিক কথাই বলত, বয়সের তুলনায় তুমি সত্যি ভারি ছেলেমানুষ। রোজ আসতে বলেছি বলেই রোজ আসতে হবে? ওটা তো কথার কথা। মানে এই যে তুমি এলে আমি ভারি খুলী হব।

অগিমা একটু হাসে, মাঝে মাঝে সময় করে এসো—তাতেই হবে।

আমিও মাঝে মাঝে সময়ে অসময়ে তোমাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হব  
কিন্তু ।

ভবানী সত্যই য়েগে গিয়েছিল ।

সমরেশ হাজিরার খবর পাঠাবার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক তাকে বসিয়ে  
রেখে ঘরে ডেকে পাঠিয়েই সে বলে, তোকে কখন আসতে বলেছিলাম শনু ?  
টাইমের ব্যাপারে এমন ঢিলেমি করলে—

: ঠিক টাইমেই বেরিয়েছিলাম মামা । মামীর জন্তু দেৱী হয়ে গেল ।

ভবানীর রাগ জল হয়ে যায় । সে হাসিমুখে বলে, গিয়েছিলি নাকি ?  
কি কথা হল ?

: হাজার রকম কথা । সে সব মামীর কাছেই শুনো । আমি যা বুঝলাম  
আজকে, এ মামীর মধ্যে কোন প্যাচ নেই । একটি কথাও লুকাবে না ।

ভবানী আরও খুসী হয়ে বলে, তোর তবে ভালই লেগেছে মামীকে ?

সমরেশ বলে, ভাল লাগবে না ? আগের মামীর নিজের বোন—আগেও  
তো চেনাশোনা ছিল । তোমায় কিন্তু আমি একটা কথা বলছি  
মামা, রাগো আর যাই কর । কোন মানুষ একলাটি থাকতে পারে না, পাগল  
হয়ে যায়, এটা যেন কখনো ভুলোনা ।

মোটা একটা কাইল টেনে ভবানী পাতা ওণ্টায়—যেন শুনতেই পারনি  
সমরেশের উপদেশমূলক মন্তব্য ।

খানিক পরে মাথা তুলে বলে, তুলব না । আমিও অনেক শিক্ষা  
পেয়েছিলুম ।

ভবানীর প্রস্তাব শুনে সমরেশ চমৎকৃত হয়ে যায় ।

ভবানী বলে, আমি ভেবে চিন্তে কি বুঝলাম জানিস ? ছাচরামির  
কারবার তোর ছায়া হবে না । তোর ধাতটাই অন্তরকম হয়ে গেছে । কুই

বয়ঃ একটা ছাপাখানা দে, একটা মাসিক কি সাপ্তাহিক কাগজ বার কর, বই ছাপা।

: কোনদিন করিনি, কিছু জানি না—

: জানবার কি আছে? ছাপার কাজ, বিজ্ঞাপন আমি জুটিয়ে দেব। নতুন লেখক লেখিকাদের লাগসই বই ছাপিয়ে যাবি। বুঝে করতে পারলে কয়েক বছরে লাভপতি হয়ে যেতে বাধা কি?

সমরেশ খানিকক্ষণ ভাবে।

: এর পেছনে তোমার অঙ্ক কোন মতলব নেই তো? যুদ্ধের প্রচার, মার্কিন প্রচার ছাপাতে বলবে না তো?

: পাগল হয়েছি? আমি কি এত বোকা? এদেশে যুদ্ধের প্রচার, মার্কিন প্রচার চালিয়ে ব্যবসা পাড়ায়? বাড়াবাড়ি করতে গেলেই একটা হৈচৈ হবে, লোকে বয়কট করে দেবে। মনে আছে সেই কবে শুরু হয়েছিল—ছেড়ে দাও বঙ্গনারী, কাঁচের চুড়ি, কতু হাতে আর পরোনা? তুই তখনো জন্মাস নি। ছ' দশ বছরের শিক্ষা নয়—ছ' তিন পুরুষের শিক্ষা। ব্যবসা কর আর যাই কর, বজ্জাতি করতে গেলে এ দেশের লোক আর সহাবে না। ওদের ধাতটাই বদলে গেছে।

: এত চোরা কারবার চলল কি করে তবে?

: লোকের এই ধাতটাকে ভাঁওতা দিয়ে চলল। মাহুব যাদের বিশ্বাস করেছে তারাই চোরা কারবার চালাতে পেরেছে—নতুন লোকে পারে নি। আপনজন শত্রু হবে এটা বুঝতেও কিছুদিন মাহুকের সময় লাগে—আপন জনকে কিছুদিন শত্রুতা করে প্রমাণ দিতে হয় যে সে শত্রু।

শেষ মুহূর্তে ভবানী বলে, শ'দেড়েক টাকা মাইনে দিয়ে কুমারকে পাওয়া যাবে? দেড়শ'তে শুরু, প্রেস আর পাবলিকেশন চালু হলেই ছ'শো—সাতের বছর থেকে আড়াই শো। নিজের চেষ্টায় যদি লাভ বাড়াতে পারে, কমিশনও পাবে।

: আমি বললেই কুমার রাজী হবে।

: ওকে বলে রাজী কর। এত মাথার চর্চা করেও মাথা চর্চার দাম পেল না—ওকে স্লযোগ দিলেই প্রাণপাত করে খাটবে। ওর মাথা খাটানো তোর কারবার দাঁড় করানোর মন্ত একটা হেল্প হবে।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে সমরেশ বলে, মামা, তুমিই তবে আমাকে দিয়ে নিজের আর একটা কারবার ষ্টার্ট করাচ্ছ ?

ভবানী হেসে বলে, সাথে কি বলি ছেলেমানুষ, গোমুখ্য ? সব লাভ ঘায়ে তোর পকেটে, আমি যে টাকাটা লাগাব সেটা উঠে আসবে কিনা সন্দেহ, আমি নিজের আরেকটা কারবার ষ্টার্ট করছি ? আমার লাগানো টাকাটা যাতে উঠে আসে একটুকু আমি দেখব শুনব—লাভের এক পয়সা ভাগ চাইব না।

সমরেশ বলে, ভাগাভাগির একটা ব্যবস্থা রাখলেই আমি কিন্তু খুশী হতাম মামা। তোমার টাকাটা যাতে উঠে আসে, লাভও যাতে হয়, সেদিকে তোমার নজর থাকত। তুমি যেন শুধু দায় সারছ, কিছু টাকা জলে ফেলতে হবেই জেনে আমার ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে দিচ্ছ।

ভবানী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তারপর গভীরভাবে কড়া স্বরে বলে, এই মেয়েলি আফ্লাদিপনা ভাবটা তোকে শুধরে নিতে হবে—নইলে কোনদিন কিছু করতে পারবি না। এটুকু বুদ্ধিও তোর নেই যে বুঝতে পারিস, আমি যা করছি আমার নিজের হিসাবেই করছি ? আমি দায় সারছি, না তোকে দয়া করছি, না মায়া করছি—ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি ? একটা স্লযোগ পেয়েছিল, সেটা কাজে লাগাতে উঠে পড়ে লেগে যাবি—আমি কেন কি করি সে ভাবনা তোর কেন !

মেয়েলি আফ্লাদিপনা ? সমরেশ মাথা নীচু করে বসে থাকে। ভবানী চা আর কেক আনিয়ে দিলে তার মনে হয়, নিজের খিদে ভেঁটার ব্যাপারটা পর্যন্ত সে ভুলে থাকে, ভবানী চা কেক আনিয়ে দেবার পর থেয়াল হয়।

## মল

ভবানীর হঠাৎ অগিমাকে বিয়ে করে বসার খবর সমরেশ নন্দিতাকে জানায় নি, ঝোঁকের মাথায় শুধু একটি প্রশ্ন করে একথানা কার্ড লিখেছিল, খবর জানো ?

নন্দিতাও তার নিজের নাম ছাপানো কাগজে খামের চিঠিতে সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল, সুখবর কি অজানা থাকে ?

তারপর আর তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

ছাপাখানা চালু হবার পর একদিন তার কথা ভেবে মনটা ব্যাকুল হলে সমরেশ তাকে নিজের সমস্ত বিবরণ জানিয়ে এবং তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চেয়ে অস্বাভাবিক একথানা পত্র লেখে।

নন্দিতা জবাবে জানায় যে তিন নম্বর মামীর চেষ্টায় তার একটা গতি হয়েছে জেনে সে খুব খুসী হয়েছে, নতুন একটা বই লেখা নিয়ে নিজে সে এতদিন মশগুল হয়ে ছিল, বইটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শীঘ্রই সে কলকাতায় ফিরবে এবং বলাই বাহুল্য যে তার নতুন ছাপাখানাতে তার নতুন বইটা ছাপতে দেবে।

ছাপার পয়সা অবশ্য দেবে ভবানী।

মাসখানেক পরে একদিন সত্য সত্যই সাতখানা মোটা মোটা রুলটানা খাতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে নন্দিতা প্রেসে হাজির হয়।

তার সুন্দর স্বাস্থ্য আর হাসিখুসী ভাব দেখে সমরেশ মনে মনে থ'বনে থাকে।

নন্দিতা বলে, কাল ফিরেছি, কালকের দিনটা বিশ্রাম করলাম, গাড়ীতে মোটে ঘুম হয় নি। আজ সকালে তোমার মামাবাড়ি গিয়েছিলাম।



: মামাবাড়ি গিয়েছিলে ?

: তুমি দেখছি আশ্চর্য হয়ে গেলে। এতকাল পরে কিরলাম, খামীর সঙ্গে দেখা করতে যাব না ?

: সতীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

নন্দিতা হাসে।

: শুধু দেখা হওয়া ? এক বেলায় গলায় গলায় ভাব হয়েছে। বেশ ঢালাক চতুর কিন্তু বড় বেশী মেয়েলি ভাব। সেটা এক হিসাবে ভালই হয়েছে, তোমার মামার বড় ভাল লেগেছে। আমি যেচে গিয়ে ভাব করেছি বলে কী খুসিই যে হয়েছে তোমার মামা !

সমরেশ যেন দিশেহারার মত প্রশ্ন করে, তোমার একটু হিংসা হল না, রাগ হল না, অপমান বোধ হল না—?

চেয়ারে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে বসে নন্দিতা বলে, তুমি বুঝবে না। আমি যেন বেঁচেছি। তোমার মামাও বেঁচেছে। আমি একেবারে জন্মের মত ত্যাগ করি নি জেনে যে কি আনন্দ ভদ্রলোকের ! ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, ওর সেকাল একাল মেশানো মেয়েলি মার্কী বোঁটাকে বেচে ডেকে এনে ভাব করলাম—মামা তোমার বর্তে গেছে।

নন্দিতা পুরুবাঁলি ভঙ্গিতে পা ছুটো পর্যন্ত চেয়ারে তুলে আরও আরাম করে বসে।

: ওখানে নেয়ে ধৈয়ে ঘণ্টা খানেক কিমিয়ে নিয়ে তোমার এখানে চলে এলাম।

সমরেশ বলে, তুমি তবে সত্যি হার মান নি ? আগোবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছ ?

নন্দিতা একটু হাসে।

প্রেস চালু করা মাত্র কাজের বেশ চাপ পড়েছে। এসব বিষয়ে ভবানী  
ডিলে দেবার মাহুস নয়।

সমরেশকে দিয়ে ছাপাখানা চালাবে স্থির করার পর সে ছাপার কাজও  
যোগাড় করেছিল যথেষ্ট।

কুমার গেলি প্রফের একটা তাড়া নিয়ে এসে সমরেশের টেবিলের সামনে  
অধনীস্থ কর্মচারীর মতই দাঁড়িয়ে নিস্পৃহ ভাবে জিজ্ঞাসা করে, এ প্রফ কি  
আমরা দেখে দেব, না ওরা দেখবেন? সাত দিনের মধ্যে এটা ছাপিয়ে  
দিতে হবে, ভবানীবাবু ফোন করে জানিয়েছেন। ওদের প্রফ দেখতে দিলে  
কিন্তু সাতদিনের মধ্যে কিছুতেই ছাপানো যাবে না।

নন্দিতা তামাসার ভঙ্গিতে হুঁহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলে, কেমন  
আছেন কুমারবাবু? সমরেশের প্রেসটা চালু করতে আপনিও উঠে পড়ে  
লেগেছেন দেখছি।

কুমার শুধু মাথা নত করে বলে, নমস্কার। ভাল আছেন? আমি এখানে  
চাকরী করি।

নন্দিতা খিল খিল করে হেসে উঠতে কুমার ও সমরেশ আশ্চর্য হয়ে তার  
দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন ছেলেমানুষী তামাসা, হুঁজন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ  
মাহুষের শুধু চেনা-পরিচয় থাকা ভদ্রতার ভান করা—তাতেই আমোদ পেয়ে  
এমনভাবে হেসে উঠতে পারে নন্দিতা!

ভবানী অগ্নিমাকে বিয়ে করায় সত্যিই সে কি তবে খুসী হয়েছে, মুক্তির  
স্বাদ পেয়েছে?

অথবা হান্ধা হয়ে গেছে তার প্রকৃতি?

হাসি খামিয়ে চারদিকে কর্মব্যস্ত মাহুষগুলির দিকে চেয়ে লজ্জা পেয়ে  
নন্দিতা নীচু গলায় বলে, অমন করে তাকিও না হুঁজনে।

নন্দিতা আজকাল লজ্জাও পায়!

কুমার সমরেশের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, প্রফ পাঠাব কি

পাঠাব না ? এ ব্যাপারে কিন্তু তোমাকেই ডিসিশন নিতে হবে—দারুণ তোমার ।

: এতো ভারি মুন্সিলের ব্যাপার হল । যেমন কপি দিয়েছে তেমনি ছাপিয়ে দিলেও তো ওরা আবার রাগ করবে ।

নন্দিতা কুমারকে বলে, এরকম ভাবুকতা নিয়ে প্রেস কেন কোন কিছু চালানো যায় না । ওদের প্রফ পাঠিয়ে দাও, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দাও যে কাল পরন্তু প্রফ ফেরত না পেলে এ হুন্ডায় বই বেরোবে না, সেটা অসম্ভব ।

সমরেশ মাথা নাড়ে ।

: উহ ওভাবে কাজ হবে না । ওরা আমার পেয়ারের লোক—কড়া কড়া কথা বললেই চটে যাবে । প্রফগুলি দাও—আমাকেই যেতে হবে ব্যাটাদের কাছে । উপায় কি ।

নন্দিতা বলে, এ বুদ্ধি বরং ভাল । অধ্যাবসায়ের পরিচয় পেয়ে মামাও খুসী হবে, ওরাও রাগ করবে না !

কুমারের হাসি দেখেই বোধ হয় সমরেশ রেগে যায় ।

বলে, তুমি একটা মস্ত ভুল করছ একনম্বর নতুন মামী । আমি আমার দয়ার ভিথিরি নই । এ প্রেসের লাভ আমি নেব ভাবছ ?—এ তো আমার প্রেস ! কুমারের মত আমিও এখানে চাকরী করছি । মামাকে একথা বলতে গেলে ঝগড়া হত, তাই চুপ করে আছি । হিসাব মত মাইনে আর কমিশন ছাড়া লাভের এক পয়সাও আমি নেব না, সব আমার পকেটে যাবে ।

নন্দিতা এবার স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করছে বোকা ঘাঘ । কুমার নীরবে চলে যাবার জন্তু পা বাড়ালে সমরেশ তাকে ডেকে বলে, যাচ্ছিস কেন ? কথাগুলি কি আমি শুধু এক নম্বর নতুন মামীকেই শোনালাম ? তাকেও শুনিয়েছি ।

কুমার বলে, আমায় এসব শোনানো তোমার উচিত নয়, আমার কাছে

কিছু শুনতে চাওয়া আরও বেশী উচিত নয়। আমি এখানে মাইনে করা গকর।

: আমার চাকর—আমার সহকর্মী।

নন্দিতা বলে, তোমার কথার আসল ভাবটা ধরতে পারছি না একদম। এটা রাগ না অভিমান? না, আমায় ধোঁচা দিচ্ছ? তোমার মামার অনেকদিন আগেই তোমার একটা গতি করে দেওয়া উচিত ছিল। অপারগ তো নয়—তোমায় একটা প্রেস করে দেওয়া ওর কাছে ছেলেখেলা। উচিত কাজটা এতদিনে করেছে। একে দয়া করা বলে না, এর নাম দায় পালন করা, কর্তব্য করা। প্রেসটার মালিক হতে তোমার আপত্তি কিসের?

সমরেশ বলে, এরকম মামার দান নেব না, নেওয়া উচিত নয়—এই আপত্তি। দশ বছর মা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি, বাবা মরবার পর মা আমাকে পাঠালে নেহাৎ মামীর খাতিরে এলোমেলো একটা ব্যবস্থা করবে বলেছিল—মাকে কত ধমক দিয়েছিল তুমি শোন নি। এক মামীর খাতিরে ওইটুকু করতে রাজী হল। আরেক মামীর খাতিরে শুধু কারবারের গুণ্ডাগোলে জড়িয়ে জেলে যাওয়া সামলে দিল। এবারে তিন নম্বর নতুন মামীর খাতিরে একটা প্রেস করে দিল।

ক্রমে ক্রমে গলা চড়ছিল সমরেশের, শেষের দিকে সে প্রায় চীৎকার শুরু করেছিল।

প্রেস শুরু হয়ে গেছে। কাজ বন্ধ করে তার কথা শুনছে।

আরও জোরে চীৎকার করে সমরেশ বলে, কেন, বড় কোন ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিতে পারত না মামা? ছেলেমাছবি একটা ছাপাখানা করে দিয়ে সব দিক সামলাচ্ছে। বাবার 'তিনশ' টাকা চুরি করে পালিয়ে মামা বড় হয়েছে—আমায় ব্যবসায়ে নামার স্বেচ্ছা দিলে মামার চেয়ে বড় হতে পারব না কে বলেছে?

নন্দিতা এবং কুমার মুখ চাওয়া চাওয়া করে।

নন্দিতা হৃৎকণ্ঠে বলে, মামা তোমার ভালই করেছে। তোমার মত ভাবুক ছেলেকে খোলাবাজারে ব্যবসারে নামাবার দায় দিলে, তুমি নিজেও ডুবতে, মামাকেও ডোবাতো। প্রেসটা চালিয়ে কেঁদানি দেখাও না? তারপর নয় বড়বাজারে মাড়োয়ারী আর সায়েরবদের সঙ্গে কম্পিটিশন চালাতে যাবে?

কুমার বলে, মেয়েরাও তোর চেয়ে ভাল হিসাব নিকাষ করতে পারে সমু।

সমর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

: আমি সাতদিন বাড়ি থেকে ঘর থেকে বেরোব না।

নন্দিতা প্রায় ধমকের সুরে বলে, ওসব প্রক্রিয়ায় আজকের দিনে কাজ হয় না সমরেশ! ওসব যোগাভ্যাসের দিনকাল পার হয়ে গেছে। সাতদিন ঘরের কোণায় ভয় ভাবনা চিন্তা ধ্যান ধারণা চালিয়েই মর্ম কথাটা ধরতে পারবে—এরকম ধারণাই তোমার ভাবপ্রবণতার চরম প্রমাণ। তার চেয়ে সাতদিনের ছুটি নাও, এদিক ওদিক ঘুরে বেরিয়ে দেখে এসো—কাজ হবে।

সমরেশ ধাতস্থ হয়ে হাঁকে, মহাদেব!

হাফ প্যান্ট হাফ সার্ট পরা সতের আঠার বছরের ছেলেটা এসে সেলাম হুঁকে বলে, জী?

সহরতলীর কোন এক পাটের কলে কাজ করে তার বাপের এক সহোদর ভাই—গুধু এইটুকু ভরসা করে মহাদেব সহরে এসেছিল।

তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে প্রেসের ছটকো কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল ভবানী।

একটা পয়সা ময়লা ধুতিটার খুঁটে ছিল না মহাদেবের। একটা পয়সা ছ'চার দিনের মধ্যে পাওয়ার আশা ছিল না কারও।

তবু সে দশ টাকায় প্রেসের দারোয়ানগিরি আর বয়গিরি করতে রাজী হয় নি—এত ছোট নতুন প্রেস। পনের টাকার জন্ত জিদ ধরে আদায় করেছিল।

সমরেশ হুকুম দেয়, চা ওর চপ্ লে আও।

মহাদেব সর্দিনয়ে বলে, দোকানদার বল্ দিয়া সিলিপ্সে ঔর মাল মাহি  
বেগা হুয় ।

জুয়ার খুলে দশটাকার একটা নোট বার করে মহাদেবের মুখে ছুঁড়ে দিবে  
সমরেশ গর্জন করে ওঠে, হাম সিলিপ্সে আননে বোলা হায় তুমকো বজাত  
হারামজাদা !

মহাদেব নোটটা লুকে নিয়ে বলে, মাপ কীজিয়ে হুয় ।

সঙ্গে সঙ্গে সে অবশ্য হুকুম তামিল করে চা-বিস্কুট আনতে চলে যায় না ।  
গম্ভীর মুখে জানায় যে বিশ পঁচিশ টাকা বাকী পড়ে আছে বলেই যে দোকানী  
সমরেশের মত মহারাজ ব্যক্তিকে আর এক পরসা ধার দিতে রাজী না হয়ে  
তার চাকরকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করে, সে দোকান থেকে আর কোনদিন  
সে কিছু আনতে যাবে না ।

কাছেই আরেকটা নতুন দোকান খুলেছে । ওই দোকান থেকে সব কিছু  
সে এনে দেবে ।

মহাদেব হাসিমুখে বলে, বাবুজী, হামি লোক তো তিন মাহিনাকা উপর  
কাম করতা । খানা মিলা ঔর দুটো প্যাণ্ট মিলা, একঠো জামা মিলা ।  
বেতন নাই মিলেগা বাবুজী ?

সমরেশ গর্জন করে ওঠে, যা আনতে দিলাম সেটা আগে নিয়ে আয় তো  
হারামজাদা ! মাইনের কথা পরে হবে ।

দশটাকার নোটটা নিয়ে সেই যে মহাদেব চা-বিস্কুট আনতে যায়, আর  
কিরে আসে না ।

আধঘণ্টা অপেক্ষা করে প্রেসের একজন কম্পোজিটরকে দিয়ে চা আর  
বিস্কুটের বদলে চা আর সন্দেশ আনিয়ে দিয়ে সমরেশ এমনভাবে  
দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে যে নন্দিতা বা কুমারেশ মুখ খুলতেও মায়া  
বোধ করে ।

তার সন্দেশ খায় ।

ঠাঙা চাপ্ত খায়।

সমরেশ খাভহু হবে এই আশাতে খায়।

সমরেশ হঠাৎ একটু হাসে, বলে, তোমাদের খুলেই বলি। এটা পলিসির ব্যাপার—আমার অবস্থা এর মধ্যে কাছিল হয়ে আসে নি। আমার পাওনা দিতে লোকে যেমন ছ্যাচরামি করছে, লোকের পাওনা দিতে আমিও সেরকম ছ্যাচরামি শুরু করেছি।

আবার সমরেশ হাসে।

: এখনো ছেলোমাহুষ রয়ে গেছি তো, তাই তোমাদের দেখিয়ে দশ টাকার নোটটা ছুঁড়ে দিয়ে বাহাদুরী করার ঝোকটা সামলাতে পারলাম না।

নন্দিতা মুহূর্তে বলে, তিনমাস মাইনে পায় নি বলছিল?

সমরেশ বলে, ব্যাটার মাইনেই ঠিক হয় নি, মাইনে পাবে কিরকম? কেঁদে কেঁদে বলেছিল শুধু খেতে পেলেই জানু দিয়ে খাটবে—কাজ দেখে পরে দু'চার টাকা বেতন যদি খুসী হয়তো দেব।

কুমার বলে, পনের টাকা দিতে রাজী হয়েছিলে।

সমরেশ বলে, কয়েক মাস কাজ শেখার পরে দেব বলেছিলাম, খুসী হয়ে তাই মেনে নিয়েছিল।

নন্দিতা বলে, তুমি অমনি বিনা মাইনেতে তিন মাস খাটিয়ে নিলে? পরস্যাওলাদের পাওনা দিতে পাল্লা দিয়ে ছ্যাচরামি কর তার একটা মানে বোকা যায়—এভাবে এই গরীব বেচারাদের ঘাড় ভাঙা তো সাংঘাতিক কথা! দশ টাকার নোটটা নিয়ে ভেগেছে বেশ করেছে, ও যদি তোমার তবিল ভেঙ্গে পালাত তাহলেও ওকে আমি দোষ দিতাম না।

সমরেশ গরম হয়ে বলে, আমার বাবার লাখ টাকায় কারবার সকলে খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিল—

নন্দিতা আরও নরম হয়ে বলে, কারা খেয়ে শেষ করে দিল—ওরা?

যাদের এমনি করে খাটাও শুধু খেতে পেয়ে যারা তিন মাস হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিতে রাজী হয় ?

সমরেশ হুক্তিতর্কের ধার দিয়ে যায় না, গরম হয়ে বলে, তোমরা বুঝবে না ! কি অবস্থা থেকে কি অবস্থায় পড়ে কীভাবে মামীদের দমায় সামলাবার স্বেচছা পেয়েছি—তোমরা ধারণাও করতে পারবে না । একটা পয়সা আমার কাছে এখন এক কোঁটা গায়ের রক্ত—

: এভাবে পারবে পয়সা করতে ?

: চেষ্টা করে দেখি ।

কুমার প্রশ্ন করে, একটা পয়সা এক কোঁটা রক্ত, যাকে পাওনা পয়সা না দিয়ে পারা যায় তাকেই না দেওয়ার পলিসি—আমায় কেন ঠিক তারিখে মাইনের টাকাটা গুণে দিস ?

সমরেশ হেসে বলে, ভেবেছিল মস্ত ধাঁধায় ফেললি ? একেবারে জব্ব করে দিলি ? তোর বেলাতেও আমার পলিসি চলছে । তোকে ঠিক সময়ে ঠিক মত মাইনে না দিয়ে উপায় নেই বলেই দিই—পারলে তোকেও আমি বিনা মাইনেয় খাটাতাম ।

কুমার হেসে বলে, তুই এবার পাগল হয়ে যাবি ।

সমরেশও হেসে বলে, পাগল তো হয়েই গিয়েছিলাম—পাগলামিটা এবার সামলে নিচ্ছি ।

নন্দিতা ও কুমার আবার মুখ চাওয়া চাওয়া করে ।

নন্দিতা প্রায় স্নেহে জিজ্ঞাসা করে, কতায় বাড়ি ফেরো ?

: নটা দশটায় ।

: কতায় আসো ?

: আটটা নটায় ।



: তাহলে মানে পাড়াচ্ছে, রাত দশটার পরে গেলে কিবা সকাল আটটার আগে গেলে তোমায় বাড়িতে পাওয়া যায়।

সমরেশ মাথা নাড়ে।

: সব দিন পাওয়া যায় না। কোনদিন রাত বারটা একটায় গিয়েও পাবে না, ভোর পাঁচটার গিয়েও পাবে না।

: মানে ?

: বড় কাজ পেলে কাজের খাতিরে ছ'একটা রাত বাইবে কাটাতে হয়। মাগনায় পেগ খেয়ে নেশাও করতে হয়। তেমন নেশা অবশ্য আমি করি না, বাড়ি কিরতে পারি, কিন্তু ওই যে বললাম একটা পয়সা আমার এক ফোঁটা রক্ত। যত খুসী ডিম মাংস পরোটা বিনা পয়সায় খাওয়ায়, হিসাবটা ছাড়তে পারি না।

: হিসাব ?

: হিসাব বৈ কি।

প্রেসের কাজের চাপেই কুমারকে চলে যেতে হয়।

সমরেশ বলে, আমাকে তো বেরোতে হবে ?

: কতক্ষণের জ্ঞান ?

: ঘণ্টা দেড়েক।

: আমি এখানে কিছুক্ষণ বসে থাকতে চাইলে আপত্তি করবে ?

: যতক্ষণ খুসী বসে থাকো।

সমরেশ আর ফেরে না। রাত্রি আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নন্দিতা বাড়ি ফিরে যায়।

তিনদিন পরে নন্দিতা ভোর রাতে সমরেশকে পাকড়াও করে। তার জানা ছিল যে সমরেশ শেষ রাতে ওঠে।

প্রণতিও যে আজকাল দাদার মত শেষ রাত্রে উঠতে শুরু করেছে এটা তার জানা ছিল না।

একডালা ভাড়া হয়ে গেছে।

দোতলায় তাদের শোয়ার ঘরে বসিয়ে নন্দিতাকে প্রণতি বলে, দাদা কিন্তু রেগে যাবে বলে রাখছি।

: কেন রেগে যাবে?

: সারাদিন এত খেটে এসে একটু বিশ্রাম না পেলো মানুষ রেগে যাবে না?

নন্দিতা হাসিমুখে তার গাল টিপে দিয়ে বলে, রাগবে না। সারাদিন খেটে যাতে একটু বিশ্রাম পায় সেকথা বলতেই এসেছি।

সত্যই কি ভালবাসা হয়েছিল কুমার আব নন্দিতার?

কে জানে!

সমরেশ অবশ্য বিশ্বাস করে যে সত্যই দু'জনের ভালবাসা হয়েছিল। তবে তার মনে বার বার সংশয় জেগেছে যে ভালবাসাটা দু'পক্ষেরই ছিল, না, একপক্ষের ছিল।

সমরেশ আজও জানে না যে ভালবাসা একপক্ষে হয় না। ওকে আমি ভালবেসেছি—একজনের এটা ভাবাই তো ভালবাসা নয়। ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে গেলেও নয়। ওটা স্রেফ শ্রাকামি, ছেলেমানুষী, আত্মকণ্ঠস্বর।

দেহধর্মী দুই বিপরীতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, পরস্পরকে উগ্রভাবে চাওয়া এবং না চাওয়ায় মোট সংজ্ঞা ভালবাসা।

কুমার ও নন্দিতার মধ্যে ভালবাসা জন্মেছিল কিনা জানবার জন্ত ওদের কয়েক বছরের অতীত মেলামেশার কাহিনী খাঁটতে হয়।

উপায় কি?

সবদিক দিয়েই বেমানান।

বয়সে জ্ঞানে বিজ্ঞায় বুদ্ধিতে—সব হিসাবেই নন্দিতা তাকে ছাড়িয়ে আছে।  
এমন কি লম্বায়ও সে দু তিন ইঞ্চি বড় হবে।

ইদানীং রোগা হয়ে যেতে আরম্ভ করলেও একমাত্র হয়তো গায়ের জোরে  
নন্দিতা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

কিন্তু কেউ যদি উত্তোঙ্গী হয়ে অভাবনীয় ব্যাপার ঘটায় তাহলে আর  
উপায় কি।

নন্দিতা নিজেই বলে, সত্যি কথা বলতে ভয় কি? তোমায়  
আমার খুব ভাল লাগে। একটু হাবাগোবা কাঁচাপাকা ভারি ক্লি সংসারী  
মাছুষ—

নন্দিতা হাসে।

: হ্যাবলা মাছুষ ছু'চোখে দেখতে পারি না। তুমি হ্যাবলা নও বলেই  
বোধ হয়।

: শুধু এই জ্ঞত? মুখের ওপর বোকা হাবা বললেও রাগ করি না  
বলেও হতে পারে!

: ও বাবা!—রাগ হয়ে গেল? একটু বোকা হাবা মানে কি বললাম  
তাও বুঝলে না, এমন বোকা হাবা? তোমার মাথাটাকে ভেঁতা বলি নি—  
বলেছি তুমি স্মার্ট নও, চালাক নও। সেটা তোমার দোষ নয়। একটা  
বাজে চাকরির ছুতোয় যে ফ্যামিলিতে একমাত্র ছেলের লেখাপড়া খতম করিয়ে  
দেওয়া হয়, সে ফ্যামিলিতে মাছুষ হয়ে কি করে তুমি স্মার্ট হবে, চালাক হবে?  
প্রশংসা করলাম—হয়ে গেল রাগ!

এসব ভাবের আলাপ।

এ ধরনের আলাপ কারণে বা অকারণে একজন আরেকজনের গেলেও  
হত, আবার একজন আরেকজনকে ডেকে নিয়ে বাজারে যাবার সমস্ত রাস্তায়  
হাঁটতে হাঁটতেও হত।

বোকা হাবা বললে কুমারের রাগ হত, তার কিন্তু সব চেয়ে বিস্তী লাগত নন্দিতার আরেক ধরনের কথা শুনে ।

নন্দিতা মাঝে মাঝে তাকে সতর্ক করে দিত, বোকা হাবার মতই তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করত যে স্বপ্নেও সে যেন ভুল না করে বসে যে তার এই ভাল লাগা ভালবাসা !

খলি হাতে বাজারেই হয়তো যাচ্ছে সকালবেলার মানুষ ও গাড়ী ভিড় ঠেলে ঠেঁকিয়ে এড়িয়ে এড়িয়ে—হঠাৎ বলে বসত, বাজারে যাব, বাড়ি গিয়ে ডেকে এনে সাথী করলাম । অল্প কাউকে এরকম প্রশ্রয় দিলে হয়তো রাস্তার মাঝখানেই প্রেম নিবেদন করে বসত । ওদিক দিয়ে বোকামি কোরো না কিন্তু—আমি একদম তোমার প্রেমে পড়িনি । তোমায় শুধু ভাল লাগে, বাস্—আর কিছু নয় । আমার ভাল লাগার অল্প মানে বুঝে নিও না, সাবধান ।

কুমার রোগে বলত, কথায় ব্যবহারে এতটুকু ইয়ে ভাব দেখেছ আমার কোনদিন ? ত্রিশ বছরের বুড়ী, ঠিক বয়সে বিয়ে হলে পাঁচ ছেলের মা হতে, কত লোকের সঙ্গে ছাবলামি করেছ ঠিক নেই—আমি তোমার প্রেমের কাঙাল নই !

নন্দিতা রাগত না, হাসিমুখে শান্ত ভাবেই বলত, আস্তে কথা বলো না ? প্রেমের কাঙাল নও বলেই তো তোমায় ভাল লাগে । কত প্রশ্রয় দিই, তবু কেঁউ কেঁউ গুরু কর না, হাত ধরার চেষ্টা কর না । এরকম একটা পুরুষ বন্ধু পেয়েছি—এ কি আমার কম ভাগ্যি ? তাইতো মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিই, ছেলেমানুষী কোরো না ।

শুনে কুমার হাসত ।

খলি ছলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলত, একদিন ঠেলা বুঝবে । তোমার তো আমি খেলাচ্ছি । একটু সামলে নিই, একদিন তোমায় নির্জনে কোথাও নিয়ে গিয়ে—

: এখুনি চল না ?

: খুব রাজী আছি—চল ।

: কিন্তু গায়ের জোরে তো পারবে না আমার সঙ্গে । শরীরটা ভাল করার চেষ্টা কর না, ভাল খাওয়া দাওয়া, একটু ব্যায়ামট্যায়াম করলে কি অপরাধ হয় ?

: ওসব কিছুই দরকার হবে না—দরকার যদি হয় তো আমার নিজের জন্ত হবে । হাড়ে বা জোর আছে তাতেই তোমাকে অনমনসে শাসনোত্তা করতে পারি ।

: পারবে ? একদিন পরীক্ষা করা যাক না ! সত্যি কিন্তু চেষ্টা করবে, গুণ্ডার মত মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবে—ফাঁকি দিতে পারবে না । খবরের কাগজে পাশবিক অত্যাচারের খবর পড়ি আর আমার কি মনে হয় জানো ? ভয়ে নিশ্চয় হাত পা এলিয়ে দিয়েছিল । নইলে করো সাধ্য আছে কোন মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ভোগ করে !

কুমার খানিক নীরবে হেঁটে গিয়ে বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ হেসে বলত, দেশটা কতকাল পরাধীন ছিল ভুলে গেছ ? পুরুষরাই পাশবিক অত্যাচার সয়ে সয়ে মরছে । গুণ্ডাদের সঙ্গে মেয়েদের গায়ের জোরের হিসাব !

থেকে দাঁড়িয়ে নন্দিতা সেকেলে নাটকের বিশেষ মুহূর্তের নায়িকার মত বিলোল কটাক্ষ হেনে বলত—মাঝে মাঝে তোমার মুখে এ রকম কথাগুলি বলেই তো—

শেষের দিকে কুমারের সঙ্গে নন্দিতার দেখা সাক্ষাৎ হত খুব কম । নন্দিতার আগ্রহের অভাবের জন্ত নয়, কুমারের আগ্রহ যেন হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি ঝিমিয়ে গিয়েছিল ।

কুমারের মা আর বোন যেদিন সমরেশকে দুপুরে খেতে বলে ছিল,

কুমারের কি অসুখ হয়েছে তার কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেছিল, তার কয়েক মাস আগে ।

দু'জনের মেলামেশার রকম লক্ষ্য করে সবে সকলের মনে খটকা লেগেছিল, ভাসা ভাসা ভাবে সকলে বলাবলি শুরু করেছিল যে তাদের অহুমান যদি সত্যি হয়, দুজনের যদি ভাব হয়েই থাকে—প্রায় সমবয়সী দু'জনের মিলনটা কি দরের ব্যাপার দাঁড়াবে ?

জুমিাত্রা ঝেঁঝে উঠে বলত, প্রায় সমবয়সী মানে ? নোনাদি দাদার চেয়ে তিন চার বছরের বড়—হয় তো তার চেয়ে বড় । নোনাদি ক'বছর বয়স ভাঁড়িয়ে বলে কে জানে ।

এটা গায়ের জ্বালায় কথা ।

নন্দিতা এবং কুমারের জন্মের আগে থেকেই দু'টি পরিবারের মধ্যে মোটামুটি জানাশোনা ছিল, কবে দেখতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে এ রকম একটা সুদূর সম্পর্কও নাকি আছে তাদের মধ্যে ।

এটা কারো অজানা নয় যে নন্দিতা কুমারের চেয়ে বছর দেড়েক বড় ।

সেটাই বা কম কি ?

পাঁচ বছরে গৌরীদান মহাশুন্টে মিলিয়ে গেছে, পঁচিশ বছরের ছেলের সঙ্গে বাইশ বছরের মেয়ের ঘটক মারফৎ বিয়ে হলেও লোকে আর মাথা ঘামায় না—কিন্তু মেয়ের বয়স ছেলের চেয়ে বেশী ?

মোটো বছর দেড়েক হলেও বেশী ?

তাদের মেলামেশা ঝিমিয়ে গিয়ে কদাচিৎ দেখা সাক্ষাতে পরিণত হওয়ায় অনেকে স্বস্তি বোধ করেছিল, কেউ কেউ ক্ষুণ্ণও হয়েছিল । ক্ষুণ্ণ হয়েছিল শুধু কুমারের বন্ধু আর নন্দিতার বান্ধবীরা ।

একমাত্র সমরেশ ছাড়া সবাই বুঝে গিয়েছিল যে তাদের অহুমান ছিল ভুল ।

ভবানীর সঙ্গে নন্দিতার বিয়ে হবার পর একমাত্র সমরেশ ছাড়া কারো মনে কোন সংশয় ছিল না।

সমরেশের মনে সংশয় ছিল বলেই নন্দিতা পাটনা চলে যাবার পর কুমার যে ভবানীর কাছে ব্যাপার বুঝতে গিয়েছিল—সে সম্পর্কে কুমারের অজুহাত সে মানতে পারে নি। সাইকোলজির বই ঘাঁটা বিজ্ঞা বাস্তবে মিলিয়ে দেখতে চায়—হাস্তকর অজুহাত মনে হয়েছিল।

ভবানী হঠাৎ অগ্নিমাকে বিয়ে করে ফেলার কয়েক মাস পরে নন্দিতা ফিরে এলে, একটু ঘনঘনই কুমার ও নন্দিতার দেখাশোনা হচ্ছে জেনে অল্প সকলে খেয়াল করার আগেই কুমারের মা আর স্নমিত্রা রীতিমত শঙ্কা বোধ করে।

স্নমিত্রা একদিন বলেই বসে, নোনাদি একবারটি আসে না—তুমি কেন এত ঘন ঘন ওদের বাড়ি যাও দাদা ?

কুমার হেসে বলে, কী বকছিস পাংগলের মত ? ঘন ঘন তোর নোনাদির বাড়ি যাই ?

: যাও না ?

: ছ’তিন মাসে ছ’তিনবার গিয়েছি কিনা সন্দেহ। আমার সময় আছে কারো বাড়ি যাবার ?

স্নমিত্রা বোকার মত বলে, রোজ রোজ তোমাদের তবে দেখা হয় কি করে।

কুমার গম্ভীর হয়ে গিয়ে গভীর খেদের সঙ্গে বলে, তুই এমন ছ্যাচরা হয়ে গেছিন্ ? এসব ভাবনা নিয়ে মাথা খারাপ করিস ? আমি ইচ্ছে করলেই তোদের ভাসিয়ে দিয়ে তোর নোনাদিকে নিয়ে চির জীবনের জন্ত হনিমুন করতে চলে যেতে পারতাম—তোদের জন্তই আমি তা করিনি। আমরা কি ঠিক করেছিলাম জানিস ? আমরা মানে তোর নোনাদি আর আমি যা ঠিক করেছিলাম।—দূরের কোন একটা শহরে ছ’জনে যেমন তেমন চাকরী নিয়ে চলে যাব—আর ফিরব না। তিন বছর চেষ্টা করে কোন একটা সহরে আমরা

হুজনে পঞ্চাশ বাট টাকার চাকরী জোটাতে পারিনি। তোম নোনাদির জোটে তো আমার জোটে না, আমার জোটে তো তোম নোনাদির জোটে না। তারপর শরীরটা বিগড়ে গেল, আমি অসম্ভবের আশা ত্যাগ করলাম—

কুমার টেরও পায় না সুমিত্রার কি প্রাণান্তকর সংঘম দয়াকার হয় শান্ত সুরে তাকে জিজ্ঞাসা করতে, শরীরটা বিগড়ে গেল? কি হয়েছিল দাদা? কি অসুখ হয়েছিল?

: অসুখ আবার কি হবে? অসুখ বিস্মুখ কিছু নয়, শরীরটা শুধু বিগড়ে গিয়েছিল।



## এগারো

তাকে ভাল লাগে ?

শুধু ভাল লাগে ?

নন্দিতার ভাবসাব ভাল করে বুঝতে না পারলেও তার একমাত্র বোনে-  
রকম দেখে কুমার ভড়কে যায়।

এক পোয়া মাছ এনেছে বাজার থেকে, ঘানির একটু তেল এনেছে—  
রোজকার শাক পাতার বদলে ছাঁকা তরকারী এনেছে আলু পটল আর একট  
কচি লাউ।

বোনের তবু গোমড়া মুখ।

কুমার ক্ষুব্ধ হয়ে বলত, কেন, তোদের মত বাজার হয় নি আজ ? ক  
খাবি ? মা আর কাকীমার তো একাদশী। ওরা তো কেউ খাবে না  
খাব শুধু তিনটে ছেলেমেয়ে, তুই আর আমি !

: ছাই বাজাব করেছ।

: কেন ?

মস্তব্য আসত এই এই ভাবে—

: কত বাজার করেছ আমাদের মনেব হিসাব কবে ! নোনাদি'র শেখানে  
বাজার তো ! নোনাদি বাজারে ডেকে নিয়ে গেলেই তোমার যেন খাপছাড়  
বাজার হয়।

কুমার খানিকক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল,  
কম পড়বে নাকি রে ?

: কম পড়বে ! হু' তিন দিনের বাজার এনেছ। তরকারী আনচে  
রেখে ঢেকে হু'তিন দিন করা যায়—মাছ তো এ বেলা রাখতে হবেই

রাধতেও হবে, খেতেও হবেই। নোনাদির কি, মাছটাছ এনে কেলিয়ে ছড়িয়ে খায়। দামী দামী শাড়ী গায়ে চড়িয়ে এদিক ওদিক গায়ে হুঁ দিয়ে চড়ে বেড়ায়। তোমার আঁকেল নেই? বোনেরা ছেঁড়া কাপড়ের নেংটি এঁটে রয়েছে—নোনাদির পরামর্শে কাপড়ের বদলে একগাদা মাছ এনে খাওয়াচ্ছ?

: ও!

: নোনাদির খপ্পরে পড়ে তুমি বড় হয়ে হয়ে গেছ দাদা!

খুঁতুতো বোন স্খারও গাল ফুলেছিল। সে কিন্তু মুখ বুজে ছিল আগাগোড়া। কুমারের লাঞ্ছনায় এবার তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

সে ফাঁস করে ওঠে, দাদা ছোটলোক হয় নি, তোমাবাই ছোটলোক হয়ে গেছ। একটু মাছ এনেছে বলে কি আবস্ত করেছে তখন থেকে। তোমাদের জন্ত এনেছে নাকি মাছ? আমার জন্ত এনেছে—আমি একলা খাব মাছ।

কুমারের মুখে অস্থায়ী একটু হাসি দেখা দিয়েছিল।

স্খা বাঁকের সঙ্গে আবার বলেছিল, নোনাদি হিংসেয় জলে পুড়ে মরছে সবাই। পরের মেয়ে তবু একটু দরদ আছে—বোন হয়ে তোমাদের খালি হিংসা!

কুমার উঠে দাঁড়িয়েছিল, কার চড়টা সশব্দে স্খার গালে পড়ে সে দেখতে পায় নি।

খানিক পরে স্খাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে অবশ্য জানা যেত কিন্তু সে জিজ্ঞাসাও করে না।

ওসব সস্তা কৌতুহল কুমারের ছিল না।

প্রাণে এই সহজ সরল প্রশ্ন জাগলে উপকারই অবশ্য হত কুমারের যে কার জন্ত কি বিষয়ে কেন এই কৌতুহল?

নিজের চালচলনের খানিকটা মানে বুঝতে পারত ওই কৌতুহলের মানে বুঝবার চেষ্টা করে।

বসন্তের মতই অস্থায়ী মিলনের উদ্গাদনা? এক সঙ্গে মিলে বাকী  
জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া?

নন্দিতার সম্পর্কে এ সব চিন্তা কুমারের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল  
কিনা একমাত্র সে নিজে ছাড়া কেউ তা বলতে পারবে না।

উঠতে বসতে চলতে ফিরতে কারণে অকারণে যাদের লাগত ঠোকাঠুকি,  
অশান্তি ব্যথা বেদনা রাগ অভিমান গেঁজিয়ে উঠত কমে বেড়ে দিবারাত্রি, মান  
অভিমান বিবাদ বিচ্ছেদ ঝগড়াঝাঁটি হিসাব নিকাশ কথা কাটাকাটি—

সব এলোমেলো মনে হয়।

মিথ্যা মনে হয়।

কেবল তার একার বেলা নয়, সকলের জীবনই যেন বহুরূপী মিথ্যায় জট  
পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সকলের জীবনকে এলোমেলো করে দিয়ে,  
প্রেমকে সস্তা দামে কিনে, পিতৃত্বকে সস্তা দামে কেনার জন্ত মাতৃত্বকে সস্তা  
দামে কেনার কারণ বুঝিয়ে জগতে একটা ওলটপালট ঘটিয়ে দেবার আগ্রহ  
ঝিমিয়ে দেবার বিরামহীন চেষ্টা চলেছে।

সমস্ত সস্তা হিসাব বরবাদ করতে চেয়ে আর সেটা কাজে পরিণত করতে  
গিয়ে কুমার দেখল কুলান যায় না।

তার সাধ্য নেই।

কারণ, জগৎটা উর্গে দেবার প্রয়োজন তার একার নয় বলে সে অন্ত  
অনেকের সাথে হাতে হাত মিলিয়েই সেটা করা সম্ভব বলে মেনেছে।  
নিজের এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

নন্দিতাকে পাওয়া অসম্ভব বলেই কি অগত্যা তাকে হিসাব করতে হয়  
পৃথিবীর মাহুষের এগোবার পথ?

নন্দিতাও কি জেনে গিয়েছে যে কাব্য-উপন্যাসে যত ফেনিয়ে লেখা হয়েছে  
তার চেয়ে হাজার গুণ জোরালো ভালবাসা হলেও সে ভালবাসাকে অবাস্তব  
অর্থহীন স্বপ্ন বলে অস্বীকার করা ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই?

জগত যদি অন্ত রকম হত, অন্ত সব মানুষের সঙ্গে তাদের দু'জনেরও থাকত নিজের নিজের জীবনকে রূপ দেবার স্বাধীনতা—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াত অন্তরকম ।

শুধু ব্যাপার নয়, তাদের চেতনাও হত অন্তরকম । ভালবাসার মানে পর্যন্ত বৃথত অন্তভাবে !

আজকাল প্রায়ই মাঝরাতে কুমারের ঘুম ভেঙ্গে যায়, অনেক চেঁচাতেও আর ঘুম আসে না ।

মনে হয়, ভোঁতা মাথা—বোকা হাবা মানুষ । ব্যাপার বোকা তার পক্ষে অসম্ভব । ভোরবেলা থেকে এত খেটেখুটে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমালো, মাঝরাত্রে শেষ হয়ে গেল ঘুমের পালা ।

রোগ নেই কিছু নেই—কেন সে অঘোরে ঘুমোতে পারে না সারারাত ? কেন তাকে নীরস শুকনো নীতি আর তস্ককথার বই পড়ে রাত ভোর করতে হয়, রাতজাগা শ্রান্তিতে অবসন্ন দেহ নিয়ে গুরু করতে হয় সারাদিনের খাটুনি ?

মা বোনেদের একটা সাধারণ হিসাব নিকাশ আছে যার মোট কথাটা এই যে—রোজগেয়ে ঘোষান ছেলে, পয়সা কামিয়ে মা বোনকে পুষছে, বৌ ঘরে না এলে কি রাত জাগা বোগ ঘুচবে ?

বৌ ?

নাঃ, পাশে একজনকে চেয়ে তো ঘুম ভাঙ্গে না তার, কোন মানুষের অভাব তো মোটেই সে বোধ করে না ।

কোন কোন দিন মনে হয় যে নন্দিতার সঙ্গ পেলে মন্দ হত না, আলাপ আলোচনা হাসি তামাসায় ঘুম আবার এলে আসত, না এলেও বিশেষ কিছু আসিত যেত না ।

এমনি কোন কোন নিত্ৰাহীন রাজির শেষে সে সোজা গিয়ে হাজির হত নন্দিতাদের বাড়ি ।

দরজা খুলত নন্দিতা নিজে ।

প্রথমেই চোখে পড়ত বাইরের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে নন্দিতার শুশ্রূষা  
অশোক আর নতুন ভাড়াটে ভূদেবের ঘোয়ান ছেলে ভবেশ । তারপর ভিত  
গিয়ে টের পেত যে রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে আকাশ ঘন  
ভোরের আলোয় সাক্ষ্য হয়ে আসছে তখনও কেবল নন্দিতা আর হাঁপারি  
রোগী ভূদেব ছাড়া সমস্ত বাড়িটা অঘোরে ঘুমিয়ে আছে !

তার কিন্তু হিংসা হত না ।

সারাদিন এত খেটেও ঘুমের জন্ত অর্ধেক রাত্রি ছটফট করতে হত, মা  
মাঝে বড়ি খেতে হত, তবু হিংসা হত না ।

তার শুধু শঙ্কা জাগত যে মাথাটাই হয় তো তার একদিন খারাপ হয়ে যাবে  
মস্ত একটা ইলেকট্রিক ষ্টোভ ধরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে নন্দিতা তাতে  
দিত গরম চা আর মচমচে আলুভাজা অথবা মামলেট ।

এই রকম চাট দিবে ভোর রাত্রে চা খেতে খেতে কুমার অল্পভব করত  
বাড়িটা তার চারিদিকে জাগছে ।

এতক্ষণ ধীরে ধীরে জাগছিল, এবার তাড়াতাড়ি জাগছে ।

কিন্তু নন্দিতার সঙ্গে যতক্ষণ সে কথা বলত কাপটা হাতে ধরে রেখে কোঁ  
উকিও দিত না ।

কাছে ও দূরে কলকারখানায় এলোমেলো ভেঁা বাজার খানিক গলে,  
আবির্ভাব ঘটত ভূদেবের ।

বাইরে থেকে প্রায় আদেশের সুরে জিজ্ঞাসা করত, বাড়তি চা আয়ে  
নাকি রে ?

কুমার বলত, আসুন না, তৈরী না থাকে, তৈরী করে দেবে । এত  
বহন না ?

ভূদেব ঘরে এসে বসলে সে ভূমিকা না করেই শুরু করে দিত—  
কাল যে বলছিলেন, আপনারা যেভাবে করে এসেছেন ওভাবেই

শুধু দেশের আর দেশের জন্ত কিছু করা যায়—কথাটা আমি মানতে পারিনি কিন্তু।

নন্দিতা আগেই কেটলিতে জল ভরে ঠোঙে চড়িয়ে দিত, নিজের জন্ত গরিয়ে রাখা আলুভাজা আর মামলেটের টুকরাগুলি ভূদেবের জন্ত প্লেটে লাজিয়ে ফেলত।

ভূদেবের জীর্ণ শীর্ণ চেহারা! প্রথম রাতে যেটুকু ঘুম হয়, তারপর আর ঘুম আসে না, হাঁপানির টান না উঠলেও আসে না।

সে বলত, নাই বা মানতে পারলে? আমি তো তোমাব কাছে আশ্বাস করিনি যে আমার কথা মানতেই হবে।

: আপনার যুক্তি ভুল। কোন লজিক নেই। দেশসেবকেরা নিজেরাই ঠিক করবে কি ভাবে দেশেব ভাল করা যায়—এটা হতেই পারে না!

নন্দিতা বলত, বসতে না বসতে আবস্ত হয়ে গেল?

ভূদেব বলত, আমি আরম্ভ করিনি কিন্তু! আমরা সেকেলে মাহুয়, তর্কযুক্ত ভাল লাগলেও আগে জাঁকিয়ে বসে খানিকক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ করতাম, খানিকক্ষণ কথার পায়তাদা কষতাম—

কুমার বলত, সেদিন কি আর আছে? কত সময় ছিল আপনাদের। নানা বিষয়ে আলাপ জমিয়ে কথার পায়তাদা কষতে গেলে তর্ক পর্যন্ত কোনদিন পৌছনো যাবে না, আমাদের আগেই কেটে পড়তে হবে।

ভূদেব বলত, এই কথাই বলছিলাম সেদিন। সময় নেই, ধৈর্য নেই, চিন্তা করার সময় নেই, এরকম ব্যস্তবাগীশ মাহুয়দের সাধ্য আছে না অধিকার আছে যে বলবে—এইভাবে দেশের উন্নতি হবে? সব ত্যাগ করে যারা দেশসেবার কাজটাই জীবনের একমাত্র ব্রত করেছে—তারাই পথের সন্ধান বলতে পারে।

কুমার বলত, এসব সেকেলে নেতাদের আজগুবি কথা। আমরা যেটুকু বুঝছি আর করেছি, করেছি আপোষে—সুবিধা পেয়ে। মাথা খাটাতে

ওস্তাদ হয়েছি, ফাঁকা সন্মান আর কিছু নগদ দামে মাথার কাজ আপোষে বিক্রি করেছি বলেই আমরা সুবিধা পেয়েছি, আরামে থেকেছি। আমরাও ওই পয়সারই জন্তাই মাথা খাটাই।

ভূদেব চটে বলে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই বলছ আমরা পয়সার জন্ত মাথা খাটাই। কত পয়সা আছে আমাদের? এই কুসংস্কার ভরা অন্ধকার দেশে আমরাই আলো জ্বেলে রেখেছি। একটু আলোর জন্ত আমরাই জীবন দিয়েছি। পয়সাওলা লোকের ছাঁচরামির নিন্দা আমরাই করতে পারি। আমরা বিপ্লব করি নি? সব কিছু আপোষে করেছি? বেশ তো, আপোষ কি সব অবস্থাতেই খারাপ? আপোষের প্রয়োজন হয় না? একেবারে কিছু না করার চেয়ে আপোষে কিছু করা ভাল নয়? তুমি নিজেও তো ওই রকম রাস্তাই খুঁজছ! নিজের কোয়ালিফিকেশন সার্থক করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে ভালরকম রোজগার করে সুখী হবে।

কুমার বলে, নিশ্চয়, আমার এই কথাটাই তো আপনারা বুঝতে পারছেন না। নিজেকে আমি ফাঁকি দেব না, এটাই আসল কথা। আমি আমার নিজের ধাত জানি। শুধু বিত্তা আর পয়সা ঘেঁটে আমার প্রাণ ভরবে না, সাধারণ মানুষের জন্তও আমাকে কিছু করতে হবে। আবার সাধারণ মানুষের খাতিরে জীবনপাত করার সাধও আমার নেই। নিজেকে আমি তাই শুধু মানুষ ভাবি, আপনার মত সেরা মানুষ, মহাপুরুষ ভাবি না। ওটা ধাপ্পাবাজি।

এবার নন্দিতাও চটে বলে, সামলে কথা কও না কুমার? বাপের বয়সী মানুষকে এসব বলা উচিত নয়।

কুমার বলে, তা হলে চুপচাপ থাকাই ভাল। ব্যক্তিগতভাবে আমি তো শুঁকে খোঁচা দিই নি। আমাদের মধ্যে এ রকম কিছু ধাপ্পাবাজ আছে, তাদের কথা বলেছি।

ভূদেব বলে, আমি তো তাদেরি একজন?

কুমার বলে, রাগ করলে কি করব বলুন? আপনার কথা মেনেই নিলাম

মি। দেশের কোটি কোটি মানুষকে পিছনে অন্ধকারে ঠেলে রাখা হয়েছিল, অবস্থায় যেটুকু করার আমরাই করেছিলাম বৈকি ? তার অনেক দাম আছে শস্য ! কিন্তু ওই কোটি কোটি মানুষকে বাদ দিয়ে আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি যদি বলতে চান—

: একজন মহাপুরুষ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে না ?

: কোটি কোটি মানুষকে বাদ দিয়ে ?

: এত বড় কথা নাইবা বলো ? আমরা সাংসারিক কথা বলছি।

: বড় বড় কথার ব্যাপারে বড় বড় কথা না বললে চলে ? সামঞ্জস্য রাখতে হবে তো !

নন্দিতা খিল খিল করে হেসে উঠত। বলত, ও ! সামঞ্জস্য রাখার জন্য আমার বড় বড় কথা বলা ! কথা বলার জন্য কথা বলা ! তাহলে আর তর্ক কিসের ? আরেকটু লিকার আছে, আধ কাপ করে দিচ্ছি, খেতে খেতে দু'জনে এবার আপোষে কথা বল। বেশী গরম করে দিচ্ছি—তাড়াতাড়ি খেতে পারবে না।

কুমারের কথা শুনতে শুনতে নন্দিতার কখনো মজা লাগত, কখনো রাগ হত, কখনো সাধ জাগত সোজাঝুজি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

তবু তাকে বিদায় দিতে গলির মোড় পর্যন্ত গিয়ে সে বলত, তুমি আর এভাবে তর্ক কোরো না বুড়ো মানুষটার সঙ্গে।

কুমার বলত, সোজা কথা বুঝতে পার না কেন ? এরকম তর্কই উনি চান—ভালবাসেন। তুমি চটেছ, উনি খুশী হয়েছেন। কাল ভোরে এলে দেখবে, আবার এসে তর্ক জুড়বেন ! যাই হোক, আমার নিজের কয়েকটা কথা আছে, শুনবে তো ?

: শুনব।

কুমার কৃতার্থ হবার ভাব দেখিয়ে বলত, তা হলে আমার সঙ্গে চলো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।



: কাপড় বদলে আসি ?

: এসো ।

রাস্তার ধারে কুমার দাঁড়িয়ে থাকত । একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত । কাছেই কোথাও সমাজ-সংসার সব ভুলে গিয়ে লাউড স্পীকার গাঁ গাঁ আওয়াজে বাজতে শুরু করেছে—যে বাজনায়ে প্রাণের কোন সাড়া নেই ।

এরকম গর্জন করা সুর বাজানো শুনলে যেন মানুষের রোগ শোক দুঃখ বেদনা প্রাণের জ্বালা সব সেরে যাবে । পূজা পার্বনের দিন নয়, সম্ভবত কোন বিয়ে বাড়ির উৎসবকে জীবন্ত করে তুলতে এমন প্রচণ্ড সুর ছড়ানো হচ্ছে ।

নন্দিতা খুব তাড়াতাড়িই কাপড় বদলে চলে আসত ।

হঠাৎ দরদ দেখাত স্মিত্রার জন্ত ।

চলতে চলতে বলত, স্মিত্রাকে কোন সরকারী চাকরের ছেলের সঙ্গে কিছা কোন লেখক গায়ক ছবি-আঁকা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিও ।

: ওর বিয়ে দেওয়া যাবে না ।

: কেন ?

: আমি বিয়ে না করলে স্মিত্রা বিয়ে করবে না ।

: ওকে বলো নি যে বিয়ে করা না করা ও ইচ্ছার ব্যাপার নয়, তোমার ইচ্ছা—হয় রোজগার করুক, নয় বিয়ে হোক, খুশুরবাড়ি গিয়ে স্বামীর রোজগার থাক, তুমি আর ওকে পুষতে পারবে না ? ওকে কারো বো করে বিদেশ করতে না পারলে তুমি নিজে কাউকে বো করে ঘরে আনতে পারবে না ?

: ওসব কায়দা অনেক আগেই খাটিয়েছি । ফল হয় না । স্মিত্রা কি বলে জানো ?—আমায় তাড়ালে তবে তোমার বৌ-পোষার ক্ষমতা হবে।? এমন বৌ দিয়ে করবে কি ?

নন্দিতা আস্তে আস্তে হাঁটত । এভাবে শাড়ীর একটা আঁচল কোমরে এঁটে আরেকটা দিক গায়ে জড়িয়ে ঘরে ঢলাফেরা করাই তার অভ্যাস নয়, শাড়ীটা খুব দামী আর আধুনিক হলেও সেকেলে গিল্লী-বারিদের মত সহজ-

ভাবে শুধু গায়ে জড়িয়ে পথ চলতে তার বিজী লাগে, থেকে থেকে গায়ে বেন কাঁটা দেয়। আঁচলটা বার বার এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে চালাচালি করে।

সুমিত্রা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, এত চেষ্টা করেও কিছু সুবিধা হল না? কিছু না হলে তো ডুবে যাবে।

সমরেশ শুধু বলে, ডুবে যেতে বাকী নেই, এখন শুধু উঠবার চেষ্টা।

: একটা চাকরী নিলেও তো পার?

: এতকাল ধরে এত কষ্ট করে যেমন তেমন একটা চাকরী তো নেওয়া যায় না। কোন লাভ নেই ওরকম চাকরী নিয়ে।

কুমার মাঝে মাঝে আসে। নিজের স্বাস্থ্য খরচ করে এতগুলি পরীক্ষা পাস করে তাকে একটা মাস্টারি নিতে হয়েছে। পঁচাত্তর টাকা বেতনে একটা কেরানীগিরি মত মাস্টারি। ওই চাকরি থেকেও আবার তাকে বিদায় করার আয়োজন চলছিল।

টুইশনের হিসাব ধরলে আরও কয়েকটা টাকা—কিন্তু তার মাসিক ব্যয় দেড়শো টাকার মত।

ওই চাকরীটা চোখ কান বুজে না নিয়ে শংসার চালাবার উপায় ছিল না কুমারের!

স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে।

অথচ দরকার মত টাকার ব্যবস্থা হয় নি।

ছুটির দিনেও কুমারকে স্তার নিজের ছাত্র পড়াতে বেরিয়ে পড়তে হয়।

আত্মীয়তা বন্ধুত্বের জোর খাটিয়ে চাকরী যারা দিতে পারে তাদের বাড়িতেও কুমারকে হাঁটাহাঁটি করতে হয়—যদি ভাল কিছু জুটে যায় এই আশায়।

সবদিন এসে সুমিত্রা সমরেশের নাগাল পায় না।

প্রীতি কেমন করে টের পায় কে জানে যে সুমিত্রা এসেছে। নিজের কাছে ডেকে পাঠায়।

হাসিমুখে আদর করে বসতে দিয়ে বলে, তোমরাই সত্যি-কারের সত্যযুগের সতী মেয়ে এ কলিযুগে।

: কী বলছেন শ্রীতিদি ? আমরা একালের মেয়েরা তো মানিই না ওসব সতীত্বপনা !

: মানো না ? বটে ? বসো না। জল ফুটেছে—চা করে আনাই। কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনেই জানালা দিয়ে তোমায় দেখে কেটলি চাপিয়ে-ছিলাম। জানি তো সমু বাড়ি নেই। একটু বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করে মুখ শুকনো করে ফিরে যাবে ? এক কাপ চা খাইয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলব না, তোমাকে !

শ্রীতি তাকে ডাকলে অন্ত কেউ কাছে আসে না। আড়াল থেকে তফাৎ থেকে তাদের কথা শোনে।

সবাই তো জানে একেলে মেঘের পুরুবাঁলি চালচলন নিয়ে বিব্রত হবার পক্ষে শ্রীতির একবিন্দু সহানুভূতি নেই। স্মিত্রাকে সে কি কথাটা বুঝিয়ে দিতে চায় তাও সকলের জানা—সমরেশকে জয় করার এবং বশ করার জন্য স্মিত্রা যে কোন উপায় অবলম্বন করুক, সেটা মোটেই দোষের হবে না।

নানা ঝন্ঝাটে মনটা বিগড়ে আছে সমরেশের, তার তেমন উৎসাহ না দেখা যাক—স্মিত্রার উচিত তাদের মিলন যাতে তাড়াতাড়ি ঘটে, সেজন্য চেষ্টা করা, এরকম কুমারী বেশে মাঝে মাঝে না এসে সে যাতে একেবারে বৌ সেজে এ বাড়িতে বাস করতে পারে, সেজন্য তারই উঠে পড়ে লেগে যাওয়া দরকার।

ধমক দিলে তো শুনবে না বুঝবে না স্মিত্রা।

আদর করে তাই তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে পছন্দ করা ছেলেকে রেহাই না দিয়ে দখল করাই একেলে মেয়ের প্রধান কাজ, তাদের ওটাই সতীত্ব, নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ।

প্রগতি চা দিয়ে যায়—দাঁড়িয়ে এক মিনিট কথাও বলে যায়। সেও যেন

জানিয়ে দিতে চায় যে বৌদি হয়ে ধরে এলে তারা সবাই স্মৃতিজ্ঞাকে ভালবাসবে !

স্মৃতিজ্ঞা একটু চুপ করে থেকে বলে, যাক গে, আগে বিয়ে হোক, তারপর সতীত্ব আর নারীত্ব নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে ।

প্রীতি বলে, ওমা ! সতীত্ব বৃদ্ধি বিয়ের পর শুরু হয় ? সতী মেয়ে জন্ম থেকে সতী । ওটাই আসল সতীত্ব । ভবিষ্যৎ খণ্ডের শাণ্ডী নন্দদের মত নিয়ে, কারো সঙ্গে প্রেম করলে কি কোন মেয়ে অসতী হয় ? তবে বিয়ে শেষ পর্যন্ত হবেই এটা ঠিক থাকা দরকার ।

গরম চা স্মৃতিজ্ঞা খায়নি । ঠাণ্ডা চা এক চুমুকে খেয়ে সে কাপ প্লেট নামিয়ে রাখে ।

প্রীতি এমন পাগল হয়ে উঠল কেন তাদের মিলন ঘটাতে—সামাজিক মিমনের ব্যবস্থাটা পরে হলেও কিছুমাত্র আসবে যাবে না আশ্বাস দিয়ে ?

একি উদ্ভট উপদেশ প্রীতির !

মেয়েরা মেয়েলিপনার সীমা ছাড়িয়ে কোনদিন এক পা এগোবে না, চিরকালের এই নিয়মনীতি একেবারে উন্টে দেবার পরামর্শ দিচ্ছে প্রীতি !

আনমনা হয়ে স্মৃতিজ্ঞা খানিকক্ষণ কল্পনা করার চেষ্টা করে—উপদেশটা সে কিভাবে পালন করতে পারে এবং তার ফলাফল কি হওয়া সম্ভব ।

তাই সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, প্রীতিদি, স্বামীর সঙ্গে ক'মাস ঘর-কন্না করেছিলে তুমি ?

প্রীতি যেন ঝিমিয়ে গিয়ে বলে, আমার কথা বাদ দে ।

: কেন বাদ দেব তোমার কথা ? তুমি কি মাহুষ নও ?

প্রীতি রেগে বলে, অবস্থার হিসাবটাও ধরতে হয় জানিস তো ?

## বারো

জীবনের হিসাব তবে কি ?

কোন অর্থে তবে কষতে হবে জীবনের মূল্য ? কোন সুখ দুঃখ আরাম বিলাস আনন্দ বেদনার হিসাবে মাপা যাবে মানুষের জীবনের সার্থকতা এবং ব্যর্থতা ?

সমরেশ বুঝে গিয়েছে যে কেন বাঁচা না জেনে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।

এসব খুব গবম চিন্তা। জীবনের মানে বুঝবার চিন্তা ছাড়া কোন চিন্তাই বেশী নয়।

সমরেশের তাই মনে হয় কেবল চিন্তায় চিন্তায় যেন দগ্ধ হয়ে যাবে তার মন প্রাণ।

পুরুষ মানুষ। বয়স বেড়ে চলেছে দিনে পর দিন। আজ পর্যন্ত টের পেল না শান্ত নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের উপায় কি ?

কুমারের কেবল মা আর বোন নিয়ে কাববাব।

নন্দিতার সঙ্গে দেখাশোনা আলাপ আলোচনা করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে কোনদিন এমন উদ্ভট কথা সে কল্পনাও কবে নি। নন্দিতাকে কোনদিন নিজের একচেটিয়া দখলে পাবে, সাধ জাগলে প্রমাণ পাবে যে নন্দিতারও রক্ত মাংসের একটা দেহ আছে।

বোঝাপড়া হোক বা না হোক, কুমার আর নন্দিতার মধ্যে ভাব আছে এই ধারণা নন্দিতার তীব্র আকর্ষণকে আত্মীয়তাবোধের মায়ামমতায় পরিণত করেছিল।

ভারপন্ন হঠাৎ মামী বনে গিয়ে সে সব মানসিক হৃদয়ের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। তার আগ কোন মেয়ের পক্ষেই নন্দিতাকে ডিঙ্গিয়ে তার মন উকি দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু নন্দিতা মামী বনে যাবার পরও সে কোন কোন মেয়ের জন্ত আকর্ষণ অনুভব করে না ?

মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয় স্মৃতির সঙ্গে একটু ভাব করলে দোষ কি ! স্মৃতি যে অনেকদিন থেকেই ওরকম কিছু প্রত্যাশা করে আসছে তাও তার অজানা নয় !

কিন্তু প্রাণ যেন সাড়া দেয় না !

কারবারটা গেছে।

বড় একটা বাড়ি আছে বটে কিন্তু এতবড় বাড়ি আর এতগুলি পোশ্যই যেন তাড়াতাড়ি এনে দিয়েছে অচল অবস্থা।

তবু আজও সমবেশ অবশ্য ধারণাও করতে পারে না যে তার নিজের প্রাণের দাম কতটুকু।

সেও তো একটা ব্যক্তি। তারও তো ব্যক্তিগত হিসাব আছে জীবনের দাম কষাকষির। কিন্তু সে এখনো বোঝেনি যে এতদিন ছুঁচর জনের কাছে ছাড়া তার প্রাণের দামটা ছিল বিরাট ব্যবসা আর অনেক পয়সা থাকার জের-টানা দাম।

টাকাই বাদের ধর্ম এবং কর্ম, খেটে রোজগার করা টাকা নয়, মানুষের রক্ত শোষণ করা টাকা—সে সব মানুষ তুচ্ছ হয়ে গেছে।

ওরা তার মরা বাঁচা তুচ্ছ করেই চলবে।

হঠাৎ সে দোতলাটা ভাড়া দিয়ে দেয় রমণীমোহন নামে একজন মোটা পেনসন-ভোগী ভদ্রলোককে—তারও মস্ত বড় পরিবার।

প্রত্যেক মাসে ঠিক তারিখে নিয়মিত ভাড়া দেয়।

নিজেই আসে।

টাকা শুধে দিতে দিতে আপশোষ করে বলে, বাড়ি একটা করতাম এতবড় না হলেও ছোটখাট একটা বাড়ি তোলায় মত পরসী কি আর করিনি এতকাল চাকরী করে ? তুমি ছেলেমানুষ, তুমি ঠিক বুঝবে না—ছেলেমেয়ে কটার জন্ত বাড়ি করতে সাহস পাই না। মারামারি কাটাকাটি করবে বৈ তো নয়। তার চেয়ে মরার আগে নগদ টাকা ভাগ কবে দিয়ে যাব—যে যার পথ দেখবে।

দোতলা বাড়িতে যে মানুষগুলি ভিড় করে ছিল তারা গাদাগাদি করে সম্বল করেছে শুধু একতলাটা। দম যেন আটকে আসতে চায় সকলের।

নিজেব ঘরটিও ছেড়ে দিতে হযেছে সমরেশকে। খাট আর চেয়ার টেবিলটা রাখার ঠাইটুকু শুধু জুটেছে—টেবিল চেয়ার সরে গেছে কোণের দিকে ঠেলে দেওয়া খাটের মাথার কাছে।

একান্তে প্রাণথুলে দুটো কথা বলার সুযোগ নেই, স্মিত্রা তবু আজকাল ঘন ঘন আসা যাওয়া শুরু করেছে।

সমরেশ যখন বাড়ি থাকবে জানা কথা তখনই অবশ্য সে আসে—সমরেশের সঙ্গেই সে বেশীর ভাগ কথাবার্তা চালায়।

সমরেশ খাটে বসলে সে বসে খাটের এ মাথায় সরানো অনেক দামী পুরানো ভাঙ্গা চেয়ারটায়, সমরেশ ওই চেয়ারে বসে থাকলে সে বসে ভিতরের মালমশলা খসতে শুরু-করা সেকলে মোটা গদির বিছানায়।

স্মিত্রা আসে, সকলের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করে সমরেশের সঙ্গে আলাপ চালায়—সেজন্ত বাড়ির মানুষেরা বিরক্ত বা ভীত হয় না।

তারা বরং চায় যে স্মিত্রা এসে যত খুসী আরও বেশী ভাব জমাক সমরেশের সঙ্গে।

বাড়াবাড়ি করলে সমরেশ চটে যাবে, নইলে বাড়ির সকলে হয় তো খোলা ছাদে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের নির্জনে মেলামেশার সুযোগ করে দিত।

স্মিত্রাকেই বিয়ে করুক সমরেশ !

সকলের ধারণা জন্মেছে যে বিয়ে করে সংসারী হলে তার ছেলেকাজি ভাব কেটে যাবে, দায়িত্বজ্ঞান জন্মাবে, একটা কোন কারবার আবার খাড়া করতে পারবে বাপ দাদার পথ অনুসরণ করে।

নন্দিতা যে কেন প্রায়ই সময়ের সঙ্গে গল্প করতে আসে !

মামী হয়েছে, আর ভাবনা নেই।

কিন্তু সে আসে যায় বলেই হয়তো সময়ের মনটা জুড়িয়ার দিকে যাচ্ছে না।

কে বলতে পারে !

নন্দিতার সমাদর কমে গেছে। সকলের ব্যবহারে তুচ্ছ করার ভাবটাই স্পষ্ট। কিন্তু নন্দিতা যেন গ্রাহ্যও করে না।

সেদিন সন্ধ্যায় নন্দিতার বিষম মাথা ধরেছিল।

মাথা ধরা কি কে জানে। শূলবেদনা পেটে হয়, দাঁতে হয়—মস্তিষ্কেও হয় সময়ের জানা ছিল না।

নন্দিতা এসে খাটে বসে। বিরস মুখে জিজ্ঞাসা করে, আমার শরীর এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন বলতে পার ?

: আমি কি ডাক্তার ? ডাক্তারকে দিয়ে শরীরটা পরীক্ষা করালেই জবাবটা বেরিয়ে আসবে।

: আসবে কি ? কারণটা শরীরে না মনে সেটাই যে বুঝতে পারছি না। কোন ডাক্তার দেখাব—শরীরের ডাক্তার না মনের ডাক্তার ?

: কুমার কি বলে ?

: কুমার বলে মনের ডাক্তারকে দেখাতে। মনের ডাক্তার মানেই নাকি শরীর প্রাস মনের ডাক্তার—শরীরের ডাক্তার না হয়ে নাকি কেউ মনের ডাক্তার হতে পারে না। মনটাও নাকি আমাদের শরীরেরই একটা বিশেষ অঙ্গ।

: এক হিসাবে তাই বৈকি। শরীরে ওষুধ দিয়ে মনটাকে কণ্ট্রোল করা



যায়। এটা অবস্থা সোজা সাধারণ হিসাব—গোড়ার হিসাব। খেলে আর নিখাস নিলে প্রাণী বাঁচে ওই ধরনের হিসাব। এটা ধরে নিজেও মনকে পৃথক করে ধরে বিজ্ঞানের একটা বড় শাখা গড়ে উঠেছে। শরীরের ওপর মনের কর্তৃত্ব কম নয়। বেদনা পেলাম মনে, চোখ টাটিয়ে জল ঝরতে লাগল।

: দেহ আর মন পৃথক নয় বলছ ?

: মোটেই পৃথক নয়।

: প্রেম দেহগত না মনগত ?

: দু'য়ে মিলে। দেহ দিয়ে প্রেম হয় না, সেটা পাগলের উদ্ভট কল্পনা। শুধু মন দিয়েও প্রেম হয় না—মানসিক ছ্যাবলামি। প্রেম হল দেহমন মিলে মিশে দৈহিক আর ওই দেহগত মনটার মামসিক যোগ বিয়োগ সৃষ্টি করা। জীবন জটিল হলে এ ক্রিয়াটাও জটিল হয়।

প্রণতি চা এনে দিয়েছিল। মুখ বাঁকিয়েছিল নন্দিতা।

কাপ-ভরা চা যেমন ছিল তেমনি পড়ে থাকে, নন্দিতা কয়েকবার ওঠে বসে, জানালায় দাঁড়িয়ে এমনভাবে চুল খোলে যেন এই কাজটা করতে সে এ বাড়িতে এসেছিল।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, আমার মন যদি দেহ মনের ওই সম্পর্কের নিয়মটা মানতে না চায় ? আমার মন যদি বলে যে জগৎ সংসার চুলোয় যাক—

সমরেশ বলে, আর বেঁধে ফেনিও না। বাড়ির প্রত্যেকে আমাদের কথা শুনছে। হলেই বা মনে প্রাণে একেলে, বেড়া ভাঙ্গার সাধ্য আছে ? দেখলে তো, বুঝলে তো, নিজের মনটা নিজের শক্তি দিয়ে বশে আনতে পারছ না বলেই পাগলিনীর মত ছুটোছুটি করছ ?

নন্দিতাকে শূল বেদনার রোগিনীর মতই সর্বদা মুচড়ে মুচড়ে পাক খেতে দেখে আর অসহ্য যাতনায় কাতরাতে শুনে সমরেশ যথারীতি দুঃখিত হয়। ভাবে যে আগে তো এই উপসর্গ তার ছিল না ! কী এই রোগ যা পিষে পিটিয়ে ককিয়ে কাঁদিয়ে প্রায় শেষ করে দিয়ে যায় ?

বিকাল পাঁচটা।

দোস্তলা বাড়িটার ছুটো তলাই বাড়ির মাছঘের ভিড়ে গম গম করছে।

পশ্চিমের জানালা দিয়ে এক বলক রোদ ঘরে এসেছে চারতলা বাড়িটার পাশ কাটিয়ে।

খাটের পাশের চেয়ারটাতে সমরেশ বসামাত্র খাটের বিছানা থেকে ছিটকে গিয়ে নন্দিতা তার কোলে মাথা গুঁজে মেঝেতে বসে পড়ে।

অর্তস্বরে বলে, মাথাটা কেটে ফেলো, শীগগির মাথাটা কেটে ফেলো আমার। মরে গেলাম, সত্যি আমি মবে গেলাম।

সমরেশ তার মাথায় হাত রেখে চুপ করে বসে থাকে। ডাক্তার ডাকার কথা সে উচ্চারণও করে না।

ইচ্ছা করলেই নন্দিতা বড় বড় ডাক্তারকে দিয়ে নিজের চিকিৎসা করাতে পারে।

স্মিত্রা কয়েকবার এসে ঘুরে যায়, সমরেশের দেখা পায় না।

তাকে এড়িয়ে চলার জন্ত সে বাড়িতে থাকার সময়টা নিশ্চয় বদলে ফেলেনি! কাজের চাপেই নিশ্চয় তাকে বদলে দিতে হয়েছে ঘরে বাইরে কাজ ও বিশ্রাম করার সময়-তালিকা।

কিন্তু তাকে না জানিয়ে কেন?

সমরেশ কি জানে না যে সে প্রাণে কামনা করে, তার একটা গতি হোক? ছ'এক বছর দেখা না হলেও সে ক্ষুধা হবে না?

প্রীতি যাই বলুক, স্মিত্রা বুঝতে পারে, গায়ে পড়ে ব্যাপার বুঝতে গিয়ে কোন লাভ নেই। ছ'দিন দেখা না হলে যে ব্যাকুল হয়ে হয়ে ছুটে আসত, হঠাৎ সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে তাকে এড়িয়ে চলতে।

শুকনো নীরস জীবন।

শুধু দায় আর খাটুনি।

সমরেশের আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসভরা ভালবাসা তাই কি সে এমন অন্ধ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মেনে নিয়েছিল ?

বিচার বিবেচনা না করেই ?

নির্মম হৃদয়হীন জগতে ব্যর্থতার অভিশাপ মাথায় নিয়ে দায় শালনের জীবন-পাত লড়াই চালাতে চালাতে তৃষ্ণায় এমনি কাঠ হয়ে গিয়েছিল তার বুক যে স্তমিত্রার স্বতন্ত্র হৃদয়ে ছেলেমানুষী হৃদয়াবেগ গোড়ার দিকে হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত প্রায় কাতরভাবে গ্রহণ করেছিল ?

তারও তবে আবেগ আছে, চোখকান বুজে ভাবের মানস তরীতে ভেসে যাবার ঝাঁক আছে !

দেখা একদিন হবে এটা জানাই ছিল ।

এতদিন ধরে এমন ভালবাসার খেলা চালিয়ে যাওয়ার পর একই সহরের এ পাড়ায় ও পাড়ায় হু'জনে তারা জীবন কাটাবে চিরকালের জন্ত মুখ দেখাদেখি এড়িয়ে গিয়ে !

তাও কি সম্ভব ?

আত্মীয় বন্ধুর মারফতেই কত যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছে হুজনের মধ্যে ! অস্ত্র অস্ত্র সব যেমন ছিল তেমনি থাকবে, শুধু তাদের সম্পর্কের এইসব সূত্রগুলি রাতারাতি ছিঁড়ে যাবে !

তাই হঠাৎ একদিন প্রীতি এসে একটা বাজে অছিলায় তাকে রাখে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলে সে আশ্চর্য হয় না । শুধু ভাবে, প্রীতির এত মাথা ব্যথা কেন তার জন্ত ?

অথবা এ দরদ সমরেশের জন্ত ?

প্রীতি কি সত্যই বিশ্বাস করে যে সমরেশ তার দিকে ছাড়া আর কোন মেয়ের দিকেই তাকাবে না ?

প্রীতি বলে, একটু দেরী করেই যেও । সমুদ্র কিরতে রাত হয় ।

সুমিত্রা বলে, কেন, আগে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে গল্প করলে চলবে না বুঝি ?

: কত তোমার গল্প করার সময়! একবার গিয়ে উকি মেয়ে আসার সময়ও তো পাও না।

কুমারের খবর সে জিজ্ঞাসা করে বিদায় নেবার খানিক আগে।

: কুমার কেমন আছে?

: ওইরকম—থারাপের দিকে যাচ্ছে না এইটুকু। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল। কারো কোন কথা শোনে না, আমরা করব কি।

প্রীতি সায় দিয়ে বলে, পুরুষ মানুষ, একা সব দায় বইছে, নিজের কথা ভাবতে পারছে না। নিজে তোমাদের চেষ্টা করে ওর বোঝা হালকা করে দিতে হবে। সেরে যাবে—ভয় নেই।

আটটার সময় সমরেশদের বাড়ি পৌঁছে স্মিত্রা শোনে তাকে রাত্রে খেতে বলা হয়েছে এ খবর না জেনেই সমরেশ বেরিয়ে গিয়েছে।

: দিদির কি রকম ভুলো মন ছাথো; সারাদিন কিছু বলেনি, বিকালে হঠাৎ বলে কিনা, আরে, স্মিত্রাকে তো রাত্রে খেতে বলেছি! আমরা শুনে অবাক!

স্মিত্রা ভাবে, সমরেশের সম্পর্কে এমন সংশয় জেগেছে প্রীতির মনে! সে রাত্রে খেতে আসবে জানা থাকলে পাছে সমরেশ কোন ছুতোয় তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে এই আশঙ্কায় খবরটা প্রীতি বাড়ির লোকের কাছে বিকাল পর্যন্ত চেপে গেছে!

ব্যাপার তবে সত্যই গুরুতর? তাব সঙ্গে বোঝাপড়া এড়িয়ে চললেও প্রীতির সঙ্গে নিশ্চয় এ বিষয়ে কথা হয়েছে সমরেশের এবং ভেবে চিন্তে এইভাবে তাদের মুখোমুখি এনে দেবার উপায় সে ঠিক করেছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্মিত্রা বোধ করে না।

তার মনে হয়, তাদের দেখা করিয়ে দেবার জন্য প্রীতি এরকম ব্যস্ত হয়ে না উঠলেই বরং ভাল ছিল। প্রীতির কি একবার খেয়ালও হল না যে হয় তো তাদের শুধু কলহ বা নিছক ভুল বোঝার ব্যাপার নয়! দুজনকে এভাবে

মুখোমুখি এনে দিলে বোঝাপড়া হওয়ার বদলে ভেজেনে যেতে পারে তাদের সম্পর্ক !

দশটার কিছু আগেই সমরেশ বাড়ি ফেরে।

সুমিত্রাকে এত রাতে এ বাড়িতে দেখে তার মধ্যে বিশেষ কোন ভাবান্তর ঘটেছে কিনা টের পাওয়া যায় না। একটু বিস্ময়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই সে জিজ্ঞাসা করে, এত রাতে তুমি এখানে ?

সুমিত্রা বলে, নেমস্তন্ন খেতে এসেছি।

: নেমস্তন্ন ?

প্রীতি বলে, আমি ওকে খেতে বলেছিলাম।

: ও !

সমরেশের শীর্ণ গভীর শ্রান্তির ছাপ দেখে সুমিত্রা বড়ই মমতা আর উদ্বেগ বোধ করে।

আরও যেন রোগী হয়ে গেছে সমরেশ।

যাই ঘটে থাক তার হৃদয় মনে, যে কারণেই সে হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা শুরু করে থাক, সুমিত্রার এতটুকু রাগ বা অভিমান কখনো জাগে নি। আজও মমতার সঙ্গে তার মনে হয় যে বেচারাকে বিব্রত না করলেই ভাল হত !

না জানি কি তোলপাড় চলেছে সমরেশের মধ্যে !

রাত্রি হয়ে গেছে বলেই সুমিত্রাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না, রাত হয়েছে বলে একা একা বাড়ি ফিরতে তার অসুবিধা অথবা ভয় হবার প্রশ্নই ওঠে না।

কথা তাদের সমরেশের ঘরে বসেও হতে পারত। প্রীতি উদ্যোগী হয়ে সে সুযোগও সৃষ্টি করে দেয়। কিন্তু সুমিত্রা কি না ঠিক করেছিল যে সমরেশকে বিব্রত করবে না, চাপ দিয়ে তার কাছ থেকে তার অদ্ভুত ব্যবহারের কৈফিয়ৎ আদায় করবে না, ছ'চার মিনিট কথা বলে সে তাই উঠে পড়ে।

: না, রাত হয়েছে, এবার পালাই।

সমরেশ একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলে, যাবে? চলো তোমায় খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুমিত্রা টের পায়, হঠাৎ সে মন স্থির করেছে।

তার রহস্যময় রূপান্তরের কারণ আজকেই সে তাকে সব খুলে বলবে।

সুমিত্রা বলে, চাও তো আরও খানিকক্ষণ বসতেও পারি। এত রাতে বাড়ি ফিরে আবার—

: তা হোক, কথা বলতে বলতে এগোই চল।

প্রীতিকে খুসী করে তারা বার হয়, পথে নেমে সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যেতে কষ্ট হবে?

: আমার কষ্ট হবে? খুব মিষ্টি ভদ্রতা শিখেছ তো আজকাল! নিজের কষ্ট হবে কি না তাই বলো!

সুমিত্রা গম্ভীর হয়ে গভীর আপশোষের সঙ্গে যোগ দেয়, দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি চেহারাই যে করছ দিন দিন! অসুখ বিসুখ হয়নি তো? তুমিও লুকোচ্ছ না তো?

: না, অসুখ হয়নি।

: হতে কতক্ষণ? রোগ তো ওৎ পেতেই আছে। দাদা কি ভাবতে পেরেছিল এমন একটা বিষম রোগ ধরবে? তুমি কিন্তু সাবধান! তোমার মত রোগা দুর্বল মানুষকেই কিন্তু সহজে কাবু করে।

: আমাদের বংশে কারো কখনো ছিল না।

: এটা কি বংশগত রোগ নাকি? এত লেখাপড়া শিখে তোমরাও যদি—

: একটা ধাত থাকে!

: বংশগত ধাত? কি যে বলে! ধাত যদি বলতে চাও তো বলো অগুটির ধাত, দুর্বলতার ধাত, বেশী খাটুনীর ধাত।

সমরেশ চূপ করে হাঁটে।

সুমিত্রা বলে, আমাদের বংশে কারো ছিল নাকি ? বাজে খেয়ে কম খেয়ে বেশী খেটে দাদাই খাত তৈরী করেছিল।

তার সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রসঙ্গ কিন্তু সমরেশ তোলে না, একেবারে অপ্রত্যাশিত কথা বলে।

জিজ্ঞাসা করে, একটা চাকরি করবে ?

সুমিত্রা আশ্চর্য হয়ে বলে, চাকরি ? পেলে তো একুশি করি। দাদার শরীরের জন্তু নিজেই পড়া ছেড়ে দিলাম—আমার এই বিজ্ঞা নিয়ে কি চাকরী হয় ?

সমরেশ বলে, আপিসের চাকরী নয়, বেশী বিজ্ঞা দরকার হবে না। একটি ছেলে আর মেয়ের গার্জেন টিচারির কাজ। সারাদিন থাকতে হবে কিন্তু—রাত্রে পড়িয়ে ছুটি পাবে। মাইনে চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ, পরে ঠিক করবে।

: নেব কাজ। কাদের বাড়ি ?

: আমরা বলি মিত্র সায়েব। বড় চাকরী করে।

সুমিত্রা জোড় দিয়ে বলে, বড় চাকরি করুক আর ছোট চাকরিই করুক আমার মাইনে আর ভাল ব্যবহার পেলেই হল !

কুমারের মার মনটা বিগড়ে যায়।

এত বড় মেয়ে। ভাইকে একটু রেহাই দিতে সে ভোর থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত পরের বাড়ি কাটায় ! উপকার করতে চেয়ে তাকে এমন আঘাত হানল সমরেশ।

খুব নীচু দিয়ে উড়ে যায় প্রকাণ্ড উড়োজাহাজটা। কী প্রচণ্ড আওয়াজ ! দিগন্ত যেন কাঁপছে।

কুমারের মার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ধড়কড়ানি যেন বাড়তে থাকে উড়োজাহাজটার মাথার উপড়ে আসা পর্যন্ত আওয়াজ বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

হেলের জন্তই কড়ায়ে খুস্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল কয়েক টুকরো আলু আর পেঁয়াজ। তপ্ত তেলে নয়, নিরামিষ উত্তপ্ত যিয়ে।

ঝাল মশলা দিয়ে আলু পেঁয়াজের বোল তৈরী করে ভাতে লেদ ডিম ছ'টো ছেড়ে দেবে।

হয়ে গেল কুমারের প্রধান খাণ্ড রান্না। কি বিচ্ছিরি খাওয়াই সে খেতে শিখেছে স্নেহ হয়ে গিয়ে।

পন্ধে বমি আসে। তবু ধর করে রাঁধতে হয়। তার ছেলেই তো খাবে?

বেচারি করবে কি? স্মিত্রা মিত্র সাহেবের বাড়িতে খাওয়া আর পয়তাল্লিশ টাকা বেতনে চাকরী নিয়ে জোর করে কুমারকে রোজ ছ'টো ডিম আর একপো দুধ খেতে বাধ্য করেছে।

কুমারের মা নিজেও জানে না খুস্তি নাড়া হুগিত করে কখন সে এসে দাঁড়িয়েছে পুরানো বাড়ির ছোট উঠানের ধারে শুকনো মৃতপ্রায় তুলসী গাছটার বাঁধানো মঞ্চের গা-ঘেঁষে।

বুক কাঁপছে কিন্তু সন্মোহিতা হয়ে চেয়ে আছে আকাশের ওই ঝক ঝকে রূপালি রহস্যময় গতিশীল বিভীষিকার দিকে।

ওই উড়োজাহাজটা মুখ খুবড়ে আছড়ে যদি পড়ে দাউ দাউ করে জলে উঠে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় মিত্র সাহেবের ঘড়বাড়ি?

স্বধা খরচ দিয়ে এখানে থেকে কলেজে পড়ে। সামনে পরীক্ষা। প্রাণপণে পড়তে পড়তে স্বধা তবু টের পায় এত কষ্টে ধরানো উনানে জরুরী রান্না চাপিয়েও মায়াময়ী বোধ হয় অন্ত ভাবে আনমনা হয়ে ভুলে গেছে রান্নাবান্নার দায়।

কিন্তু সে কল্পনাও করতে পারে না কোন চিন্তা তাকে আনমনা করে দিয়েছে! ওই উড়ো জাহাজটা আছড়ে পড়ে সপরিবারে মিত্র সাহেবদের সঙ্গে স্মিত্রাকেও পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে—এই উদ্ভট কল্পনা যে কামনা



হয়ে মায়াময়ার মস্তিকে পাক দিচ্ছে এটা পৃথিবীর সেরা মনস্তত্ত্ববিদ বলে  
দিলেও বোধ হয় সূধা বিশ্বাস করত না !

কড়ায়ে জল দিয়ে খুস্তি দিয়ে নেড়েচেড়ে সূধা ডাকে, কাকীমা, কি সূন্দর  
গন্ধ বেরিয়েছে তোমার তরকারী থেকে !

আওয়াজ চরমে তুলে উড়োজাহাজটা দেড় মাইল দূরের ঘাঁটিতে নিরাপদে  
অবতরণ করেছে নিশ্চয় ।

কোথাও আছাড় খেয়ে পড়ে জলে উঠলে আগুনের শিখা এখান থেকে  
নিশ্চয় দেখা যেত ।

## ভেরো

ঠিক কুমার যা বলেছিল।

ভবানী যদি দায় নেয় আর হাল ধরে তবেই সে নতুন কারবার কেঁদে  
চালাতে পারবে, পয়সার মুখ দেখবে।

চোখ কান বুঝে যদি অঙ্করে অঙ্করে মেনে চলে ভবানীর নির্দেশ আর  
উপদেশ।

কিছু কিছু পয়সা আসছে।

দৈনিক দু'বেলা ইঁড়ি চড়ানোর ভাবনা মিটেছে। আপনা থেকেই যেন  
বাতিল হয়ে গেছে তার ভিটামিন-যুক্ত শাক খাওয়ানোর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা—  
মাছ মাংস ডিম আর সবচেয়ে দামী তরকারী রান্না হচ্ছে, ভাজা ছেঁচকি চচ্চরি  
হচ্ছে, সিদ্ধ হচ্ছে পোড়া ভুট্টা, দই দুধ মিষ্টান্নও বাদ যাচ্ছে না।

কী অপচয়!

লক্ষ্য করে শিউরে উঠে সমরেশ প্রায় ক্ষেপে যায়।

বলে, থালায় বাসনে নর্দমায় যদি ভাত তরকারী ফেলা হয়েছে দেখতে  
পাই, সাতদিন বাজার বন্ধ থাকবে। সবাই আবার শাক-ভাত খাবে।

প্রীতি ঝংকার দিয়ে বলে, আমার অত ভয় দেখাস নে। আমি আর  
তোরা ঘাড়ে খাচ্ছি না।

সমরেশ রেগে বলে, তাই তো সবাইকে বিগড়ে দিচ্ছিস। কি বিজ্ঞী  
স্বভাব যে তোরা হয়েছে আজকাল।

: চাকরানীর মত না চললেই যেন খারাপ হয়ে যাই, না?

: নিজেই তো তুই দায় নিয়েছিলি? এতকাল চালিয়ে এসেছিলি?

বিরাম ধোরপোষ পাঠায় বলেই সব বাতিল হয়ে গেল ! নতুন কারবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি বলেই তুই সংসারে এমন ছয়লাপ চলতে দিবি ?

: ছয়লাপ কিসের শুনি ? বাবা থাকতে কত সমারোহ হত । তোমার আমলে কিছুই তো নেই । ছোট বোনেরা বড় হয়েছে, গলার হার হাতের চুড়ি মানানসই করে দিতে পারলে-না । ওদের মনে কষ্ট হয় না ? দশটা মেয়ের গয়না কাপড় জামা দেখে বাবার জন্ত ওদের কান্না পায় না ?

সমরেশ নিষ্ঠুরের মত বলে, মাঝে মাঝে কাঁদা ভাল ।

প্রীতি বলে, কান্না পায়, কাঁদেও । কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কেঁদে কাটানো যায় কি ? মানুষের খিদেভেট্টাও তো পায় ? একটু হাসিখুসী আমোদ আহ্লাদ করার সাধ আহ্লাদও তো জাগে ?

দেহমন ঝিমিয়ে আসছিল সমরেশের—খিদের তাগিদ সব হিসাব নিকাশ বাতিল করে দিতে চাইছিল । তবু সে প্রাণের জোরে সজ্ঞান থেকে বলে, ভাত, মাছ দুধ চিনি তরকারী ছড়িয়ে নষ্ট করে বুঝি সে সাধটা মেটাবে ?

: ওটা তুই বাজে যুক্তি তুলেছিস্ । সব ঘরেই খাবার জিনিষ কিছু কিছু ফেলনা যায় ।

: ওই খাবার জিনিষ ফেলনা পেলে কত ঘরের কত মানুষ বেঁচে যায় খবর রাখ ?

: আমার খবর রাখার দরকার ?

রাগে গা জ্বলে যায় সমরেশের, সে চেষ্টা করে বলে, তোদের মত বেহুদ বেহায়্য বোধহয় জগতে নেই ।

: না থাকাই ভাল । পুরুষ মানুষ, সংসারের দায় ঘাড়ে নিয়ে টানতে পারিস না, লজ্জাসরম তোদেরি ভাল মানায় । আমরা বেহায়্য হলে কার কি এসে যায় জগতে ?

এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে নি, সংসার চলছে মামার দয়ার দানে

প্রেস করতে লেগেছে অনেক টাকা, এখন পর্যন্ত বাইরের কাজ যা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে প্রেস চালু রাখার খরচটাও সব উঠে আসছে না। খান কয়েক বই যা ছাপিয়ে বার করেছে তার খরচ কবে উঠে আসবে তাও জানা নেই।

একেই কি বলে ফাঁদ ?

ঝোঁকের মাথায় তাকে দিয়ে ছাপাখানা চালু করিয়ে বই ছাপিয়ে বার করার লাইন ধরিয়ে দিয়ে ভবানী বোধহয় ভুল করেছে—বোধহয় বিপাকে পড়েছে। এ লাইনে তারও কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই—যে কটা কারবার করে সে টাকা করেছে তার সঙ্গে কোনদিন বইএর জগতের কোন সম্পর্কই ছিল না, ছাপাখানার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শুধু লেটার হেড, রসিদ বই ইত্যাদি ছাপিয়ে নেবার।

কোথায় কার কাছে কখন কিভাবে গিয়ে কোন কৌশলে কাজের কন্ট্রাক্ট বাগিয়ে ছাপাখানায় লাভ করা যায় সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না ভবানীর।

কে জানে অবস্থা কি দাঁড়াবে। কে জানে অবস্থা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত ভবানী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

হয় তো আসল তুলবার আশা হারিয়ে লোকসান দিয়ে চলতে চলতে একদিন তাকেই সে দায়ী করে বসবে যে সে একেবারে অপদার্থ, তার দ্বারা কোনদিন কিছু হবে না।

তার জন্ত কিছু করতে যাওয়াই ঝকঝকির কাজ।

বলে হয়তো তাকেই সব কিছুর জন্ত দায়ী করে প্রেসটা বেচে দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবে।

অশিমার মন রাখার জন্ত তার পিছনে টাকা ঢেলে তার একটা হিল্লো করে দেওয়ার ইচ্ছাটাও তো ভবানীর একটা সামরিক ঝোঁক ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভবানী মুখে আশ্বাস দিয়ে কাজে ব্যবস্থা করে দিলেও তাই সময়ের চিন্তা ভাবনার অন্ত হয় নি।

তার আঙুল কিছুমাত্র দূর হয় নি।

এদিকে বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছে যে তার আর ভাবনা কি ! ভবানী যখন দায় নিয়েছে সমরেশকে দাঁড় করিয়ে দেবার, সংসার চালবার জন্ত শ' পাঁচেক টাকা যখন ইতিমধ্যেই মাসে মাসে আনতে শুরু করেছে আগের অবস্থা কিরে আসতে আর দেবী কদিন !

অচল অবস্থার সময় প্রীতি যেমন তার পক্ষ নিয়ে সকলের সঙ্গে লড়াই করেছিল, সচল অবস্থা এসে গিয়েছে ধরে নিয়ে এখন সে সকলের পক্ষ নিয়ে তার সঙ্গে শুরু করেছে ঝগড়া ।

উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে এসে গলা চড়িয়ে সকলকে শুনিবে সমরেশকে বলে, এ সুরোগ হারাস নে সমু । জীবনে কিন্তু দ্বিতীয় বার এ সুরোগ আর আসবে না ।

: কিসের সুরোগ ?

: ছেলেমানুষি করিস্ না ।

সমরেশ নিজেও প্রেসের কাজ যোগানোর চেষ্টায় প্রাণপাত করছে । মামা যাতে তাকে অপদার্থ বলে বাতিল করতে না পারে ।

সারাদিন কাজের ধাক্কাষ বাইরে কাটে । বাড়িতে শুধু সকালটুকু আর রাত্রিটুকু ।

মধ্যাহ্ন ভোজনটাও বাইরেই চলে ।

আপিস কাছারি কলকারখানা বন্ধ থাকার বিশেষ কোন পরবের দিনে ছাপাখানা বন্ধ থাকলে সে অবশ্য দুপুরে বাড়িতেই থায়, সারাদিন এক রকম বাড়ি ছেড়ে বার হয় না ।

মোটাকৈ রকম সলিড রকম ছাপার কাজ দিতে পারার মালিকরা ছুটির দিনে বিরক্ত করলে বড়ই চটে যায় ।

ছুটির দিন ওরকম কাজ যোগাড়ের ব্যাপারে ও-রকম কোন লোকের কাছে যেতে ভবানীও তাকে বারণ করে দিয়েছে ।

সকালবেলা ছ'একটা ইলিশ মাছ কিংবা ছ'এক সের সন্দেশ দিয়ে আসতে ছ'চার মিনিটের জন্ত গেল, সে আলাদা কথা। সনাতনেরা কিংবা আত্মীয়েরা তুলতে পারে ও-সব কথা, ঝগড়াও তারা করতে পারে ওসব ব্যাপার নিয়ে, সমরেশ শুধু ইলিশ মাছ কিংবা সন্দেশ পৌছে দিয়ে ছ' একটা মিষ্টি কথার জবাব দিয়ে চলে আসবে।

দেখা পাবার জন্ত ভাবতে হবে না। সমরেশ একাই তো আর ইলিশ মাছ আর সন্দেশ উপহার দিতে যাবে না। সমরেশ একাই তো আর চেষ্টা করছে না লাভজনক কিছু বাগাবার জন্ত !

ছ'চার মিনিটের জন্ত দেখা দিতে, উপহার গ্রহণ করতে এবং ছ'একটা মিষ্টি কথা বলতে ওরা সকলে প্রস্তুত হয়েই থাকবে।

সমরেশ ওসব নিয়ে না গেলেই বরং ক্ষুণ্ণ হবে।

ছুটির দিন সমরেশ বাড়ি ছেড়ে বার হয় না।

সংসার চালানোর ব্যাপার নিয়ে প্রীতির সঙ্গে তার আজকাল চলে অবিরাম কলহ।

কে জানত সমরেশের মনের খেদ এমনভাবে জমতে জমতে বোমার মত ফেটে পড়বে স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ ছুটির দিনে।

রান্নার সমারোহ করেছিল প্রীতি।

কখন পরসা বাগিয়েছে, কাকে দিয়ে বাজার করিয়েছে, কাকে দিয়ে সওদা আনিয়েছে সে-ই জানে। সকাল থেকে মহাসমারোহে শুরু হয়েছে বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ।

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই প্রীতি নিজে থেকে তাকে জানায়, আরে না, যা ভাবছি তা নয়। শুধু গোলাও আর মাংস করব—পাঁচ রকম ভাজি নয়, শুধু মাছ ভাজা। পাঁচ রকম ভাজাটোজা করে মাছের কালিয়া করতে আজকাল কত খরচ লাগে বুঝি না আমি? সব রকম ভাজা বাদ, কালিয়া বাদ—শুধু—মাছভাজা।

: তোমার টাকায় এসব হচ্ছে ?

: আমার টাকায় হবে কেন ? আমি আনিয়েছি সব, তুই আমার মিটিয়ে দিবি ।

সমরেশ রেগে গিয়ে ম্যাজ করে বলে, বিরামের কাছে খোরপোষ আদায় করে দেখছি মন্ত হিসেবি হয়ে উঠেছিস—একেবারে লাট-গিল্লীর মত হিসেবী ?

প্রীতিও রেগে বলে, বাবা থাকতে আজকের দিনে কত কি রান্না-রান্না হত । আমি তো কিছুই করছি না তার তুলনায় । আমিও তো পঁচিশ টাকা দিচ্ছি সংসার খরচে ?

: কিভাবে দিচ্ছিস ? মাস হিসাবে দিচ্ছিস না দিন হিসাবে দিচ্ছিস ? আজ কত খরচ করেছিস হিসেব দিতে সাহস পাবি ? আমি মাসে চারশো টাকা ঢালি, পঁচিশটে টাকা দিয়ে তুই যেন মালিকানা পেয়ে গেছিস সংসারের ।

: সংসার সামলাচ্ছি না ? সারাদিন খাটছি না ?

সমরেশ হাত জোড় করে বলে, দয়া করে তুই আমাকে রেহাই দে । তোকে সংসার সামলাতে হবে না, পঁচিশ টাকা দিবে পাঁচশো টাকার দায় ঘাড়ে চাপাতে হবে না—দয়া করে তুই হাত গুটিয়ে চুপচাপ থাকলেই আমি স্বস্তি পাব, সংসারটাও স্বস্তি পাবে ।

ঝগড়া কতবার চরমে উঠেছে,—কতবার সে গলা কাটিয়ে চীৎকার করে কত অকথ্য অপমানজনক কথা প্রীতিকে বলেছে—রেগে কেঁদে প্রীতিও তাকে কী তীব্রভাবেই ধিক্কার জানিয়েছে ।

আজ প্রীতি ঝগড়া করে না ।

শুধু বলে, তোমার বাড়িতে আমি আর থাকব না ।

বলে, এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ।

প্রশান্তি মুখ বাঁকিয়ে বলে, রাগের কি বহর, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন ! কোথায় যাবি, কার কাছে থাকবি ?

স্মৃতি বলে, পাড়ায় কারো বাড়ি গিয়ে বসে থাকবে—রাগ পড়লেই ফিরে আসবে।

পোলাও মাংস রান্না করা বাকী থাকে না। মন্ত বড় রুই মাছের খণ্ডগুলি প্রীতি শুধু ভাজা করে দিয়ে খরচ বাঁচাবে ঠিক করেছিল—অনেক আলু পোঁয়াজ মশলা সহযোগে সেগুলো দিয়ে শেষ পর্যন্ত কালিয়া রান্না হয়।

রাগে গা জ্বলে যায়, সেই সঙ্গে সমরেশের মনে হয় যে তার মত বোকা বোধহয় জগতে নেই। অপচয় আর বাড়তি খরচের জন্তু ওদের সঙ্গে বকাবকি না করে সোজাসুজি ওসব খরচ দিতে অস্বীকার করলেই চুকে যেত।

টাকা তো থাকে তার কাছে।

এদিকে বকাবকি করবে আবার খরচগুলি সব চোখকান বুজে জুগিয়েও যাবে, তবুও নিজেদের স্বভাব ওরা নিজে থেকে শুধরে নেবে ওরা কি তেমন মাহুষ!

ওরা তো জানিয়েই দিয়েছে ভাল খাওয়া ভাল পরা ওদের গ্রায্য অধিকার, উচিত পাওনা।

কিন্তু প্রীতি সত্যিই রাগ করে চলে গেল, তার বাড়িতে সত্যিই আর থাকবে না? অথবা স্মৃতির কথাই ঠিক, রাগ কমলে ফিরে আসবে?

বেলা বাড়ে। মহাসমারোহে ভোজ খাওয়া হয়। সমরেশ শুধু ডাল তরকারী আর এক টুকরো মাছ দিয়ে সাদা ভাত খায়। সে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে তার মত গরীব মাহুষের পেটে পোলাও মাংস সইবে না।

প্রগতি খিল খিল করে হেসে উঠে বলেছিল, এটা তোমার খেয়াল-খুসার কথা!

প্রীতি বাড়ি ফেরে বিকালে।

ততক্ষণে সকলেই তার জন্তু রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিল। সমরেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল সকলের চেয়ে বেশী—কারণ, তারই কেবল বার



বার মনে পড়ছিল যে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন প্রীতির নয়, বিয়ের কিছুদিন পরেই স্বামীর সঙ্গে তার চিরদিনের জন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

কে জানে ঝোঁকের বশে সে কি কাণ্ড করে বসবে অথবা করে বসেছে!

জরুরী না হলেও একটা কাজে বার হওয়া দরকার ছিল, প্রীতি না ফেরা পর্যন্ত সে বার হতে পারছিল না।

প্রীতিকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

প্রণতি খুলীর সুরে বলে, রাগ পড়তে এতক্ষণ লাগল মেজ্জদির?

প্রীতি গম্ভীর মুখে নির্বিকার ভাবে বলে, বাগের কি আছে? সমু আমায় পছন্দ করে না, ওব বাড়িতে আমি শুধু ঝন্ঝট বাধাই—আমি তাই অল্প যাগায় থাকবার ব্যবস্থা করে এলাম। জিনিষপত্র কটা নিতে এসেছি।

শুনে সকলের আঁক্কেল গুড্ডুম হয়ে যায়।

অল্প যাগায় থাকাব ব্যবস্থা কবে সে জিনিষপত্র নিতে এসেছে!

সমরেশ নরম সুরে বলে, কেন পাগালামি করছিস? কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি হলেই কি একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়?

প্রীতি তেমনি নির্বিকার ভাবে বলে, তুই নিজেই তো বলেছিস আমি নাক না গলালে তুই স্বস্তি পাবি, তোব সংসার স্বস্তি পাবে। পঁচিশ টাকা খাই-খরচা দিয়ে পাঁচশো টাকার সংসারের ব্যাপারে নাক গলানো সত্যি আমার উচিত হয় নি।

প্রীতির গলা কেঁপে যায়।

: বিস্ত কবব কি বল? ওই হল আমার স্বভাব—চিরকালের অভ্যাস। নাক না গলিয়ে আমি পাবব না। হাত পা গুটিয়ে হুঁটো হয়ে থেকে খাব আর ঘুমোব, আমি তা পারব না। তার চেয়ে তোরাই স্বস্তি পা, আমি বিদেয় হই।

সংযম বজায় রাখা আব সম্ভব হয় না প্রীতির পক্ষে, এবার সে কেঁদে ফেলে।

বলে, আমি একলা মালুয, একটা পেটের ব্যাপার—যেখানে থাকি চলে যাবে।

সমরেশ বিচলিত হয়ে প্রায় করুণ স্বরে বলে, কী এমন বলেছি তোকে আমি ? শুধু বলেছি বাড়াবাড়ি করিস না। এখনো তো কিছু করতে পারি নি, বড়লোক হয়ে যাই নি ? ছুটো দিন সবুর করতে বলেছি।

: তোর সাথে আমার বনবে না।

বাইরে থেকে গাড়ীওয়ার তাগিদ আসে।

জিনিষপত্র নিয়ে যাবার জন্ত প্রীতি ট্যাক্সিতে আসে নি, ছ্যাকবা ঘোড়ার গাড়ীতে এসেছে।

প্রীতি বলে, যাক গে, ঠিকঠাক যখন করেই এসেছি, চলেই যাই। হাসিমুখে যেদিন বাবাব সংসারের ব্যাপারে আমাকে নাক গলাতে দিতে পারবি সেদিন ডাকিস, ফিরে আসব।

জুমতি স্ত্রীতিরা প্রায় একসঙ্গে কলবব করে উঠে একই প্রশ্ন করে, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায় ? কোথায় থাকবে ঠিক কবে এলে ?

প্রীতি একটু হেসে বলে, নিজের লোকের বাড়িতেই যাচ্ছি। আপন জনের বাড়িতে।

সমরেশ প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছ আমাদের জানাবে না ?

প্রীতি হাসিমুখেই বলে, পাগল হয়েছিস ? আমি কি নিরুদ্দেশ যাত্রা করছি ? আমাদের দু'নম্বর মামীর বাড়িতে গিয়ে থাকব। খরচ দিয়েই অবশ্য থাকব।

রাগ করে ভায়ের বাড়ি ছেড়ে নন্দিতাদের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবে ! নন্দিতা অবশ্য সম্পর্কে মামী হয় প্রীতির—কিন্তু মামাকে সে ত্যাগ করেছে। স্বামী-ত্যাগিনী দু'জনের মধ্যে কেমন মিল হবে কে জানে !

আবার বাইরে থেকে তাগিদ আসে গাড়োয়ানের।

প্রীতি একলা মালুয কিন্তু তার মালপত্র কম নয়। ধনী বাপের ছেলের

সঙ্গে মহিম মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, উভয় পক্ষ থেকে প্রীতি ট্রান্স স্কটকেসই পেয়েছিল ডজনখানেক।

একটা ঘোড়ার গাড়ীতে কি আঁটবে তার জিনিষপত্র ?

প্রীতি বলে, না না, সব জিনিষ নেব না। শুধু একটা বাস, একটা স্কটকেস—বিছানা আর টুকিটাকি জিনিষ। চিরদিনের জন্য যাচ্ছি নাকি আমি বাপের বাড়ি ছেড়ে ?

বেশী রাত্রে নন্দিতা আসে।

সমরেশকে সাধুনা দিয়ে বলে, ভেবো না। কিছুকাল থাক না আমার কাছে ? বেচারার জীবনে পরের সংসার নিয়ে মেতে থাকা ছাড়া কোন রস কষ বৈচিত্র্য নেই।

: জালিয়ে মারবে।

: না। আমায় বাঁচাবে, মাকে বাঁচাবে। সংসারের সব ঝন্ঝাট ঘাড়ে নেবে। আমি জানি তো ওকে।

: খরচ বাড়িয়ে দেবে দশগুণ।

: পারবে না। স্পষ্ট বলে দিয়েছি যে তোমার মামা আর চাইলেই আমায় আবেল তাবোল টাকা দেয় না। মাসিক বরাদ্দের এক পরমা বেশী দেবে না। শুনে কি বলল জুনো ? সব পুরুষেরাই নাকি এক ছাঁচে গড়া, যত না দিয়ে পারে। সেইজন্য মাথা মমতা না করে যত পারা যায় আদায় করে নেওয়া উচিত। দরকার হলে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে ছোটলোকামি করলেও দোষ নেই।

সমরেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, তোমরা মেয়েরা ভারি ইয়ে। এতকাল দ্বিবিয় মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিতে পারল, বিরামের কাছ থেকে ধোরপোষের টাকাটা পাবে ঠিক হতেই বিদায় নিল। তোমরা মেয়েরা বড় স্বার্থপর।

নন্দিতাও ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, মিছে কথা বোলো না ; প্রীতি কোনদিন মুখ গুল্লে কাটায় নি—হৈ চৈ করেই কাটিয়েছে। তোমার অবস্থা যখন কাহিল হয়েছিল তখন বরং সামলে হুমলেই চালিয়েছে। অবস্থা ফিরেছে অথচ তুমি ওকে এতটুকু হৈ চৈ করতে দেবে না—এটা ওর সইল না।

: অবস্থা ফিরেছে নাকি আমার ?

: ফিরেছে বৈকি। এখন তুমি একটা ছাপাখানার মালিক, মস্ত বড় প্রকাশক।

সমরেশ হাসবে না কঁাদবে ভেবে পায় না।

কথাটা অবশ্য ঠিক।

নিজে সব টাকা দিলেও ভবানী কিন্তু সতাই ছাপাখানা বা প্রকাশনীর কোন রকম মালিকানা নিজের নামে রাখে নি—তাকেই মালিক করে দিয়েছে সব কিছুয়।

সে রাজী না হলে ছাপাখানা বা প্রকাশনী বিক্রি করার ক্ষমতাও ভবানীর নেই।

শুধু তাই নয়।

ইচ্ছা করলে ভবানীকে সে ছাপাখানায় ঢুকতে পর্যন্ত না দিতে পারে, ঢুকলে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারে।

পারে বটে কিন্তু ভবানীকে বাদ দিয়ে একলা দাঁড়াবার কল্পনা করার সাধ্য কি আর আছে ?

শুধু তাই নয়।

পনের হাজার টাকার একটা বণ্ড ভবানী তাকে লিখিয়ে নিয়েছে প্রেস দেবার আগে।

প্রেস চলে না। বই চলে না।

ভবানীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সমরেশ আশঙ্কা করেছিল, তারই যেন ইঙ্গিত পাওয়া যায় একদিন।

বছরখানেক পরে ।

হুটায় দু'তিন দিন দু'এক ঘণ্টার জন্ত প্রেসে আসত, কাজকর্মের হিসাব জানত আর ব্যাপার বুঝত—প্রায় নিয়মিতভাবে ।

মাস দু'ই সে প্রেসে আসে না ।

সমরেশ মাঝে মাঝে পরামর্শ চাইতে কিছা এমনি দেখা করতে গেলে পরামর্শ দিতে কিছা প্রেসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না ।

মাঝে একটু বিরক্তি প্রকাশ করেই বলে, কতদিকে মাথা ঘামাবো বল ? আমার কি একটা দায় ? সব ঠিকঠাক করে দিলাম, অ্যাডিন দেখিয়ে শুনিয়ে শিখিয়ে দিলাম, এবার নিজে চালিয়ে যা !

মুখে সে যাই বলুক সমরেশের টের পেতে কষ্ট হয় না যে প্রেসের জন্ত মাথা সে ভাল করেই ঘামাচ্ছে !

প্রেসের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে তার যে বৈরাগ্য জন্মেনি সেটা জানা যায় কুমারের কাছ থেকে ।

নিজে এসে সমরেশের কাছে ব্যাপার বোঝার বদলে সে কুমারকে তলব করে নিয়ে গিয়ে তার কাছে ব্যাপার জেনে নেয় ।

প্রকৃতভাবেই করে, কোন রকম গোপনতা চালায় না ।

প্রেস ও প্রকাশনীর কাগজ-কলমে মালিক সমরেশের কাছে নোট পাঠায় যে কুমার যেন এতটা বেজে এত মিনিটের সময় তার সঙ্গে আপিসে গিয়ে দেখা করে ।

কুমার ষথাসময়ে দেখা করতে যায় ভবানীর সঙ্গে, সমরেশ যায় মামা বণিড়িতে অগিমার সঙ্গে কথা বলতে ।

সর্বদা ব্যবহার করে তার সাহেবী পোষাক দু'টির চাকচিক্য নষ্ট হয়ে এসে-ছিল, ক্রমে ক্রমে সে টের পেয়েছিল যে এই পোষাকে সাধারণ একটা ছাপাখানা আর সাধারণ বাংলা বই ছাপার কাজ তদারক করতে যাওয়ার মানে হয় নী ।

কিছুদিন থেকে সে দেশী বেশেই প্রেসে আসছিল।

ভবানী শুধু জিজ্ঞাসা করছিল, পোষাক ছাড়লি কেন ?

: ছাড়ি নি, তুলে রেখেছি। কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে পোষাক পরেই যাই। প্রেসে ও পোষাকে এসে কি হবে ? প্রেস খুব বড় হোক বইগুলো চলুক—তখন ওই রকম পোষাক পরে আসব।

ভবানী আর কিছু বলে নি।

সময় অসময় হিসাব না করে যখন সে যাক অগ্নিমা খুসী হয়ে বলে, এসো ভাঞ্জে, এসো। কাজের সময় কাজ ফেলে এলেই সবচেয়ে ভাল লাগে। প্রমাণ পাই কিনা যে সত্যিকারের টান আছে !

: তোমার টানের মান যে ওদিকে রাখতে পারছি না ছোটমামী !

সরমাকে সে শুধু মামী বলত, নন্দিতাকে বলে নতুন মামী। অগ্নিমার ছোটমামী নামটা তার জন্মই চালু হয়ে গেছে।

অগ্নিমা বলে, তাই মুখ এমন শুকনো ? ব্যাপারটা কি শুনি ?

সমরেশ বলে, তুমি তো মামাকে দিয়ে ব্যবস্থা কবিয়ে দিলে। আমি যে এদিকে চালাতে পারছি না ? উন্নতি করা দূরে থাক, লোকসান দিয়ে যাচ্ছি। মামা বোধ হয় আর টানবে না, অপদার্থ বলে এবার আমাকে বাতিল করে দেবে।

অগ্নিমা একটু হেসে বলে, ইস, বাতিল করে দিলেই হল ! আমাকেও তাহলে বাতিল করতে হবে।

: কিন্তু মামাই বা এভাবে কদিন টানবে বল ? আমি যে পারছি না সে দোষ তো মামার নয়। মামা অনেক করেছে।

: ছাই করেছে। এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া কেন যা চলে না, তোমার মত চালাক চতুর খাটিয়ে ছেলে প্রাণপণ করেও যা চালাতে পারে না ! কে পায়ে ধরে বলেছিল ছাপাখানা করে দিতে ? অস্ত্র কোন ব্যবস্থা করে দিলেই হত !

: মামা তো ভাল ভেবেই করেছে ।

: ভাল ভেবেই করুক আর মন্দ ভেবেই করুক, দায় যখন নিয়েছে তখন তোমার জন্ত ভাল কিছু করতেই হবে । তুমি বোকা হাবা আলসে হলে বরং কথা ছিল, বাই করে দেওয়া হোক, তুমি চালাতে পারবে না । তাতো আর নয় ! ছাপাখানা না চলে, ছাপাখানা উঠিয়ে দিয়ে অন্ত ব্যবস্থা করে দেবে ।

সমরেশ খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত অগিমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে । ভবানীর উপর এত জোর অগিমার ? অথবা এ শুধু ছেলেমানুষী বুদ্ধি ?

মনের আক্ষেপটা প্রকাশ করবে কিনা সমরেশকে একটু ভাবতে হয় । অগিমাকে কথাটা শোনানো মানেই নিজের স্বার্থে যা মারা—তার জন্ত ভবানীর ওপর জোর খাটাতে অগিমা হয় তো ভড়কে যাবে !

পরক্ষণে মনে মনে নিজেকে দিক্কার দিয়ে সমরেশ বলে, আমি কি ভাবছি জানো ? আমার জন্ত শেষকালে মামা না তোমার ওপর চটে যায় !

অগিমা একটু হেসে বলে, চটে গিয়ে আমার কি করবে ? দিদিটা ছিল বোকা, নিজের মনে গুমরে মরত আর শরীর মন খারাপ করে বিষের বড়ি খেত । নিজে একটু শক্ত হলেই নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাতে বসাতে পারত না মানুষটাকে ?

সমরেশ অভিভূত হয়ে শোনে । সরমা নয় নরম ছিল, নন্দিতার মত শক্ত মেয়েও তো হার মেনে পালিয়ে গিয়েছিল ।

অগিমা কি নন্দিতার চেয়েও শক্ত মেয়ে ? নাকে দড়ি দিয়ে ভবানীকে ওঠাবার বসাবার ক্ষমতা সত্যি কি তার আছে ?

অথবা এ শুধু তার ছেলেমানুষী অহঙ্কার ?

অগিমাও স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে ।

আর সে হাসে না ।

সহজ সুরেই বলে, তুমি হলে ভাগ্যে মানুষ, তোমায় বলা উচিত হত না । কিন্তু বুঝতে পারছি আমার জন্তে তোমার রীতিমত ভাবনা হয়েছে । না বলে,

তাই পারলাম না। পরশু ব্যাপারটাই বলি, চালক আছে, আসল ব্যাপার বুঝে নেবে।

সমরেশ ভাবে না জানি কি গুরুতর কথাই অগিমা তাব কাছে ফাঁস করবে। অগিমা যা বলে তা শুনে তাব ছেলেমানুষী অহঙ্কার সম্পর্কেই তাব ধারণা আরও দৃঢ় হয়।

: পরশু কি কাণ্ড হয়েছিল জানো? তোমাব মামা তো বাইরে থেকে খেয়ে টেয়ে টাইটশ্বর হয়ে অনেক বাতে বাড়ি ফিরল। আমি কিছুই বললাম না,—বলে লাভ কি? শুধরে তো আর নেওয়া যাবে না মাস্তমটাকে, কিছু বলতে গেলেই ঝগড়াঝাটি, অশান্তি। আমি শুধু জিগ্গেস করলাম, এত রাত হল যে? একটা জবাবও দিল না। কী গোমড়া মুখ। পোষাক ছেড়ে বাথরুম ঘুরে এসে বসার ঘবে বসে ভুবনের মাকে হুকুম দিল পেগ আনতে। ভুবনেন মা তো ভয়ে কেঁপে অস্থির। ও বেচারী কি পেগ দিতে জানে? আমিই গিয়ে একটা পেগ দিলাম।

সমরেশ আশ্চর্য হয়ে বলে, পেগ দিতে তুমি শিখলে কোথায়?

অগিমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, এখানে এসে শিখলাম—তোমাব ছোটমামী হবার পব শিখলাম। দু'এক মাস চেয়ে চেয়ে দেখলাম যে মাস্তমটা পেগ চাইলে পেগ দিতেই হবে—নইলে নিস্তাব নেই। পেগ দিতে বলেই তো আগেকার ওই স্তন্দরী রাঁধুনীটা সংসার খবচেব টাকা থেকে মাসে দু'তিন শ' টাকা চুরি করতে পারত—দিদিব সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেও টিকে থাকতে পারত। দিদি কতবার জবাব দিচ্ছে স্তন্দরীকে, তোমার মামা একথা ওকথা বলে কাজে বজায় রেখেছে। নইলে এমন আশ্পর্ষ্য হয়? দিদির সঙ্গে মুখে মুখে সমানভাবে কথা কহিতে সাহস পায়? আমি এসে দু'মাস ব্যাপার বুঝলাম—তৃতীয় মাসে ওকে দূর দূর করে খেদিয়ে দিলাম।

সরমার মরার দিনের কথা সমরেশের মনে পড়ে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার অনেক দামী বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা আসবাবে রক্ষা করা পচা খাবার খেতে



দেওয়ার জন্য বেদিন রাগের মাথায় সতেজে সরমা স্নানরীকে ভৎ'সনা করেছিল এবং বন্টা দেড়েকের মধ্যে মরে গিয়েছিল।

ভুবনের মা চা খাবার নিয়ে আসায় বাধা পড়েছিল অগিমার কথায়। চা কয়েকটি বিস্কুট আর দু'টি টাটকা সন্দেশ।

ছোটমামার বাড়িতে একেবারে যেন পার্টে গেছে চা খাবার খেতে দেবার ব্যবস্থা।

অগিমার নয়। ব্যবস্থা ?

অগিমা তার আসল কথায় ফিরে এসে বলে, পেগ দিলাম, গেলাসে একবার চুমুকও দিল না। চোখ পাকিয়ে কড়া সুরে জিজ্ঞেস করল, সারা দুপুর নাকি পাড়া বেড়িয়ে বজ্জাতি করে বেড়াও ? আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম মামুষটার মনের ভাব। রাগ না করে তাই বললাম, দুপুরবেলা খালি বাড়িতেই বজ্জাতি করা সহজ, পাড়ার মেয়ে বোদের সঙ্গে ভাব করলে কি বজ্জাতি করার সুযোগ মেলে ! তোমার মামা কি বললে জানো ? মেয়েদের সঙ্গে ভাব কর না ছেলেদের সঙ্গে স্ফুর্তি কর ? শুনেই আমি লাথি মেরে পেগের গ্লাসটা আছড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা দিলাম। রাতে পাঁচ ছ' বার ডাকল, কত মিনতি করল, আমি আর সাড়াও দিলাম না। কোথায় শুয়ে ঘুমিয়েছিল কে জানে, শেবরাজে দরজায় কী ধাক্কা—দরজা খুলতেই কি করল জান ?

সমরেশের কল্পনা ভেঁতা হয়ে গিয়েছিল, সে চূপ করে থাকে।

অগিমা বলে, একেবারে পায়ে ধয়ে বলল, অন্ত্রায় করেছি, এবারের মত মাপ কর।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, তারপর ? ওইখানেই শেষ হয়ে গেল ? পায়ে ধয়ে মাপ চেয়ে মামা নিজের বিছানায় ঘুমোতে গেল, তুমি নিজের গোসাঘরে ঘুমিয়ে রইলে ?

অগিমা রেগে বলে, মনে হচ্ছে তুমি সত্যি সত্যি বোকা-হাবা। একটা

মাহুয ওভাবে পায়ে ধরে মাপ চাওয়ার পর গোসা ঘরে দরজা বন্ধ করে  
ঘুমানো যায় ?

সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে সমরেশ কোন কুল  
কিনারা পায় না। শেবরাত্রে নেশা কেটে গেলে ভবানী তার পায়ে ধরে ক্ষমা  
চেয়েছে—এর মধ্যে স্বামীর ওপর অগ্নিমার বিশেষ প্রতিপত্তির কোন প্রমাণ  
সমরেশ খুঁজে পায় না।

নেশা করেও নন্দিতাকে বরং ওরকম বিত্ৰী কথা বলার সাহস ভবানীর  
হত না—কোনদিন বলতেও পারে নি।

ছপুরবেলা পাড়ায় একটু এবাড়ি ওবাড়ি মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে যাওয়া  
তো সামান্ত কথা, দু’তিন দিন কোথাও গিয়ে কাটিষে আসার পরও নন্দিতাকে  
ওরকম কথা বলতে ভবানী ভরসা পায় নি।

অগ্নিমার কোমলতা আর ছেলেমাহুযী আফ্লাদীপনা পছন্দ করে বলেই  
কি ভবানী তাকে প্রশ্রয় দেয়—অজ্ঞায় কথা বলার জন্তু পায়ে ধরে ক্ষমা  
পর্যন্ত চায় ?

স্বামীর ওপর তার প্রতিপত্তির এটাই কি আসল স্বরূপ ? নন্দিতার  
সত্যিকারের জোর ছিল—অগ্নিমাকে ভবানী দয়া করে জোর থাটাতে দেয় ?

অগ্নিমার ওপর মায়া পড়েছিল, সমরেশের মনে গুরুতর আশঙ্কা জাগে।  
এই ছেলেমাহুযী ভাবালুতা নিয়ে, ভবানীর সখের আদর ও প্রশ্রয়কে তাকে  
নাকে দড়ি দিয়ে ওঠানো ঝলানোর ক্ষমতা বলে ধরে নিয়ে, অগ্নিমা কতদিন  
সামলে চলতে পারবে ?

পাড়া বেড়ানো নিয়েই যদি ইতিমধ্যে বিত্ৰী তিরস্কারের পালা শুরু হয়ে  
গিয়ে থাকে, সখের দরদ পাতলা হয়ে এলে ভবানী কি ব্যবহার শুরু করে  
দেবে কে জানে ?

অগ্নিমা নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছ ? বকলাম বলে গোসা  
হল নাকি ?

সমরেশ হেসে বলে আমি কি মেয়েছেলে যে কথায় কথায় গোসা করব ?  
সরলভাবে একটা কথার জবাব দেবে ?

: নিশ্চয় দেব ।

: মামার আদর তোমার ভাল লাগে ?

: এ আবার কেমন ধারা কথা !

সমরেশ গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি একটা কথা ভুল বুঝেছ—মামা খারাপ ব্যবহার করত বলে প্রথম মামীকে বিষের বড়ি খাওয়া ধরতে হয় নি । মামার আদর সহিত না । ছ’নম্বর মামীও মামার আদরের চোটেই পালিয়ে বেঁচেছিল—মামার শাসন অসহ্য হয়ে উঠেছিল বলে নয় । তাই জিজ্ঞেস করছি, মামার আদর সহিছে তো ?

অণিমা হেসে বলে, আমি আহ্লাদী মেয়ে তো, আদরে আমার অরুচি হয় না । আনাড়ি ছোঁড়ার বদলে তাদের আহ্লাদ করতে জানে এরকম পাকাপোক্ত বর পেয়েছি বলেই আমি খুসী হয়েছি ভায়ে !

কৃত্রিমতা নয় ; তার কথার মধ্যে উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি সমরেশকে আরও ভাবিত করে তোলে ।

কুমার অনেক আগেই প্রেসে ফিরে একমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল—কাজ নিয়ে এতই যেন সে ব্যস্ত যে সমরেশ ফিরলেও মুখ তুলে তাকাবার অবকাশ নেই ।

অথচ নন্দিতার নতুন একটা বই ছাপা ছাড়া প্রেসের কাজ আছে সামান্যই ।

: কি করছিস ?

প্রশ্ন শুনে তবে কুমার মুখ তোলে ।

: তোর মামার বিশেষ হুকুম তামিল করছি ।

: আয় চা খেয়ে আসি । ব্যাপার শুনব । আমায় বলা বারণ নয় তো ?

কুমার একটু হেসে বলে, তোর মাথা অস্ত বোকা নয়! তোকে বলতে  
বারণ করলে আরও যে বেশী করে বলব সে জানিটুকু ভক্তলোকের ভালরকম  
আছে। আবার চা খেতে দোকানে যাব? চা আনিয়ে এখানে বসেই শোন  
না সব বলছি। জটিল বা গোপনীয় ব্যাপার কিছু নয়, কালের মধ্যে  
কতগুলি স্টেটমেন্ট দাখিল করার হুকুম হয়েছে।

সমরেশও হেসে বলে, জানিস না আমিই আসল মালিক? ইচ্ছা হলে  
কালই তোকে ফায়ার করতে পারি? এখানে বসে ওসব কথা বলা  
যায় না।

তার সতেজ নিশ্চিত ভাব দেখে কুমার একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। কাগজ-  
পত্র গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

: তোর হুকুম শুনেই তবে চলি।

কাছেই চায়ের দোকান। এখন প্রায় ফাঁকা। ঘণ্টাখানেক পরে  
আফিসগুলিতে ছুটির ঘণ্টা পড়ার পর একটা চেয়ার বা বেঞ্চিতে খালি  
থাকবে না।

মাংসের চপ, মাছের কাটলেট বা ডিমের মামলেট সমরেশ নিয়মিত খায়।  
কাড়িতে শুধু শাকসবজি জুটবে বলে নয়। সারাদিন খেতে দেহ মন ভয়ানক রকম  
ঝিমিয়ে যায় বলে, একটু কিছু খেয়ে না নিষে ট্রামে বাসে সার্কাসি কসরৎ  
করতে করতে ঘরে ফেরার ক্লমতা থাকে না বলেও বটে।

কুমার বলে, বেশী কিছু বলেন নি। মোট কথা হল—প্রেসটা তুলে  
দেবেন। এই প্রেস বা পাবলিশিং চালিয়ে গিয়ে আখেরে কোন লাভ হবে না,  
বা লোকসান গেছে সেটা মেনে নিয়ে তুলে দেওয়াই ভাল। আমি স্টেটমেন্ট  
দেবার পর তোর সঙ্গে কথা বলবেন। আমার ভরসা দিয়ে বলেন যে তোরও  
ভাবনার কারণ নেই, আমারও ভাবনার কারণ নেই, আমাকে অস্ত ডিপার্টমেন্টে  
চাকরী দেবেন, তোর জন্ত ব্যবস্থা করবেন।

সমরেশ ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞাসা করে, নতুন ব্যবস্থা কি করবেন বললেন?

: কি করবেন নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলেন নি। শুধু বলেছেন নতুন ব্যবস্থা করবেন।

সমরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যাক্ গে। কি হয় দেখা যাক। মামার কথার ওপরে তো আর কথা নেই। মামাই তো হাল ধরে সব চালাচ্ছে।

: ভেসে গেলি ?

: বস্তায় ভাসিয়ে নিচ্ছে, করব কি ?

বাড়ি ফিরে সমরেশ জামা কাপড় ছাড়ে না, মুখ হাত ধোয় না, বাইরের ঘবে বসে একটার পর একটা সিগারেট টেনে যায়।

আগে ছিল, এখন তার নিজস্ব একটা ঘরও নেই। ইচ্ছা করলে নিজের জন্তু একটা ঘর সে দখলে রাখতে পারে অনায়াসে, নিজেই সে বাতিল করে দিয়েছে সে ব্যবস্থা।

দোতলাটা ভাড়া দেবার পর।

তার এই উদ্বৃত্তার মূল্য দিতে বাড়ির মানুষ কিন্তু তার প্রয়োজনের মর্যাদা বজায় রেখেই চলে।

বৈঠকধানায় আজকাল তিনটে বড় বিছানা হয়, তিনজন আশ্রিতা মাসী কাকী আর পিসী নিজের নিজের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সেই বিছানায় রাত কাটায়।

বিছানা পাতা হয় সন্ধ্যা-রাতেরই। সমরেশ বৈঠকধানায় বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সিগারেট টানছে বলে ঘুমের জন্তু বাচ্চাকাচ্চাদের কান্না শুরু হয়ে যায়—তাদের জন্তু বিছানা পাতা যাচ্ছে না।

জুমতি এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেউ আসবে না কি রে ?

: না।

: জামা কাপড় না ছেড়ে চুপচাপ বসে আছিস ?

: এমনি একটু বিজ্ঞাম করছি।

তারপর সবাই পরামর্শ করে সুনীতিকে পাঠায় তাকে ধাতস্থ করার জন্ত।

সুনীতি একটু ভয়ে ভয়েই বলে, থাকে না দাদা? তোমাব ভাত রুটি বেড়ে  
রেখে দেব?

কাঁপা গলায় প্রশ্ন করার মধ্যে তার ভয় টের পেয়ে সমরেশ সতাই ধাতস্থ  
হয়, চিন্তাজগত থেকে নেমে এসে কোমল সুরে জিজ্ঞাসা কবে, তোরা  
খেয়েছিল?

: বাচ্চারা খেয়েছে। তোমাষ দিয়েই আমবা খাব। এঘরেব বিছানা  
পাতবো তো?

: পাত। আমার জন্ত মিছিমিছি বসে থাকিস কেন বল তো তোরা?  
খেয়ে নিলেই হয়।

: তুমি বেরোলে আমবা আর বসে থাকি না। আজ তুমি বাড়ি  
আছো তাই।

সকলে ভেবেছিল মেজাজ বুঝি খাবাপ হয়ে আছে সমরেশের, কিন্তু এবার  
যেন তাকে বেশীরকম ধীর আব শান্ত মনে হয়। সকলেব সঙ্গে নরম সুরে  
কথা বলে, বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খায়, মুখে হাসিখুসী ভাবেব একান্ত অভাবের  
জন্তই বোধ হয় তাকে একটু অন্তমনস্ক আর একটু গম্ভীর মনে হয়।

সুনীতি জিজ্ঞাসা কবে, শরীব খাবাপ হয় নি তো? একা একা চুপ-চাপ  
বসে এত কি ভাবছিলি?

সমরেশ বলে, কি ভাবছিলাম? বিষম একটা সমস্যায় পড়েছি, কি করা  
উচিত তাই ভাবছিলাম।

প্রগতি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ভেবে নিশ্চয় ঠিক করতে পেরেছ কি কববে?  
তাই তোমাকে এখন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে!

সমরেশ এবার একটু হাসে, ঠিক করেছি কিন্তু তোমরা যেমন ভাবছ তেমন  
কিছু নয়,—এবারে উষ্টো ব্যাপার। আমার সঙ্গে তোমরাও মজা টের পাবে।

সকলে স্তব্ধ হয়ে থাকে ।

প্রাণতিই আবার বলে, একটু জানিয়ে রাখো না ব্যাপারটা, আমাদেরও তো তৈরী হতে হবে মজা টের পাওয়ার জন্ত !

: মামার সঙ্গে ঝগড়া করব । নিজে সব ব্যবস্থা করব । মামার মুখ চেয়ে থেকেই আমার কিছু হচ্ছে না, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছি না । মামা তো শুধু দায় টানছে । আমি উঠি বা পড়ি মামার বয়ে গেল । এবার নিজে সব করব । বছরখানেক তোমাদের সকলের বেশ একটু কষ্ট করতে হবে ।— আগে থেকে জানিয়ে রাখছি ।

কেউ কিছু বলার আগে কপাল চাপড়ে স্মৃতি বলে, আবার আরও বেশী কষ্ট করতে হবে ।

পিসী বলে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে সমু ! নিজের পায়ে তুই কুড়ল মারতে চাইছিল ।

সমরেশ ধীর শাস্তভাবে বলে, এতদিনে বরং মাথা ঠিক হয়েছে—এবার ঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি । তোমরা ভয় পেয়ো না, মনটাকে একটু শক্ত কর— বাবার সময়কার অবস্থা কোন দিন ফিরবে কিনা জানি না, তবে তোমাদের যাতে কষ্ট না করতে হয় হু'এক বছরের মধ্যে সে অবস্থা আমি করছি !

অন্তেরা চুপ করে থাকে, প্রাণতিই যেন সবচেয়ে বেশী ঘাবড়ে গিয়ে বলে, ও বাবা, আরও হু'এক বছর !

সমরেশ বলে, বাজে বই পড়ে শুয়ে বসে দিন কাটাস, তোর সময় কাটতে চায় না । কোন একটা কাজের কাজে লেগে যা—একটা ছোটো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরও পাবি না ।

বাড়ির মানুষদের জন্ত বড়ই অস্বস্তি বোধ করে সমরেশ ।

তার বাবার ছিল ফলাও কারবারের মোটা রোজগার—কোনদিন কেউ টের পায় নি অভাব অনটন কাকে বলে ।

তার আমলে শুধু নাই নাই বুলি ।

‘হু’এক বছর সে নিজেই সহ্য করতে পারবে কি ওদের আর্চনাদ ?  
কাজের ধাক্কায় সকাল থেকে অনেক রাত অবধি মেতে থাকবে এইটুকুই  
যা ভরসা ।

পরদিন সকালে প্রায় সকলের আগে প্রেসে যায় । কুমার যথাসময়ে কাজে  
এলে সে তার সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়ে দেয় ।

তাকে চায়ের দোকানে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জানায় না, সকলে  
শুনবে কি শুনবে না গ্রাহ্য না করে টেবিলের সামনে বসে জোর গলায় বলে,  
স্টেটমেন্টটা দিচ্ছি দে, কিন্তু প্রেস আমি ওঠাব না, পাবলিশিংও বন্ধ  
করব না ।

মুখ তুলে পেনের গোড়াটা গালে ঠেকিয়ে কুমার নীরবে চেয়ে থাকে ।

সমরেশ বলে, আরও হু’একবছর চেষ্টা করব, আমার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে  
চেষ্টা করব, আমার কথায় উঠব বলব না ।

কুমার বলে, ভবানীবাবুকে বলেছিল ? রাজী হয়েছেন ?

: আজ বলব । রাজী করাব ।

তার আত্ম-বিশ্বাসের চরম বহরটা কুমারের অন্তত ও অস্বাভাবিক  
মনে হয় । কাল চিহ্ন ছিল না—রাতারাতি তার এমন আত্মপ্রত্যয় গজিয়ে  
উঠল !

: ঠিনি মানবেন ?

: মানবেন ।

সমরেশ একটা বিড়ি ধরিয়ে আবার বলে, তবে মামা যদি তোকে অস্ত  
পোটে নিতে চায়, আমি কোন আপত্তি করব না ।

হাতে লেখা স্টেটমেন্টটা টাইপ করতে করতে কুমার মুখ না তুলে বলে,  
তোর জন্তে ব্যবস্থা হলে তবে তো আমার অস্ত চাকরী ।

: না, মামা তোকে স্পেশাল চাকরী দেবে । তোর কাজ খুব পছন্দ



হয়েছে। সেইজন্তেই তো স্টেটমেন্ট তৈরী করে দিতে আপত্তি করলাম না।

: আপত্তি করবি মানে ?

: করতাম—তোমার খাতিরে করলাম না। বলেছে যখন, স্টেটমেন্টটা তৈরী কর—খুসী হবে। আমি কি করছি না করছি তার সঙ্গে মামা তোকে জড়াবে না—আরেকটু বেশী মাইনের ভাল কাজে লাগাবে। মাইনে কিছু বেশী দেবে, শুধু খাটিয়ে ছাড়বে না কিন্তু, দায় চাপাবে, দায় মানিয়ে ছাড়বে।

: খাটা বুঝি দায় মানা নয় ?

: খাটার দায় নয়, খাটানোর দায়। নিজে খাটবি, সেই সঙ্গে অন্ততঃ খাটানোর দায়ও খানিকটা মেনে চলবি, ভালভাবে যদি কাজ করতে পারিস—তম্ব তম্ব করে মামা তোমার উন্নতি করে দেবে। ছ'চার বছর পরে হয়তো দেখবি তোকে মোটেই খাটতে হচ্ছে না, বারা খাটছে তাদের ভাল রকম খাটিয়ে নেবার বুদ্ধি খাটবাব জন্ত মাসে হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছিল !

কুমার হাত শুটিয়ে বলে, সেটা বুঝি খাটুনি নয় ? খাটুনের বেশী খাটানোর জন্ত বুদ্ধি খাটানোটা ? ওটা চল্‌তি হিসাবে নয় তা আমি জানি—মাসে হাজার টাকা মাইনে কেন, খাটুয়েদের রক্ত শুবে ছ'চার বছরে লাখপতি হবার কায়দা আমিও জানি।

: মোটেই জানিস না। জানলে কায়দাটা খাটাস না কেন ? কেন এরকম খেটে মরিস ?

: ও কায়দায় লাখপতি হয়ে লাভ নেই জেনেছি বলে। লাখপতিদের অহুমোদন ছাড়া আর জগতে কাবো সাধ্য আছে নিজের খুসীমত লাখপতি হয় ? লাখপতিবা বিপাকে পড়েই বিশেষ বিশেষ দশ বিশ জনের লাখপতি হবার আকাজকা মেনে নেয়। কায়দা করে বেশীর ভাগকে কাবু করে বাধ্য হয়ে ছ'চার জনকে লাখপতি হতে দেয়।

সমরেশ বলে, ঠিক, সত্যি কথা। আমিও এসব মনেপ্রাণে বুঝি—বোঝাটা কাজের বেলা কাজে লাগে না সেটাই হয়েছে মুন্সিল। একবার উঠে

পড়ে লেগে দেখি কিছু করতে পারি কিনা। না পারলে নয় মরব। আসল দায় তো ঝাড়ে নেই।

: আসল দায় ?

: বিয়ে তো করি নি—বৌ ছেলেমেয়েদের দায় নেই।

: তাই বল। তুই ধাঁধায় কথা কইতে ভালবাসিস। আমিও তো বিয়ে করি নি—আমারও তবে আসল কোন দায় নেই। কথাটার মানে কিন্তু আমি একদম বুঝলাম না। দায় হল দায়—তার আবার আসল আর নকল কি ?

প্রেসটা যাতে তুলে না দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে সমরেশ অণিমার কাছে যায় না, সোজাসুজি ভবানীর কাছে দরবার করতে যায়।

সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি প্রেস তুলে দেবার কথা ভাবছ মামা ?

ভবানী একমুহূর্ত ভেবে বলে, ভাবছি তো, ওটা রেখে আর লাভ কি হবে ?  
তোর জন্ত অজ্ঞ কি ব্যবস্থা করা যায় তাও ভাবছি।

সমরেশ জোরের সঙ্গে বলে, আর কিছুদিন টাইম দাও—আমাকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চালাতে দাও। কোন ব্যাপারে তুমি কোন কথা বলবে না—কোন পরামর্শ পর্যন্ত দেবে না। আমি যা করব তাই সহ।

ভবানী একটু আশ্চর্য হয়েই তার দিকে তাকায়।

তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, দু'মাস আমি তোর প্রেসের ব্যাপারে কিছুই বলি নি। আমার অত খেয়ালী ভাবিস না। আমিও ওটা ভেবেছি—আমার কথা শুনে চলার জন্ত হয় তো কিছু করতে পারছিস না। দু'মাস তাই তোকে স্বাধীনভাবে চলতে দিয়েছি। কুমারের কাছে স্টেটমেন্টও চেয়েছি এই জন্ত। আগের সঙ্গে মিলিয়ে হিসাব করে দেখব এই দু'মাসে কতটা তফাৎ হয়েছে, সামান্য হলোও তুই কিছু করতে পেরেছিস কিনা—

সমরেশ রেগে গিয়ে বাধা দিয়ে বলে, একথাটা জানিয়ে দিলে হত না

আমাকে ? এ দু'মাস স্বাধীনভাবে আমি কিছুই করি নি, তুমি যেমন যেমন বলেছিলে তারই জের টেনে এসেছি ।

তাকে এমনভাবে রেগে উঠতে দেখে ভবানী আবার আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ।

সমরেশ খাতস্থ হয়ে বলে, আমায় কিছু না জানিয়ে দু'মাসের স্বাধীনতা দিয়েছ, আমায় জানিয়ে ছ'মাসের স্বাধীনতা দাও—প্রেস আর পাবলিশিংএর ব্যাপারে দু'এক মাসে কিছু বোঝা যায় না ।

: ছ'মাসে তুই কি করবি ?

: লাভ না দেখাতে পারি—প্রেসটাকে সেল্ফ সাপোর্টিং করে দেব । যে বই হয়েছে সে হিসাব ধরতে পারবে না । আমি যাচাই করে বাছাই করে যে বই ছাপব শুধু সে বই-এর বিক্রি থেকে হিসাব কষবে লোকসান ম্যাবে না লাভ হবে ।

: বই-এর হিসাবটা কি ভাবে কষব ? বই তো প্রেসেই ছাপা হবে । কাগজ আর অন্ত খরচ নয় প্রেসের হিসাবে ধরব না—ছাপার খরচের হিসাব তো ধরতে হবে ?

সমরেশ হেসে বলে, সে কথাই তো বলছি মামা—প্রেস আর বইয়ের ব্যবসার ব্যাপার তুমি একদম বোঝ না ! প্রেসে বই ক্রেডিটে ছাপা হবে, কিন্তু বইটাও তো প্রেসের ? বই মার খেলে প্রেসের লোকসান, বই চললে লাভ । একটা বই বাজারে ছাড়ার পর দু'তিন মাসের বিক্রি থেকেই বোঝা যায় মার খাবে না লাভ দেবে । প্রেসের সেল্ফ সাপোর্টিং হবার হিসাবটা ওই হিসাবে কষবে ।

ভবানী অনেকক্ষণ সিগারেট টানে, অনেকক্ষণ ভাবে । বার বার সমরেশের মুখের দিকে তাকায় ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, পারবি তো ?

: পারব ।

ভবানী ভয়ানক রকম গম্ভীর হয়ে বলে, বেশ, আরও ছ'মাস আমি টানব।  
আবার একটা নতুন ব্যবস্থা করার চেয়ে এটা অনেক ভাল। একটা কথা  
কিন্তু তোমায় দিতে হবে—যদি না পার, আমার আর জ্বালাতন করবে না।

: নিশ্চয় না।

: ছোটমামীর কাছে গিয়ে কাঁদুনি গেয়ে মন ভুলিয়ে আমার আর  
কোনরকম ঝন্ঝাটে ফেলবে না।

: নিশ্চয় না। ছোট মামীর কাছে তো আমি যাইনি? ছোট মামীকে  
তো কিছুই বলিনি? ভেবে চিন্তে আমি সবাসবি তোমার কাছে এসেছি।

ভবানী ভেবে চিন্তে বলে, তুই বরং নিজেই গিয়ে ছোট মামীকে জানিয়ে  
আয় যে আমি তোকে আরও ছ'মাস টাইম দিয়েছি—সব বিষয়ে তোকে  
স্বাধীনতা দিয়েছে। তোর ব্যাপার নিয়ে বড় বেগী জ্বালাতন করছে আমাকে।

কান লাল হয়ে যায় সমবেশের।

ভবানী হঠাৎ থেমে যায়। আধ পোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে  
টেলিফোনের নামান রিসিভারটা যথাস্থানে বসিয়ে আরেকটা নতুন সিগারেট  
ধরিয়ে সে বলে, তাই ভাল, তুই নিজে গিয়ে জানিয়ে আয় নতুন ব্যবস্থার কথা।

: তুমি কখন বাড়ি ফিরবে মামা?

: আমি? দশটা এগারোটা বাজতে পারে—বাড়ি নাও ফিরতে পারি।

তুই কি বুঝি আমার কত ঝন্ঝাট!

ছ'মাসের মধ্যে অচল প্রেসটাকে চালু করতে হবে।

ভবানী এত সহজে যে তাব প্রস্তাবে রাজী হবে সমরেশ তা কল্পনাও করতে  
পারে নি।

সে ধরেই রেখেছিল যে ছোট মামার সঙ্গে বিষম একটা লড়াই হয়ে যাবে।  
এত সহজে বোঝাপড়া হয়ে যাওয়ার তার নিজের মনটাই যেন খুঁত খুঁত করে।

কে জানে কি মতলব এঁটেছে ছোট মামা!

করেকমিনের মধ্যে অগ্নিমার কাছে যাবে না স্থির করেছিল। প্রেসে ফিরে গিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে বিকাল হয়, প্রেসের কাজ শেষে যায়, কুমার তার স্টেটমেন্ট লেখা শেষ করে ভবানীর কাছে দাখিল করতে, বেরিয়ে যাওয়ায় পর প্রেসের শূন্যতাই যেন তাকে ঠেলে রাস্তার বার করে দেয়।

বোঝাই বাসের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে সে রওনা দেয় ছোট মামার বাড়ির দিকে।

অগ্নিমাকে সব জানিয়ে রাখাই ভাল।

কে জানে কি হয়।

সদর গেট বন্ধ ছিল।

বাড়ির মালিক একমাত্র ভবানী ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়ার হুকুম নেই—হোক সে রাজা অথবা মন্ত্রী।

সমরেশ গর্জন করে ধমক দিতেই ভুবনের মা বেরিয়ে এসে দারোয়ানকে গেট খুলে দিতে বলে।

সমরেশকে বলে, আপনার আসা যাওয়া বারণ নেই। কি ধমকটাই সেদিন খেয়েছিলাম আপনাকে ছুপুরে আসতে বারণ করে। শোয়ার ঘরেই আছেন।

দয়জা খোলাই ছিল।

বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে সমরেশ বলে, আমি সমরেশ, একটা কথা বলতে এসেছি। ভেতরে আসব ?

: এসো।

অগ্নিমার গলার আওয়াজটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে সমরেশের কানে!

ঘরে ঢুকেই সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

খাটের মাথার দিকে পাশের দেয়াল বেঁবে বসানো টিপয়ের ওদিকে ছুঁটি চেয়ার। ওদিকের চেয়ারে বসে আছে অগ্নিমা। চোখে মুখে চেহারা

ইতিমধ্যেই স্ক্রুপ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এতক্ষণ সে খালি ঘরে কি কাণ্ড  
গালিয়ে আসছিল।

টিপয়ে ভবানীর প্রিয় দামী বোতল। একটা সোডার বোতল। দামী  
কাঁচের গেলাসে টল টল করছে রঙীন পানীয়।

: ভড়কে গেলে নাকি গো ভায়েবাবু? এসো, বোসো। কর্তা খেলে  
দাঘ নেই, গিন্নি খেলেই উত্তট ব্যাপার মনে হয়? দিদি বিষ ধরেছিল। আমি  
অত বোকা মেয়ে নই। একটা কিছু না ধরলে এ বাড়িতে কোন মতে বাঁচা  
যায় না হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়েছে তোমার মামা।

সমরেশ কথা কয় না। ছ' তিন পা এগিয়ে গিয়ে খাটের এদিকের শেষ  
প্রান্তে বসে শুধু একবার কাসে!

গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে ছ'হাতে এলোচুলের গোছা পিছনে ঠেলে  
দিয়ে অগ্নিমা বলে, অনেক ভেবে চিন্তে এটাই ধবলাম। একটা কোন নেশা  
না ধরে তোমার মামার ঘব করা সত্যি অসম্ভব। দিদি বড়ি খেত, আমি  
একদিন খেয়ে দেখেছি—সব দুঃখ কষ্ট ভোতা করে ভুলিয়ে দেয়, মনে হয়,  
আমার চেয়ে সুখী মেয়েলোক তো জগতে নেই।

: বাঁচার আনন্দ ভোঁতা করে দেয় না?

: দেয়। বৈঁচে আছি না মরে গেছি টের পাওয়া যায় না। তাই তো  
ওটা বাদ দিলাম।—তোমরা জ্যান্ত ষোয়ান মাছুষ, মাসী পিসী বৌদি মামী  
যেমন হোক একটা সম্পর্ক বজায় রেখে তো চলতে হবে তোমাদের সঙ্গে!  
তাই ভাবলাম, সতী সাধ্বী স্ত্রী হয়েই যখন জীবন কাটাও, স্বামীর নেশাটা  
ধরাই ভাল!

মুখে যেন খই ফুটছে অগ্নিমার। অগ্নিমা একটু হাসে।—দামী সভ্য নেশা।  
নিজে ঢের বেশী খায়, কাজেই আমার বলতে পারবে না কেন খাই।  
সোজাসুজি জবাব দেব—ভুমি খাও, মজা পাও, আমি তোমার স্ত্রী, তাই ভুমি  
বা খেয়ে মজা পাও, আমিও তাই খেয়ে একটু মজা পেতে চাই; স্বামী স্ত্রীতে

সব ব্যাপারে সমান সমান না হলে জমবে কেন ? এ হল নিরুপায়ের উপায়  
দেখছি অবস্থা বিশেষে জিনিষটা নেহাৎ মন্দ নয় ।

: মামা জানে ?

: জানে বৈকি । এ জিনিষ কি গোপন করে খাওয়া যায় ? তোমার  
মামার সামনেই তো খাই—তবে, মাঝে মাঝে খাই । রোজ খাই কিনা, কতটা  
খাই, ওসব খবর রাখে না ।

: মামা আপত্তি করে নি ?

: আপত্তি করবে কেন ? সভ্য সমাজে মেয়ে পুরুষ একত্র বসে খাওয়ার  
নিয়ম চালু আছে । আমি তো স্বামীর বাড়িতে বসে, একলা একটু খাই—বড়  
জোব স্বামীব সঙ্গে বসে খাই ।

অনিমা আবার মিষ্টি কবে একটু হাসে । কিন্তু হাসিটা তেমন মিষ্টি লাগে  
না সমরেশের কাছে । মুখেব একটা অবর্ণনীয় বিকৃত ভাবেব সঙ্গে হাসিটা  
যেন জড়িয়ে গিয়েছে ।

অনিমা বলে, আপত্তি কবে নি, একটা ওয়ার্নিং দিয়েছে । রোজ খেলে  
নেশা পেয়ে বসে, একটু একটু বেশী খাবার ঝাঁককে প্রত্নর দিলে সামলানো  
যায় না । বাডাবাড়ি কবলে চলবে না, সেটা কোনমতেই নাকি বরদাস্ত  
করবে না ।

প্রথমটা সমবেশেব মাথা ঘূবে গিয়েছিল । চোখের সামনে এই কল্পনাভীত  
ব্যাপার চলতে দেখে কয়েক বাব একথাও তাব মনে হয়েছিল যে বোধ হয় সে  
জগে নেই—খুব সম্ভব স্বপ্ন দেখছে, এখুনি ঘুম ভেঙে স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে ।

সমরেশ তাকে আরও কিছুকাল প্রেস চা'লিয়ে যাবার খবরটা জানায় কিন্তু  
চালাতে না পারলে অনিমাকে দিয়ে আর তাকে জ্বালাতন না করার যে সৰ্ত্ত  
ভবানী দিয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলে না । এ অবস্থায় অনিমাকে ওসব কথা  
বলার কোন মানে হয় না—ভবানী ফিবলে হয় তো ওই কথা নিয়েই কি  
বলবে কি করবে কে জানে !

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে সমরেশ একটু স্বস্তি বোধ করে। খাবার আনতে বলার জন্ত ভুবনের মাকে ডেকে পাঠাবার আগে অগ্নিমা গেলাস বোতল খাটের নীচে আড়ালে সরিয়ে রাখে।

ভুবনের মা চলে যাবার পব সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, ওরা টের পায় নি ?

অগ্নিমা বলে, সবাই টের পেয়েছে, তবে আমি যে নিজের ইচ্ছায় খাওয়া শুরু কবেছি, এটা ওরা জানে না। ওদেব ধারণা, তোমার মামার ইচ্ছাতেই আমি খাই। উপায় নেই করব কি।

সমরেশ বলে, তার মানেই তো পাড়ায় মামার বদনাম রটে গেছে।

অগ্নিমা মুখ বাঁকিয়ে বলে, ছেলেমানুষী কথা বলো না। পাড়ায় কত খুঁশাম তোমার মামার !

পরদিন নন্দিতার সঙ্গে দেখা হয়।

দেখা হয় প্রেসে। নন্দিতা আরেকটা ছোট বই শেষ করেছে, ছাপতে দেবার জন্ত একেবারে পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছে।

: তাই বল। এইজন্ত কিছুদিন তোমাব পাত্তা ছিল না।

: তাভাতাড়ি ছেপে বার কবে দিতে হবে। মনে হচ্ছে এ বইটা খুব ভাল হয়েছে—হিট করতে পারে।

সমবেশ পাকা প্রকাশকের মত হেসে বলে, হচ্ছে হচ্ছে, ওসব কথা হচ্ছে। এসেই কাজের কথা শুরু করলে কি ভাল লাগে? কত কি ব্যাপার ঘটছে চান্দিকে, আগে ওসব বিষয়ে কথা বলি এসো ?

: কি ব্যাপার ঘটছে চারিদিকে ?

: চারিদিকে মানে তোমার আমার জীবনে যা ঘটছে, আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের জীবনে যা ঘটছে।

নন্দিতার কেমন একটা বদমেজাজী ভাব—অস্থিরতার ভাব। শান্ত হয়ে



বসবার চেষ্টা করে কিন্তু শান্ত আর শান্ত যেন কিছুতেই হতে পারে না—  
বিচলিত অবস্থাটা আরন্তে আনতে পারে না।

কে জানে কি হয়েছে তার! শরীর ভাল নেই? মন ভাল নেই? নতুন  
কোন অঘটন ঘটেছে?

সমরেশ প্রায় নির্বিকারভাবেই জিজ্ঞাসা করে, মাঝে মাঝে ছোটমামার  
বাড়ি যাও বলেছিলে, তোমাদের নাকি ঝগড়া হয় নি, শুধু ছাড়াছাড়ি। ছোট-  
মামীর ব্যাপার স্থাপার কিছু লক্ষ্য করেছ?

নন্দিতা একটু রেগে বলে, জেনে শুনে কেন ধোঁচা দাঁও? জানো যে  
নিরুপায় হয়ে ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছি—

: কি ব্যবস্থা মেনে নিয়েছ?

নন্দিতা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, সত্যি জানো না? কিছু  
জেনেও জানো না বলার ধাত তোমার নেই জানি। বলতে লজ্জা করছে, তবু  
বলি। অগিমাকে ঘরে এনে মেতে গিয়েছিল তো মামুষটা, আমার জন্ত  
তেমন মাথা ব্যথা ছিল না। মাঝে মাঝে শুধু বলত, কেন এরকম করছ,  
এখানে এসেই থাকো না, অগিমা আছে তিন তলায়, তুমি থাকবে দোতলায়,  
গুগুগোল তো কিছুই নেই! আমি শুনতাম আর হাসতাম। অগিমার জন্ত  
ঝোঁকটা গত কয়েক মাস হল তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছিল—কপূর উড়ে  
যাওয়ার মত। কত নিন্দাই যে করত আমার কাছে। বুঝতে পারছ  
ব্যাপারটা?

: বুঝতে পারছি। কাল বিকালে গিয়েছিলাম, দেখে এলাম ছোট মামী  
মামার বোতলের মদ চালাচ্ছে। ওকে তো বিয়ে করেছিল রাগের মাথায়,  
তোমার ওপর ঝাল ঝাড়ার জন্ত। খুব মিষ্টি আর চালাক ছিল—তাই মেতে  
গিয়েছিল। শুধু মিষ্টি আর মেয়েলি চালাকি কদিন মামার মত লোকের ভাল  
জাগে বল?

নন্দিতা আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি না কাজে ভুবে আছ, হিমসিম খাচ্ছ,

। আসল ব্যাপার না জেনেও এসব ভূমি জানলে বুঝলে কি করে ? বেচারাকে  
। বাঁচাবার জন্ত কত চেষ্টা করলাম । কিছুতেই কিছু হয় না ।

: আসল ব্যাপার আমি আগে থেকেই সব জানি । ছোটমামা আসলে  
। তোমাকেই চায় । আগের মামীকে ভুলিয়ে দেবার সাধ্য কেবলমাত্র তোমার  
ছিল—নতুন মামীর সে ক্ষমতা নেই ।

। নন্দিতা সোজা হয়ে বসে বলে, তবে আর কেন ভূমিকা করছি, খোলাখুলি  
। বলেই ফেলি । অনেকদিন ধরে তোবামোদ করে ভয় দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে  
। ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল । যেই বুঝলো ওভাবে আমার  
ভেজানো যাবে না, অমনি স্তব পাণ্টে দিল । টাকার দরকার জানিয়ে চিঠি  
। পাঠাই—চেক পাঠায় না ।

: সমবেশ নীরবে চেষ্টে থাকে ।

: বেশ মিষ্টি করে চিঠি লিখে জানায় যে একটু অসুবিধা আছে, চাব  
পাঁচদিন পবে চেক পাঠাবে । ক’দিন অপেক্ষা কবে আমি গিয়ে তাগিদ দিই,  
একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ে বলে—ও হো, একেবারে ভুলে গেছলাম,  
কাজের চাপে মাথা কি ঠিক থাকে ? কাল পাঠিয়ে দেব । চেক কিন্তু পাঠাল  
না । মান খুইয়ে আবার গেলাম—বলল যে চেক তো সে ডাকে পাঠিয়ে  
দিয়েছে, ডাকের নিশ্চয় গোলমাল হয়েছে । ব্যাপারটা বুঝতে পারছ ? একটা  
সাদা খামে ভরে হাজার টাকার বিয়াবর চেক আমাকে পাঠিয়েছে—ঠিকমত  
পেয়ে গেছি । কতরকম অজুহাত দিয়েই যে ক’দিন ধরে আমায় নাচাচ্ছিল—

সময়শৈ ধৈর্ষ হারিয়ে বলে, আমি সব বুঝে গিয়েছি, আর ফেনিও না ।  
শেষ কথাটা বল ।

: বলছি ।

নন্দিতা খোঁপার ছ’তিনটে কাঁটা অকারণে টেনে বাব করে আবার বখা-  
স্থানেই শুঁজে দেয় । তার যে এত বড় একটা খোঁপা আছে এটা সময়শৈ  
আজ পর্বন্ত খেয়াল করে নি ।

মাথা কিন্তু নীচু করে না নন্দিতা । মাথা উচু রেখেই বলে, অনেক ঝগড়া-  
ঝাঁটি হল—

: আগে তো হয় নি ?

: আগে যে চাইলেই চেক দিত !

: ওঃ !

নন্দিতা বলে, দু'তিন মাস নাচিয়ে সোজামুজি প্রাণের কথাটা বলল যে  
হুগ্গায় অস্তুতঃ তিন দিন ওর বাড়ির দোতালার আমার দিনরাত কাটাতে হবে  
—নইলে আমার নামে এক পয়সার চেকও আর কাটবে না । আমি অগত্যা  
রাজী হয়ে গেলাম । বিয়ে করা স্বামী তো, দেহটার সামাজিক মালিক তো,  
হুগ্গায় তিনটে রাত চোখ কান বুজে সামলে জ্বমলে মানিয়ে দেব । উপায় কি,  
নইলে সত্যিই চেক পাব না ।

সমরেশ মুখ খুলতে যাচ্ছিল নন্দিতা আঙুল উচিয়ে তার মুখ বন্ধ করে বলে,  
চেক না পেলে কি বিপদ তুমি জান না । বলতে চাইছ তো অনেক কিছুই ।  
মার অল্পখটা সারে নি, চিকিৎসা চলেছে বলেই কোনরকমে ঠাড়া আছে—  
চিকিৎসা বন্ধ হলেই মা কাত হবে । বাবার চোখে কি যেন হয়েছে, অনেক  
পয়সা খরচ করলে সারতেও পারে, নইলে অন্ধ হয়ে যাবে । চোখ নষ্ট হওয়া  
মানেই বাবার চাকরী খতম । এদিকে আমার ছাপা হবে না ।—

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, ছোট মামী কিভাবে  
নিয়েছে ব্যাপারটা ?

: খুব খুসী হয়েছে । বলে, বাবা বাঁচলাম, হুগ্গায় তিনটে দিন তো ছুটি  
পাব, তোমার ওপর দিয়ে ঝনঝাট কেটে যাবে ।

নন্দিতা গম্ভীর হয়ে বলে, এটাও একটা বৃত্তি ধরতে পার আমার পক্ষে ।  
আমার আয়েকটা হিসাব—বেচারাকে খানিকটা রেহাই দিচ্ছি । ওকি  
সামলাতে পারে ? দিশেহারা হয়ে মদ খেতে শিখেছে । এমনি খুব চালাক  
চতুর কিন্তু আহরে মেয়ে, নরম মন । আমার গলা জড়িয়ে ধরে কি বললে

জানো ? দিদি, আমি কিন্তু একটু হিংসের ভাব দেখাব, একটু রাগা রাগি  
ঝগড়াঝাটি করব, সেটা যেন তুমি সত্যি ধরে নিও না। তুমি যেদিন এসে  
থাকবে, ওই অজুহাতে আমার কাছে বেশী ঘেঁষতে দেব না। সত্যি সত্যি  
ছুটি পাব।

সমরেশ বলে, তা হলেই সেরেছে !

: তার মানে !

: মানে তোমার নিজের বোঝা উচিত ছিল। তোমার বোধ হয় দোষ  
নেই, তোমাদের তো খালি ভাবের হিসাব। তুমি যেদিন গিয়ে থাকো  
মামার সেদিন খেয়াল থাকে সে তার তিন নম্বর আরেকটা বৌ আছে, তোমার  
একটা সতীন আছে ? তোমার নিয়েই মামা মেতে থাকে না ? তুমি গেলে  
মামা তো নিজেই চাইবে যে ছোট মামী ছুটি নিক, তোমাদের জ্বালাতন না  
করে চোখের আড়ালেই থাকুক।

নন্দিতা চুপ করে থাকে।

: এর বিপদটা বুঝতে পারছ না। ছোট মামী যখন টের পাবে যে ছুটিব  
জন্ত ওসব কলাকৌশলের কোন দরকার ছিল না, তোমায় পেলে মামা ওকে  
এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচে—তখন ওর মানসিক অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ?  
ভাব ঘুচে গিয়ে শত্রুতা আসবে। অশান্তির সীমা থাকবে না। তারপর ছোট  
মামী কি করবে তা অবশ্য আমি বলতে পারি না—কিন্তু ভয়ানক  
করবেই।

হঠাৎ কিছু বলার ক্ষমতা নন্দিতার ছিল না। কুমার প্রেসের কাজের  
বিষয়ে দরকারী কথা বলতে আসায় আরও কয়েক মিনিট সে চুপ করে বসে  
চিন্তা করার সুযোগ পায়।

কুমার চলে যাবার পর বলে, দেখি সামলাতে পারি কিনা। মস্ত একটা  
বিল্ডি দায় ঘাড়ে চাপল। যাক গে, দায় মানতেই হবে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে  
দিয়ে অনেক উপকার করলে।

সমরেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে, তোমার ভড়কে দিতে চাই নি। না বললেও চলত না। কিন্তু এত ভাবছ কেন? ছুশ্চিন্তাকে এত প্রাশ্রয় দিচ্ছ কেন? আতঙ্ক আর ছুশ্চিন্তা কলেরা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড—এসব অনেক রোগের চেয়ে বেশী মারাত্মক। আমি নিজের টের পেয়েছি। মরার বাড়ী গাল নেই কথটা সত্যি, ভারি খাঁটা কথা। এভাবে বাঁচার সুরোগ না যদি থাকে—এভাবে বাঁচার জন্ত লড়াই করার মধ্যে বাঁচার সুখ পাব। আমি বাঁচি কিম্বা আমার ছেলেমেয়েরা বাঁচে।

নন্দিতা বিরক্ত হয়ে বলে, চুপ করো। ওসব বড় বড় কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না।

সমরেশ বলে, চুপ করলাম। শুধু একটা আবেদন জানাতে চাই। সংক্ষেপে জানাব।

জবাবে নন্দিতা মুখে কোন কথা বলে না। স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সমরেশ বলে, মনটা আগের মত শক্ত কর না? কিছু না জেনে না বুঝেই আগে মনটা খেয়াল খুসীতে শক্ত করে নিষেছিলে,—অনেক কিছু জেনে বুঝে এবার মনটা শক্ত কর? ভাবের তেজটা এবার সত্যিকারের কাজের তেজে দাঁড় কবাও?

নন্দিতা বলে, চুপ কর। কখন চুপ করে থাকতে হয়, কখন কথা কইতে নেই, এটা তুমি দয়া করে শিখবে? ফাঁকা উপদেশ দেবার বোঁকাটা একটু সামলাবে? আমার কি মনে হচ্ছে জানো? আমার জীবনে মহা একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে এটা যেন তোমার কাছে মজা করে মাথা ঘামানোর মন্ত একটা সুরোগ।

সমরেশ বিব্রত হয় না, কাতর হয়ে মাপ চায় না, নম্র সুরে বলে, তা ঠিক। কাজে কিছু করতে পারব না, বড় বড় উপদেশ আর নীতি কথা শোনাব—এটা সত্যি আমার একটা বিশ্রী রকম দোষ।

নন্দিতা সহজভাবে বলে, দোষ মানুষের থাকবেই। কোন দোষ নেই শুধু গুণ আছে রক্ত মাংসের এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় না। গুণ বেশী না দোষ বেশী, গুণ আসল না দোষ আসল—এটাই মানুষের সত্যি বিচার।

নন্দিতা বিদায় নেবার পর সমরেশ কুমারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমাদের আলাপ আলোচনা কিছু কিছু শুনেছিল?

কুমার বলে, না। প্রেসের সবাই কান খাড়া করে থাকে কিন্তু আজ কাল তোরা খুব নীচু গলায় ফিস্ফাস্ কবে কথা বলিস। কিছু শোনা যায় না। তবে আন্দাজ করছি কথাবার্তার কেন্দ্র হলেন ভবানীবাবু। উনি আস্তে আস্তে নন্দিতাকে বাগে আনছেন, শান্তি দিচ্ছেন।

: শান্তি ?

: শান্তি বৈকি ! বিবাহিতা স্ত্রী, তাকে ঠিক যেন বাজারের ভাড়াটে মেয়েলোকের মত বাঁধা রেখে অপমান করেছেন। মেয়েলোকে রাঁধা রাখলে বাবু তার ঘরে যায়—নন্দিতাকে ভবানীবাবুর বাড়ি যেতে হচ্ছে। এব চেয়ে বারোমাস স্থায়ী ভাবে থাকা চের ভালো ছিল। এরকম অপমানের জালা সহিতে হত না।

সমরেশ গম্ভীর হয়ে বলে, তুই যে আমাকে আরেকদিক দিয়ে ভড়কে দিলি কুমার। আমি ছোট মামীর বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছিলাম—নতুন মামীকে পেলে মামা তাকে চায় না এটা টের পেলে ছোটমামী একটা কাণ্ড করে বসবে। তোর কথা শুনে ভাবছি, এই অপমানের জালা সয়ে চলতে নতুন মামীর মাথাটা না আগে বিগড়ে যায়, ভয়ানক কিছু বা করে বসে।

কুমার বলে, না, তা করবে না। ওর মার অসুখ, বাপের চোখের বামেলা, একটার পর একটা বই ছাপা হচ্ছে, নন্দিতা রাগ আর জালা চেপে মানিয়ে চলবে।

সমরেশ খানিকক্ষণ আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, সত্যি বলবি একটা কথা? আমাদের কথাবার্তা শুনিস্ নি?

কুমার মাথা নেড়ে বলে, একটা কথাও শুনিনি। নন্দিতাই আমার বলছিল ভবানীবাবুর ব্যবস্থাটা কেন ওকে মেনে নিতে হয়েছে।

: ও ! তাকেও সব বলেছে।

: নিজে থেকেই বলেছে। আমি জিজ্ঞাসাও করি নি।

কুমার মুখ তুলে চেয়ে চোখের ইসারায় তাকে বসতে বলে, সে বসলে চাপা গলায় বলে, নন্দিতা যে তোর কাছে আসছে, ফিস্ফাস অনেক কথাবার্তা কইছে—এ রিপোর্ট কিন্তু ঠিকমত পৌঁচছে, ভবানীবাবুর কাছে। নন্দিতা বিদ্রোহ করলেই এবার তাকে দাবী করবেন ! বলবেন যে তোর বুদ্ধি পরামর্শে বিগড়ে গেছে।

: করুক। আমি গ্রাহ্য করি না। মামাকে এবার আমি ব্যাপার টের পাইয়ে দেব।

: এটা হল ছেলেরাভবী জ্বালায় কথা। ভবানীবাবুকে ব্যাপার টের পাইয়ে দেবার ক্ষমতা তোর আছে ?

: আছে। আমি বিগড়ে গেলেই মামা জন্ম হয়ে যাবে। আগে নিজের সংসারটা সামলাব।

সত্য সত্যই সমরেশ আবার অসহ্য ছুৰ্ত্তোগের স্তরে ঠেলে দেয় তার মা, মাসী, খুড়ী, পিসী নিজের বোন আর মাসতুতো পিসতুতো খুড়তুতো ভাই-বোনদের বিরাট সংসারটাকে।

এবার সত্য সত্যই সে কঠোর হয়েছে।

নির্মম নির্ভুর হয়েছে।

সে যা বলবে, যেটুকু ব্যবস্থা করে দেবে, তাই হল চরম কথা। কারো নাশিশ, কারো আশ্বাস কানে তুলবে না।

নাশিশ বা আশ্বাস কানে শোনা পর্যন্ত বন্ধ করুক—বাড়ির মানুষের বিপদ আপদ অল্পখ বিপ্লব মরা বাঁচার ব্যাপারেও সে কি নির্বিকার হয়ে থাকবে ?

সুবর্ণের মেজ ছেলের একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। ডাক্তার এসে বলে গেছে যে হাসপাতালে পাঠালেই ভালো, বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করালেও দিনে রাতে অন্ততঃ তিনবার ডাক্তারকে এনে দেখাতে হবে তার অবস্থা, এমনি ইনজেকসন দিতেই হবে রোজ একটা কবে, দরকার হলে বাড়তি ইনজেকসনও দিতে হবে।

সুবর্ণ সমরেশের মেজ পিসীব মেজ মেয়ে। বাপ মা পাকিস্তানে আছে, কাকা দু'জন কলকাতায় এসে ডেরা বেঁধেছে সহরতলীব হাজার দশেক টাকা শ্রায্য মূল্যেব একটা একতলা বাড়ি পনেব হাজার টাকা নগদ মূল্য দিয়ে কিনে নিষে।

কি ভেবে কেন সুবর্ণ ওদের সঙ্গে পদ্মানদী পাড়ি দিয়েছিল কেউ জানে না।

তিনমাস কাটেনি। সে এসে মহিমের পা জড়িয়ে ধবে এ বাড়িতে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল।

তার নিজের আশ্রয়, একটা ছেলের আশ্রয় এবং তার স্বামী রণজিতের আশ্রয়।

তারপব সুবর্ণেব তিনটি ছেলেমেষে জন্মেছে।

রণজিত চাকরী করছে। সংসার খবচের জন্ত মহিমের হাতে সে মাসে পঁচিশটা টাকা ধরে দিত।

এখনো তাই দেয়। সমরেশের হাতে দেয়।

ছোট ভাই, কিন্তু ঠিকমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ছেলেব প্রাণ বাঁচাবার জন্ত সুবর্ণ সমরেশের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। সমরেশ একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, কেন মিছে সময় নষ্ট কচ্ছ দিদি? আমার হাতে একটা পয়সাও নেই। আমি কিছুই করতে পারব না।

সুবর্ণ মাথা তুলে আর্ত কণ্ঠে বলে, থোকন মরে যাবে? তুমি কিছুই করবে না?



সমরেশ বলে, আবার করার ক্ষমতা থাকলে কি করতাম না ? কি করব, আমার কিছু করার সাধ্য নেই। নিজের ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা রণজিতবাবুর করা উচিত নয় কি ?

সুবর্ণ মুখ তোলে। খোঁপা বাঁধে, এলোমেলো ভাবে বাঁধে।

বাড়ির মানুষ কেন, পাড়ার যত বাড়ির মানুষকে শোনানো সম্ভব তেমনিভাবে গলা আকাশে চড়িয়ে বলে, খোকন যদি বিনা চিকিৎসায় মরে আমরা তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব জন্মের মত।

সমরেশ শাস্তকণ্ঠে বলে, অনেকদিন আগেই তোমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিল। কত বেকার পথে নেমেছে—হাজার হাজার। রণজিত তো চাকরী করছে।

: ছাই চাকরী করছে। নিজের হাত খরচ চলে না।

: নিজের হাত খরচ কমিয়ে এবার থেকে তোমাদের খরচ চালাবে। পারলে আমি চালিয়ে যেতাম, একটি কথা বলতাম না, কিন্তু আমার ক্ষমতা নেই, করব কি ?

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মারা যায় সুবর্ণের মেজ ছেলে। সুবর্ণের গগনফাটা আর্ত মড়া-কান্নার সঙ্গে মিশে থাকে সমরেশকে তার ছেলের মরণের জ্ঞান দায়ী করে তাকে অকণ্ঠে অভিসম্পাত দিয়ে চলা।

অনেক রাত্রে সমরেশ বাড়ি ফেরার পর তার গলা আরও চড়ে যায়, অভিশাপ যেন আরও বেশী ববম বীভৎস হয়ে হয়ে ওঠে।

সমরেশ নিবিকারভাবে নিত্যবৃত্ত্য সারে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মনে যেন কারো জ্ঞান মমতাও নেই, বিরাগও নেই।

খেতে বসে শুধু যেন এইজ্ঞ যে মানুষের অন্তর্গত প্রাণ, না খেয়ে মানুষের বাঁচার সাধ্য নেই।

বাঁচতে হলে খেতে হবে।

না খেলে মৃত্যু।

অনশন মানেই আত্মহত্যা।

আজ রাত্রে ভাত হয়নি, সকলের জন্ত রুটির ব্যবস্থা হয়েছে। গরীবের প্রাণ বাঁচানো এই রুটি সমরেশের কাছে খুব দামী খাজ—খেতে যতই খারাপ লাগুক। নিজে চোখে দেখে লাল বা সাদা গম কিনে নিজে গিয়ে কিছা নিজের লোককে পাঠিয়ে চোখের সামনে সেই গম ভাজিয়ে এনে ঘরে তৈরী রুটি খেতে ভাল না লাগলেও কতখানি মানসিক স্বস্তি যে মেলে—সামনে দোয়ানো দুধের মত অন্ততঃ একটা নির্ভেজাল খাওয়া পেটে যাচ্ছে!

তরীতরকারীতে পর্যন্ত কি যে ভেজাল চলছে।

ওষুধে ভেজাল, ঘি-এ ভেজাল, মাখনে ভেজাল, দুধে ভেজাল, তেল থেকে শুরু করে সাগুবালি এমন কি পান খাবার উপাদান খয়ের টুকুতে পর্যন্ত ভেজাল—তার একটা মানে হয়।

ওসবে ভেজাল চালানো সম্ভব, বাঁকা বুদ্ধি খাটিয়ে কাষদা কাছন খাটালেই হল। অবিকল খয়েরের মত দেখতে হলে এবং খেতেও একটু কষা লাগলে, কে টের পাবে যে ওটা খয়ের নয়—সস্তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী করা গজামাটির সন্দেশ? কিন্তু গাছে ফলানো তরকারীতে ভেজাল?

টাটকা দেখে ছুঁসের পটোল কিনে নিয়ে আসে সমরেশ!

সরশ নিটোল সবুজ পটোলগুলি এক রাত্রি তরকারীর ঝুড়িতে কাটিয়েহ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়, বারধক্যের ও রুগ্নতার কটা চোকলার অবস্থা পায়।

প্রগতি একটু মুচকে হেসে বলে, কদিনের জলে ভেজানো পটোল কে জানে! দেখে চিনতে পার না দাদা?

কী সুন্দর চেহারা আলুগুলির। কাটার সময় অনেকগুলি ফেলনা যায়। বাইরে ঠিক আছে, ভেতরে পচা, একটা তুলে দিয়ে দিলে আলুর গন্ধে খাওয়া যায় না তরকারী।

ভবু খেতে হয়।

পেটে জ্বলছে আগুন।

ভেজালেই সে আগুন শান্ত হোক !

প্রণতি তিনদিন বাড়ি ছিল না ।

বাড়িতে হৈ চৈ চলেছে তিনদিন । চৌচামেচি হা-হুতাশ আর জল্পনা-কল্পনা  
অবধি থাকে নি ।

কান পেতে সব শুনেছে সমরেশ ।

কিন্তু সামনা সামনি তাকে কেউ কিছু বলতে গেলে কথা কানে না তুলেই  
রেগে আগুন হয়ে বলেছে, শুনব'খন শুনব'খন—প্রণতি বাড়ি ফেরেনি ? বেশ  
করেছে, যে বাড়িই তোরা করেছিস !

বাড়িতে রাগারাগি করে, বাইরে মোটা টাকার কাজের জন্ত জানা চেনা  
বড় মানুষদের বিরক্ত এবং বিব্রত করে ।

এদিকে সস্তা বই ছাপে ।

পঞ্চাশ ষাট টাকায় কপি রাইট কেনা নোংরা প্রেমের বই আর গোয়েন্দা  
কাহিনীর বই ছাপে—

নাম করা লেখকের গোয়েন্দা কাহিনী যথেষ্ট রোমাঞ্চকর না হলে ভাড়া  
করা কোন লেখককে দিবে রোমাঞ্চকর প্রাণান্তকর প্রেমের মশলা তাতে যোগ  
করে দেয় ।

বড়ই ব্যস্ত সমরেশ আজকাল ।

যার কাছ থেকে নগদ বা ভবিষ্যৎ কোন লাভের আশা নেই তাদের সঙ্গে  
দেখা করলেও হু'এক মিনিটের বেশী কথা কয় না—চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে  
প্রেসের কাজ তদারক করে কিনা বই বিক্রির হিসাব দেখতে বসে একরকম  
স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেয় যে আর তার কথা বলার ইচ্ছা বা অবসর নেই ।

বাড়িতে বাজার খরচ খায-খরচ ছাঁটাই করেছে নির্মমভাবে—প্রায়  
পাগলের মত ।

হুধ—নাম মাত্র, শিশুদেরও কুলোয় না ।

চাল আর আটা এমন হিসাবে আসে যে কয়েকজন পেটভরে খেলে বাকী সকলের উপোস দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না ।

তরীতরকারী—গুধু শাকপাতা আনে । এতগুলি মাছের জন্ত আধ সের ‘আলু, দেড় পো’ পটোল, এক পো’ ঝিঙা বেগুন আনার কোন মানে হয় ?

নালিশে নালিশে পাগল করে দিতে চায় তাবা, যারা মাছ তরকারী কেটে-কুটে স্বামীবান্না করে, সকলকে খেতে দেয় ।

সমরেশব মাথা গুলিয়ে যায় ।

চীংকার করে সে বলে, বেশ কাল থেকে সব বন্ধ । ছ’একদিন উপোস দিলে তোমরা বুঝতে পাববে তোমাদের জন্ত কত করছি ।

স্নানীতি উঠে দাঁড়ায় !—ঘন ঘন হাত নেড়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজে বলে, আমরা কি তোমার ভাতেব কাঙাল ? কাল থেকে উছন ধরবে না এ বাড়িতে—ভিক্ষার ভাত ডাল রান্না হবে না ।

প্রীতি থাকলে কি বলত কে জানে ।

গঙ্গা পিসী বেগে বলে, ক’জনকে কতকাল কত ডাল-ভাত রেঁধে খাইয়েছিস তুই—বলতো শুনি একবাব ? ইয়ার্কি না মাবলেই হয় না ? বেচারী কতভাবে প্রাণপাত করছে সেটা তোরা কেউ বুঝবি না, ওকেই কেবল দোষাবি ।

সমবেশ ঝেঁঝেঁ বলে, পিসী চুপ কর ।

গঙ্গাপিসী বুকে হাত গুটিয়ে আধ শোয়া অবস্থায় দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজবাব আগে বলে, আচ্ছা বেশ চুপ করলাম । তুই যেন হৈ হৈ বাধিয়ে আমার ঝিমটা ভেঙ্গে দিস না সমু, দিস না ।

সে গুরু করেছে প্রাণশক্তির অব্যয় ব্যবহাব—আপনজনের প্রাণ বাঁচানোর ব্যয় সামলাতে প্রাণান্ত হচ্ছে ।

এমন কুৎসিত হয়ে গেল জীবনটা ?

ঘরে এবং বাইরে ?

ছ'মাসে ছাপাখানা চালান এবং বই ছাপানো থেকে লাভ দেখাতে পারে নি কিন্তু আগামী লাভের এমন গুচনাই সৃষ্টি করে যে খুসীর সীমা থাকে না ভবানীর ।

ছ'মাস সে স্বাধীনভাবেই সব কিছু চালাতে দিয়েছে সমরেশকে—সমরেশ মাঝে মাঝে এসে আরও টাকার দাবী জানালে নীরবে চেক সহ করে দিয়েছে ।

সমরেশ ভাবে, এটা বোধ হয় অগ্নিমা আর নন্দিতার ডবল চাপের ফল ।

ছ'জনের কাছেই সে নিয়মিত ভাবে যায় । ছ'জনকেই খুসী রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায় ।

সে অবশ্য বছর দু'ষেকের মধ্যে জানতে পারে নি যে ভবানী তার পাগলের মত উঠে পড়ে কাজে লাগা থেকে ছাপার কাজ, বই ছাপা, বই বিক্রির ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত খবর বরাবর জেনে এসেছে ।

অগ্নিমা হঠাৎ কেন বাপের বাড়ি চলে যায় কেউ বুঝতে পারে না ।

ভুবনের মা বার বার বলে, বাবা রে বাবা, কী রকম যে ছটফট করছিল কদিন ধরে, রাতে ঘুম নেই, দুপুরে একটু শোয়া নেই—নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, খালি ঘরে বাইরে করে বেড়ানো । বাবুর নতুন আস্ত বোতলটা ছ'দিনে কাবার করেছে, দুপুর রাতে ডবল দাম দিয়ে বাবুকে ফের বোতল আনতে হল । মোকে ডেকে ডেকে কতবার যে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ ভুবনের মা, মদ নাকি বিষ, বেশী করে খেলে মরব না ?

নন্দিতা রেগে বলে, ভুবনের মা, আমার জা-এর ব্যাপার তুমি আমার চেয়ে ভাল বোঝ ? মুখটা একটু বন্ধ রাখলে দোষ কি ? না জেনে না বুঝে বকু বকু কর কেন ? তিনটে মদের বোতল ছিল, ছোট বোঁ তিনটে বোতল মেঝেতে আছড়ে ভেঙ্গে বাপের বাড়ি গেছে । ঘরটা সাফ করেছি আমি—আমি জানি । নগদ নগদ মরতে হলে যে মদের বিবে কুলোয় না, আসল বিষ খেতে হয়—এটুকু বুদ্ধি ছোট গিন্নির ছিল । ওর নামে এরকম মিছে বদনাম রটিয়ে বেড়ালে তোমায় কিন্তু আমি বাছা তাড়িয়ে দেব ।

ভুবনের মা মাথা নীচু করে আড়ালে বাবার পর এক চুমুকে গ্লাস খালি করে বলে, মদ কিন্তু সত্যি সত্যি অতিরিক্ত পরিমাণে খেয়েছিল। আগের দিন বোতল খুলেছিলাম, পরদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দেখি—বোতল একদম খালি।

নন্দিতা বলে, বেশ তো, সেটা তুমি বুঝবে আমি বুঝব—ভুবনের মা পাড়ায় আকাশ ফাটিয়ে বেড়াবে কেন? ওর এত মাথা ব্যথার তো কোন দরকার নেই?

: ভড়কে গেছে।

: ভড়কে গিয়ে থাকে ঘরের ভাত বেশী করে থাক। ও কি জানে, বেচারাকে ছোটোদিন সামলে নিতে দিয়েই তুমি আমি দুজনে গিয়ে হাজির হব ওকে ফিরিয়ে আনতে?

ভবানী নতুন কেনা বোতলটা আলমারি থেকে বার করে আনলে নন্দিতা যেন তার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নেয়—ছিপি খুলে গেলাসে ডবল পেগ ঢেলে দিয়ে বলে, কেন খাও? এ জিনিষটা খেয়েই তুমি গোপ্পায় যাচ্ছ টের পাচ্ছ না?

:.টের পাই না? কী করব বল। গোপ্পা-পছী মাছুষগুলির সঙ্গে আমার কারবার।

সমরেশ জানে আরও কিছু টাকা ঢালতেই হবে জেনে সে মরিয়া হয়েও সসঙ্কোচে ভবানীর কাছে দরবার করতে গেলেও ভবানী নীরবে চেক কেটে দেবে।

ভবানী যে তার কারবারের পাই-পয়সার হিসাব রাখে, কিভাবে কাজ চলছে এবং কিভাবে আদায় পত্র হচ্ছে সব খবর রাখে—এটা জানা না থাকায় বছর কাবার হবার মাস তিনেক পরে সমরেশ একদিন গিয়ে হাসিমুখে জানায়, তোমার বিশ্বাস রাখতে পেরেছি মামা। নীচু লাভ করেছি সাড়ে এগার শো টাকা।

ভবানী বলে, বেশ তো, বেশ তো—এই তো চাই! আরেকটা যুদ্ধ লাগবেই মনে হচ্ছে। কোরিয়ার আগুন সহজে নিভবে মনে হয় না। শান্তি শান্তি করে অনেকে চেঁচাচ্ছে বটে কিন্তু আমেরিকা কি ছেড়ে কথা কইবে! এখন থেকে তৈরী থাক। দু' এক বছরে শেষ হবে না যুদ্ধ। এমনভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে যদি চালাতে পারিস—যুদ্ধের বাজারে লাখ টাকা হেসে খেলে কামাতে পারবি।

: তুমিও তৈরী হচ্ছে নাকি ?

: তৈরী হচ্ছে না ? এত বড় বড় এতগুলো কারবারের দায় নিয়ে আমিও কি কম মুকিলে পড়েছি রে ! ভাগ্যে যুদ্ধটা লাগবে !

সমরেশের মনে পড়ে যে বনমালীও কারবার সামলাতে জীবন পাত করতে নেমেও আসল ভরসা খাড়া করেছিল যুদ্ধ।

গত যুদ্ধ তবে চারিদিকে মানুষের হৃদশা বাড়িয়ে দিয়ে গেল কেন ? কেমন করে, কোন নিয়মে ?

মানুষের অবস্থা ভাল থাকা মন্দ থাকার সঙ্গে তার বাপের কারবারটার সোজাসুজি যোগাযোগ ছিল বলে প্রথম দিকে প্রচুর লাভ বাগিয়েও যুদ্ধ শেষ হবার আগেই কেন সূচনা দেখা গেল—কয়েক বছরের মধ্যেই সর্বনাশ হয়ে যাবে ?

ইস, তখন যদি কারবারটা গুটিয়ে নিত তার বাবা !

অন্ধের মত বনমালী যদি টাকা ঢেলে ঢেলে কারবারটা বাঁচিয়ে রাখায় চেষ্টা না করত আরেকটা যুদ্ধ বাধবার আশায় !

যে টাকা জমেছিল, বিনা কারবারে বিনা আয়ে কয়েক বছর এত বড় সংসারটাকে ভাল ভাবে থাইয়ে পরিয়ে গেলেও একলাখ দেড়লাখ মজুত বাপ এবং বনমালী গত হবার পর।

ভবানীও আরেক যুদ্ধের আশায় আছে। কিন্তু বনমালীকে সে তো ঠিক পরামর্শই দিয়েছিল—কারবার খতম করে ফেলাই ভাল।

বনমালী তখন কারবার খতম করতে রাজী হলে অনেক কম দুঃখবহা  
হত তার ।

কিন্তু আরেকটা যুদ্ধের ভরসা সফল করতে সমরেশ সাহস পায় না ।  
বনমালীর যুদ্ধ বিকার তার কাছে হাস্তকর মনে হয়েছিল ।

ভবানীর যুদ্ধের ভরসা তার কাছে বিপজ্জনক মনে হয় ।

যুদ্ধ না বাধলে ভবানী হয় তো নিজেকে বাঁচানোর জন্ত আরও অনেকের  
সঙ্গে তাকেও গ্রাস করবে ।

কিন্তু স্বাধীন ভাবে হলেও এভাবে ছাপাখানা ও বই-এর ব্যবসাও তো  
সে চালিয়ে যেতে পারবে না ।

সারা বছরের প্রাণপাত খাটুনি আর ছোটলোকামির বিনিময়ে সে নীট  
লাভ করেছে সাড়ে এগাব শ' টাকা ।

মাইনে মাগ্গী ভাতা মিলিয়ে একশ' টাকার সামান্য কেরানীগিরি করলেও  
তার মোট আয় হত বার শো টাকা ।

সাড়ে এগারশো টাকার জন্ত ঘরে বাইরে ঘুণা বিতৃষ্ণা বিদ্বেষের কি  
বিবাক্ত পবিত্রেশই সৃষ্টি করেছে শুধু মাত্র একটি বছরের অধ্যবসায়ের !

আপন পর প্রায় সকলেই তাকে অমানুষ বলে জেনে গিয়েছে, চিনে  
গিয়েছে ।

হু'একজন ছাড়া মুখের ওপব সেটা অবশ্য কেউ জানায় না । কিন্তু  
তার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি তো একেবারে লোপ পায় নি—ওটুকু বুঝতে তার  
অসুবিধা হয় না ।

সে তো বুঝতে পারে তার সঙ্গে সকলের কথাবার্তা আচার ব্যবহার  
মেলামেশা কী ভাবে একেবারে পাল্টে গেছে । সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক  
অন্তরকম হয়ে গেছে ।

সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে—তার জন্ত অনেকের যে খাটি দরদ ছিল,  
সে দরদ শুকিয়ে শেষ হয়ে যেতে বসেছে ।



উনানে দুধ চাপিয়ে আল দিতে দিতে সেটা কীর হয়ে যায়।

অনেকের প্রাণের কড়ায়ে রেহ মায়া বজ্রধ্বের জীবনামৃত ঘন কীর হয়ে পোড়া লেগে নষ্ট হয়ে গেছে।

এভাবে বেঁচে থাকার অর্থ হয় না।

অথচ এত বড় সংসারের এতগুলি নিরুপায় মানুষকে বাঁচার জন্ত জীবন পাত চেঁচা না করারও কোন অর্থ হয় না।

বাঁচার মানে তবে কি ?

এভাবে ছাপাখানা আর বই ছাপানোর ব্যবসা চালিয়ে লাখপতি হতে পারলেই কি সে মনে করতে পারবে জীবনটা তার সার্থক হবে ?

শরৎকালীন সার্বজনীন পূজার দিন এসে গেছে।

ষষ্ঠীর দিন প্রেস আর বই ছাপানো বিভাগের সকলে তাকে বিয়ে দাঁড়ানোর তার মাথাটা প্রায় খারাপ হয়ে যেতে বসেছিল।

কে জানে কি কাণ্ড করত ! নন্দিতা সামনে ছিল। সমরেশকে পিছনে ঠেলে দিবে সামনে এগিয়ে নন্দিতা মিষ্টি স্বরে বলে, ওদের কথা দিই যে আজ অর্ধেক দিন কাজ করে ফিরে যাবার সময় মাইনে বোনাস সব কিছু নিয়ে যাবে, ক’দিন ছুটি জেনে যাবে ? বলব ? তুমি একবার হুকুম দিলেই আমি ওদের বুঝিয়ে বলতে পারি, ঠাণ্ডা করে দিতে পারি।

সমরেশ বিমিয়ে গিয়ে বলে, বলো। তোমরাও যখন ওদের পক্ষ নিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছে—আমার আর কি বলার আছে, কি করার আছে !

নন্দিতার ঘোষণা শুনে সকলে শান্তভাবে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে কাজ আরম্ভ করলে নন্দিতা বলে, এমন মন হয়ে গেছে তোমার ? ওরা গরীব মানুষ, পূজার আগে টাকা না পেলে ওদের পূজার আনন্দ মাটি হয়ে যাবে—তুমি ওদের মাইনে বোনাস আটকে দেবার মতলব করেছ ! তোমার একবার খেয়ালও হল না যে সে দিনকাল আর নেই, ওরা নিজেদের অধিকার বুঝতে শিখেছে, দাবী দাওয়া আদায় করতে শিখেছে !

সমরেশ গোমড়া মুখে বলে, আমার দিকটাও তো ওদের দেখতে হবে ? চারটে পাঁচ মোটা টাকা আটকে দিয়েছে। আমি ওদের বলেছিলাম, টাকা আদায় হলেই ওদের পাওনা মিটিয়ে দেব।

নন্দিতা ঝাঁঝালো হাসি হেসে বলে, তোমার পাওনা তুমি আদায় করতে পারবে না, সেজন্য ওদের ভুগতে হবে ? তোমার তো অল্প বিচার ! তুমি না সাড়ে এগার'শ টাকা নীট লাভ করেছিলে ? লাভ থেকে ওদের পাওনা মিটিয়ে দাও, দরকার হলে মামার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে এসো ! ও-তো সব ডুবিয়ে দিতে বসেছিল, তুমিই বুদ্ধি খাটিয়ে খেটে খুটে দাঁড় করিয়েছ। কত কিছু আশা করেছ—পুজোর পরেই আরও টাকা ঢেলে সব দশগুণ বাড়িয়ে দেবে।

: পুজোর পরে ডাল সিজন্।

: ডাল সিজন্ কেটে যাবার পর করবে।

সমরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, এই ছাঁচরামির কারবার করব কিনা আমি সিরিয়াসলি তাই ভাবছি।

নন্দিতা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, সে হল আলাদা কথা। মন না বসলে ছেড়ে দেবে, ফুরিয়ে গেল।

তারপর বলে, কিন্তু ছাঁচরামি চালাচ্ছ কেন ? ভাল বই কি বিক্রি হয় না এদেশে ? ভাল লেখক লেখিকার বইএর এত চাহিদা কেন তবে ? কবে মরে ভূত হয়ে গেছেন লেখকলেখিকা—আজও তাদের ভাল ভাল বইগুলি হরদম বিক্রি হচ্ছে। বাজে অথাও বই ছেপে দেশের সর্বনাশ করে পয়সা করার ছেঁচরা সাধ তোমার জাগল কেন ?

সমরেশ বলে, মামার যে ধৈর্য নেই, মামা যে সময় দিতে চায় না।

নন্দিতা বলে, তোনার মামাকে ধৈর্য শিক্ষা দেবার দায় তো আমরা ছুই মাঝী মিলে মিশে নিয়েছি। মেয়েলোক বলে বুঝি ক্ষমতায় বিশ্বাস হল না ?

সমরেশ চুপ করে যায়।

প্রগতির সন্ধান মেলে না, খবর মেলে।

তার নিজের হাতের লেখা একথানা খামের চিঠি আসে—সে ভালই আছে, সমরেশকে বিব্রত না করে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে, তার জন্ত কেউ যেন চিন্তিত বা বিব্রত না হয়।

একটা বিশেষ ধরনের চাকরী করছে।

বাড়িতে থেকে এ চাকরী করতে অসুবিধা পেনা—তাকে চাকরী করতে দিতে কেউ রাজী হত না। অগত্যা বাধ্য হয়ে কাউকে কিছু না জানিয়েই চাকরীটা সে নিয়ে নিয়েছে।

তার জন্ত কারো ভয় পাবার কোন কারণ নেই। সে একালের মেয়ে, নিজেকে সামলে চলতে শুধু জানে না, পারেও।

প্রগতি ঠিকানা দেয় নি, শুধু পোষ্টাপিসের নামটা লিখেছে। জানিয়েছে তাকে চিঠি লিখতে হলে পোষ্টাপিসের কেয়ারে দিলেই চলবে—রোজ তাকে দু'বার পোষ্টাপিসে যেতে হয়, চিঠি পেতে অসুবিধা হবে না।

শ্রীতি ও নন্দিতাকে সে চিঠিটা পড়ায়। দু'জনের আপত্তি অগ্রাহ্য করে প্রায় গায়ের জোরে দু'জনকে সঙ্গে টেনে নিয়ে ট্যাক্সি করে সকালবেলা হাজির হয় ওই পোষ্টাপিসে।

প্ল্যাঙ্কটের একটা মোটা ভারি ব্যাগ ঝুলিয়ে প্রগতি পোষ্টাপিসে আসে সাড়ে দশটার পর।

তাদের দেখে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে কাছে গিয়ে বলে, আমি তাই ভাবছিলাম, পুলিশী হিসেব কষে পোষ্টাপিসে না এসে তোমরা পারবে না! একটু বোসো, জরুরী কাজটা সেরে আসছি।

তাদের চোখের সামনে সে ছ'জন নানা জাতের পুরুষ ও একজন মেয়ের পেছনে চিঠি ও পার্সেল রেজিস্ট্রী করার কাউন্টারের লাইনটার পিছনে দাঁড়ায়, দেড় ঘণ্টা পরে গোটা পনের ছোট বড় পার্সেল প্রোট বয়সী রেজিষ্ট্রেশন-ক্লেরকগীর নের্দেশ মত টিকিট এঁটে এঁটে জমা দিয়ে ফিরে আসে।

জোয় গলায় বলে, কোথায় থাকি, কার কাজ করি—এসব কিন্তু জানাব না। মনে কর আমার তোমরা বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে ভাগিয়ে দিয়েছ। স্বামীই আমাকে বাপের বাড়ি যেতে দেয় না।

সমরেশ হাত তুলে নন্দিতা ও প্রীতিকে মুখ খুলতে বারণ করে।

বলে, স্বামীর ঘরে পাঠানোর মধ্যে কোন গোপনতার ব্যাপার নেই। অম্বুকের ছেলে, অম্বুক ঠিকানায় অনেক বছর আছে এই এই পাস করেছে কিম্বা অম্বুক কাজে চুকেছে, এসব হিসাব নিকাশ বাদ দিয়েই মেয়ে লোককে আমরা বাপ ভায়েরা স্বামী নামক জীবের হাতে সঁপে দিয়ে রেহাই পাই বলতে চাস? ঘটক জাতটাই তা'হলে সমাজে গড়ে উঠত না। কোন দরকার থাকত না ঘটকের। ছেলে মেয়ের বিয়ে লাগসই করতে পাবত বলেই সমাজে ঘটক জাতটার উৎপত্তি হয়েছিল!

## ভেরো

মরিয়া হয়ে দিশেহারার মত চেষ্টা চালিয়েছিল ছাপা আর বই প্রকাশের  
ক্যাবারটাকে বছরখানেকের মধ্যে লাভজনক করে তুলতে !

ভবানী সময় দিয়েছিল ছ'মাস ।

কিন্তু সমরেশ জানত, ওই ছ'মাসকে টেনে বাড়িয়ে এক বছর দেড় বছর  
করা সম্ভব হবে ।

উন্নতির কোন লক্ষণ শুধু যদি সে দেখাতে পারে ।

সামান্য হলেও লাভ দেখিয়ে ভবানীকে সে পুলকিত করে দিয়েছে ।

কয়েক হাজার টাকা জলে যাবে ধরে নিয়েছিল ভবানী ।

এক বছরে হাতে নাতে নগদ টাকা লাভ দেখিয়ে ভবানীর স্কোভটাকে  
সে পরিণত করেছে আশা এবং আনন্দে ।

এখন কয়েক বছর সে লাভ না টানতে পারলেও ভবানী টেনে যাবে  
—তাকে শুধু প্রকারান্তরে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখতে হবে যে এমনি ভাবেই  
সে মোটা লাভের জন্ত কাজ করে যাবে ।

নিজে বেশী নাই বা খাটল ।

অল্পদের খাটিয়ে লাভের ব্যবস্থা করতে পারলেই হল ।

লাভ বাগাবার জন্ত সে খাঁটি হ্যাচরামিতে পোক্ত হয়েছে—তার কাছে  
ভবানী এখন অনেক কিছু আশা করে ।

নন্দিতা হেসে বলে, আমি তো আগেই তোমায় বলেছি । মানুষটা  
পয়সা বোঝে, যে কোন লাইনে যে কোন উপায়ে পয়সা পেলেই হল ।  
আজ নগদ নগদ না পাওয়া যাক, পরে একদিন পাওয়া যাবে—এ গ্যারান্টি  
পেলেও চলে । মুখে আজকাল তোমার প্রশংসা ধরে না ।

নন্দিতার ছোট নতুন বইটা সত্যি বাজারে হিট করেছে। বইটা বার হতেই চারিদিকে খুব নিন্দা মটেছিল, কোন লেখিকা যে এরকম কুৎসিত অল্লীল বই লিখে স্বনামে প্রকাশ করে দিতে পারে—কয়েকজন পর্যালোচকের কাছে এটাও নাকি অবিস্মৃত ঠেকেছিল।

একটা গুজব রটেছিল যে অল্লীলতার দোষে বইটা হয় তো বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ছ'মাসে বইখানার তিনটি সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। প্রকাশক হিসাবে সমরেশের লাভও মন্দ হয় নি।

প্রট খুব সহজ। রূপহীনা বলে একটি মেয়েকে তার স্বামী ত্যাগ করে—সুন্দরী আরেকটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করার পর। এজন্ত বাপের বাড়িতেও মেয়েটির ছিল অনাদর, ঝি রাঁধুনীর মত দিন কাটিয়েও বকাঝকার অন্ত ছিল না।

কিছুদিন পরে মেয়েটি টের পেল যে তার রূপ নেই কিন্তু যৌবন আছে এবং সে যৌবনের মূল্য দেবার মানুষও আছে। নিয়মনীতি সংস্কার সব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের মূল্যে সে তখন নিজের ভাল থাকা ভাল খাওয়া ভাল পরার ব্যবস্থা করল।

প্রীতি মুখ ঝাঁকিয়ে বলে, আহা, কি গল্পই লিখেছে! রূপ নেই তার যৌবন আছে—গুকনো গাছে ফল ফলেছে!

চতুর্থ সংস্করণ ছাঁপার সময় সমরেশের কি হয় সে-ই জানে, সে একেবারে বঁকে বসে। বলে, না, এ বই আমার নামে প্রকাশ করব না।

: তার মানে?

: নোংরা বই প্রকাশ করে আমার বদনাম হচ্ছে। তুমি নিজের নামে প্রকাশ কর, অল্লীল কারো নাম দিয়ে প্রকাশ কর, আমি প্রকাশক হিসাবে নাম দেব না।

নন্দিতা হেসে বলে, বইটা নোংরা নাকি? তোমারও তাই মত?

সমরেশ বলে, নোংরা বৈ কি। তুমি সরাসরি মেয়েদের দেহ বিক্রি করার পক্ষে প্রচার করেছে।

নন্দিতা আবার হাসে।—কি যে আছে তোমাদের মগজে! তুমিও ধরে নিয়েছ ওই রকম নোংরা বলে এত লোকে বইটা কিনছে, হৈ চৈ করছে? অন্ত দিকটা একবার খেয়ালও হল না!

: অন্ত দিক মানে?

: মেয়েট' বিদ্রোহ করেছে, তেজের সঙ্গে নিজের স্বাধীনভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করেছে, এ অবস্থার মেয়েদের যে অন্ত কোন পথ ধোলা থাকে না সমাজের এটা একটা কলঙ্ক? বুঝুক বা না বুঝুক, এটাই লোকের ভাল লাগছে—মেয়েদের তেজী হতে, বিদ্রোহ করতে, স্বাধীন হতে বলেছি।

সমরেশ খানিক চুপ করে ভাবে।

তারপর গভীর আপশোষের সঙ্গে বলে, এদিকটা তো আমার একেবারে খেয়াল হয় নি! এও যে লড়াই, তুমি লড়াইকে তুলে ধরেছ বলে লোকে খুসী হয়েছে।

নন্দিতা বলে, নোংরা বর্ণনা আছে এরকম একটা লাইন তুলে দেখাতে পার বইটা থেকে?

: অথচ সবাই বলছে বিত্তী নোংরা বই!

: সবাই নয়, তোমাদের মত পণ্ডিতেরা মাজিতরুচি সমাজের মঙ্গল-কামীরা বলছে। যুক্তিটা তো তুমিও তুললে—আমি মেয়েদের দেহ বিক্রির পক্ষে প্রচার চালিয়েছি! উণ্টোটাই বরং ঠিক, বইটা বরং ওই বিত্তী ব্যবস্থার প্রতিবাদ।

সমরেশ ধীরে ধীরে বলে, প্রকাশক হিসাবে নিজের নাম কেন দেব না বলেছিলাম জানো? প্রণতির জন্ত মনটা বিগড়ে গিয়েছিল। ভাবছিলাম যে তুমি প্রণতির মত মেয়েদের সমর্থন করেছ আর রাগে গা জলে যাচ্ছিল।

নন্দিতা জোর দিয়ে বলে, প্রণতি চাকরী করছে, শ্রেফ চাকরী করছে ।  
আমি স্বামীর দাসীত্ব করি, আমার চেয়ে ওর বেশী সন্মান প্রাপ্য ।

ভবানীর সঙ্গে চব্বি কলহের জন্ম সমবেশ প্রস্তুত হয়েছিল ।

অনেক বিরোধিতা করেও কিন্তু কলহটা সে কোন মতেই ঘটিয়ে তুলতে  
পারল না ।

ভবানী তাব সঙ্গে কলহ কবতে রাজী নয় ।

নীতি হিসাবেই যেন তাব সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করাটা ভবানী বাতিল করে  
দিখেছে ।

ভবানীর হিসাব অনুসারে সে অনেক রকম অত্যাচার করে, নানা-  
রকম অপমানজনক কথা বলে । ভবানী সয়ে যাবে এটা কল্পনাও করতে  
পারে না ।

ভবানী যেন কানেও তোলে না তার বিত্ৰী কথা—তাব ব্যবহার লক্ষ্য করে  
না । কাগজ পত্র ছাখে, একে ডেকে ওকে ডেকে কাজের কথা বলে, মান  
অপমানের ধার যেন সে ধাবেই না ।

সমবেশ বুঝতে পাবে, এটা তার চাল ।

কিন্তু কিসের চাল ? তাকে একেবারে বাতিল করে দিলেই বা কি আসে  
যায় ভবানীর ।

তার অপমান পর্যন্ত গাধে মাখে না, কায়দা করে উড়িয়ে দেয়—এর একটা  
গুরুতর তাৎপর্য নিশ্চয় আছে !

অগ্নিমা বলে, ভায়ে, তুমি তো এবাব আমার বিপদে ফেললে ! প্রেস  
চালাতে পারছ না, অথচ প্রেসটাই চালাবে গোঁ ধরেছে, তাই মেনে নিয়ে  
উনি আমার জখ কবছেন ।

: জখ করছেন মানে ?

: তাদের কমিয়েছেন, আত্মার মানছেন না ।

: তোমার ব্যাপার তো নয় ।



: আমার ব্যাপার বই কি ! আমাকে বাদ দিয়ে কি তোমার গ্রেস চলছে  
ভায়ে ? আমি গোঁ না ধরলে চলত ? আমার গোঁ-টাকেই এবার ও কাজে  
লাগাচ্ছে, আমার দক্ষা নিক্ষেপ করছে ।

: আমি তো বলেছি নিজে চালাব ।

: তুমি পাগল হয়ে গেছ ।

সমরেশ গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না ছোটমামী,  
সে অবস্থা আর নেই । তুমিই সত্যি প্রথমে মামাকে দিয়ে ব্যবস্থাটা করিয়ে  
দিয়েছিলে, আমি তখন মামার জুকুমে উঠতাম, বসতাম । তারপর নিজের  
ব্যবস্থায় চালাব ঠিক করে মামার কাছে সময় চেয়ে নিয়েছি—তোমার কিছু  
বলতে আসি নি । মামা অবশ্য এমনিতে সময় দেয় নি, সর্ত করেছিল যে  
ছ'মাসে কিছু করতে না পারলে তোমাকে দিয়ে মামাকে আর জ্বালাতন করতে  
পারব না ।

অগনিমা গাঙ্গে হাত দিয়ে বলে, ওমা এসব কথা আমার তুমি জানাও নি !

সমরেশ বলে, জানাবার উপায় ছিল না । তারপর আমি লাভ দেখিয়ে  
মামাকে খুসী করেছি । এখন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে একেবারে অন্তরকম ।  
যেৱকম ব্যবস্থায় লাভ দেখিয়েছিলাম সেটা বাতিল করে আমি আবার নতুন  
রকম ব্যবস্থা করেছি, মামা কিছুই বলছে না । ভেবেছিলাম ভন্নানক চটে  
যাবে—টু শব্দ করছে না ।

অগনিমা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ।

সমরেশ বলে, এ ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না আমি । ও মাসে  
গোকুলের যে বইটা বেবোল, তাতে সোজাসজি মামাদের ঠোকা হয়েছে—  
ভীষণভাবে ঠোকা হয়েছে । মামা যদি মনে করত যে বিশেষভাবে ওকেই ঠোকা  
হয়েছে আমি আশ্চর্য হতাম না । শুনলে অবাক হয়ে যাবে, বইটা পড়ে মামা  
শুধু আমার জিজ্ঞেস করল—কত বই ছাপিয়েছি, কত কপি বিক্রি হয়েছে ।

সমরেশ হাসবার চেষ্টা করে।—কাজেই বুঝতে পারছ দামটা এখন আর তোমার নয়, আমার সঙ্গে আমার সোজাসুজি ঠোকাঠুকি চলছে।

অশিমা ম্লানমুখে হেসে বলে, দায় আমারই। তুমি রেহাই দিয়ে থাকলে কি হবে, উনি রেহাই দেবেন না। তাই তো ভাবছিলাম, আমার খাতির কেন এত কমে গেল।

নন্দিতা সব শুনে বলে, বাঁচলাম। ছোটগিন্নী কোনদিন ভাবতেও পারবে না আমার জন্ত ওর খাতির কমেছে—হিংসায় বুক ফেটে মরবে না।

সমরেশ বলে, কিসে কি হবে না হবে সে বিষয়ে নিজের মতটাকে এত বেশী নির্ভুল ধরে রেখো না।

অনেকেই বলছে—মাথা ধারাপ হয়ে গেছে সমরেশের। নইলে ভবানীর সঙ্গে বিবাদ বাধায়, অজ্ঞাত অখ্যাত অল্প বয়সী লেখক-লেখিকার বিশ্রী রকম গরম গরম বই ছাপতে শুরু করে!

কুমারকে ভবানী অস্ত্র চাকরীতে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তার মাইনে বেড়ে গেছে একশ' টাকা।

সুমিত্রা কিন্তু খুসী নয়।

সে বলে, তেমনি খাটুনি বেড়েছে তিনগুণ। যদিও বা বাঁচাব কোন আশা ছিল—এবার দাদা আর বাঁচবে না।

: চিকিৎসা করাচ্ছে।

: এত খাটলে শুধু চিকিৎসা করে কারো রোগ সারে? দাদার উচিত ছিল কাজকর্ম বন্ধ করে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা সারানো।

: তোমাদের না খাইয়ে মেরে?

: আমরা মরলে দাদার কি? দাদা মরলে আমাদের সেই একই অবস্থা হবে না?

: নিজে মরলে মা বোন মরবে এটা জেনেও নিজে বাঁচার জন্ত কোন মাছুষ মা বোনকে মরতে দিতে পারে না।

: তুমি একটু সামলাও না দাদাকে ?

সমরেশ চুপ করে থাকে ।

তার আলা বোধ হয় যে স্নমিত্রাও খেয়াল রাখে না কতদিকে তার কত দায় ।

কুমার সত্যিই দিন দিন আরও বেশী জীর্ণশীর্ণ হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে ।

কেবলমাত্র নও-জোয়ান লেখক লেখিকাদের নিয়ে মাসিক আর বই ছাপানোর কারবার বছর খানেক চালিয়ে যাবার পর দেখা যায় সমরেশ লোকসান দিচ্ছে না, এভাবে চালাতে পারলে আর ছ'মাস একবছরের মধ্যে বরং কিছু কিছু লাভের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ।

নও-জোয়ানেরা এসে আড্ডা জমায় । সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত্রি পৰ্ব্বন্ত প্রেসটা হালি গল্পে মুখরিত হয়ে থাকে ।

সমরেশের আজকাল রাত্রে গভীর ঘুম হয়—কোথা দিয়ে রাত কেটে যায় টেরও পায় না ।

আগেও কম খাটত না—সারাদিন অমাহুষিক পরিশ্রম করেও রাত্রে ঘুমের জন্ত ছটফট করত । চিন্তায় চিন্তায় জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল তার দেহ আর মন ।

চিন্তা এখনো আছে—আগের চেয়ে বরং গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা নিয়েই এখন তার কারবার ।

কিন্তু কজের মূল স্রুট পালটে দিয়ে সমাজ আর জীবনের নতুন মূল্যের হিসাব কষে একার বদলে সকলের সঙ্গে এগিয়ে চলার নীতি আঁকড়ে ধরে সে যেন জীবনের আসল ছন্দ আবিষ্কার করে ফেলেছে ।

প্রীতি মাঝে মাঝে আসে, সে খুসী হয়ে বলে, তবু একটু মাহুষের মত চেহারা হচ্ছে । কিন্তু এ রকম গরম লেখা ছাপছিল, তোকে তো জেলে নিয়ে যাবে ?

: উচিত কথা গরম হয়, করব কি !

প্রীতি নন্দিতাদের বাড়িতেই থাকে। ইংরাজী মাসের তিন তারিখে বিয়াম তাকে মণিঅর্ডার করে খোরপোষের টাকা পাঠায়। খরচ নিতে নন্দিতার বাক্য কোন আপত্তি করে না।

কুমারকে বেশী মাইনের ভাল চাকরীতে লাগিয়ে দেবার পরেই ভবানী নন্দিতার কাছে হুণ্ডায় তিন দিনের বদলে সর্বদা তার বাড়িতে বাস করার দাবী জানিয়েছে এবং তাই নিয়ে তাদের মধ্যে একটা বিবাদ বাধার উপক্রম হতেই কুমারকে ডাকিয়ে তাকে মধ্যস্থ মেনেছে !

এবং কুমার সমর্থন করেছে ভবানীকে।

: চাকরীর খাতিরে ওর দিকে টানছ ?

: না, এভাবে সপ্তাহে তিন দিন স্বামীর বাড়ি ঘিরে থাকার কোন মানে হয় না, উণ্টোটা বরং বেথাপ্লা হয় না—ছু'চারদিন পরে বাপের বাড়ি গিয়ে একটা দিন থেকে আসা।

নন্দিতা কিছুদিন সময় চেয়ে নিয়েছে। সে যে নতুন বইটা লিখছে সেটা শেষ করার পর নতুন ব্যবস্থা কি করা যায় সে বিবেচনা করবে।

মিত্রসাহেবের বাড়িতে স্মিত্রার চব্বিশ ঘণ্টার চাকরী—সে কিন্তু অবসর বুঝে মিত্রসাহেবের বাচ্চা দুটোকে সঙ্গে করে ছ'এক ঘণ্টা বাড়িতে কাটিয়ে যায়।

কুমারের চেহারা আরও খারাপের দিকে যেতে থাকায় এবং চিকিৎসায় মোটা টাকা খরচ হতে থাকায় মেয়ের চাকরী নিয়ে পরের বাড়ি চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকটা বোধ হয় মনে মনে মেনে নিয়েছে।

মেয়ে বাড়ি এলে আর গোমড়া মুখে চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকায় না, শাস্তভাবে কথাবার্তা বলে।

স্মিত্রা মাঝে মাঝে সমরেশের আপিসে গিয়েও হাজির হয়। নওজোয়ানদের আড্ডায় অনায়াসে মিশ খেয়ে যায়।

কেউ কেউ তামাসা করে তাকে বলে, দেখলে মনে হয় কিন্তু বাচ্চা দুটো আপনারি !

স্মিত্রা সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমারি তো ! খাওয়াই-দাওয়াই ঘুম পাড়াই—চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশোনা করি। নিজের পেটের বাচ্চার জগুও কোন মা এতটা করে না।

সমরেশ তাই মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে জীবনের কী বিচিত্র রূপ আর গতি ।

সে বুঝতে পেরে গিয়েছে যে নন্দিতা বা অগ্নিমার খাতিরে নয়, তারই নতুন ধারার কাজের প্রক্রিয়াকে খাতির করে ভবানী তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায না ।

একটা বাধ্যতামূলক সার্বজনীন ছুটির দিন তাকে ছপ্পুরে খেতে বলে, পাশাপাশি খেতে বসে, নন্দিতা ও অগ্নিমার সামনেই বলে, যেমন চালাচ্ছি চলিষে যা—কিন্তু আমার নামটা জড়াস না । আমার অন্তরকম ব্যাপার, অন্তরকম লোকের সঙ্গে কারবার, বুঝিস তো ?

সমরেশ বলে, তোমার নাম জড়াব কি মামা ? তোমার নাম জড়ালে বরং আমার ক্ষতি হবে !

ভবানী খুসী হয়ে বলে, আমিও তাই বলছি । আমার নামটা একদম জড়াস নে ।

অগ্নিমা হু'জনের পাতে মাছের ঝাল দিতে দিতে বলে, ভাংকে অত বোকা ভেবো না । তোমার চেয়ে বুদ্ধি বেশী চোখা ।

ভবানী হেসে বলে, সে তো আমার আনন্দের কথা ! ওকে আরেকটা মাছ দাও ।

অগ্নিমা বলে, আরেক রকম মাছ আছে । কাকে কি খেতে দেব না দেব, তুমি হুকুম চালিও না । যেমন রেঁধেছি বেড়েছি তেমনি তো খেতে দেব !

রীতিমত ধমক !

সমরেশ মাথা নীচু করে থাকে ।

ভবানী আবার বলে, আমি যে পেছনে আছি—টাকা পরসাদ দিয়ে আর অন্তভাবে সাহায্য করছি, এসব কাউকে বলবি না ।

সমরেশ বলে, ভয় পাচ্ছ কেন মামা ? আমি নিজের বিচার বুদ্ধি অনুসারে

কান্নবার চালিয়েছি, তোমার নাম জড়িয়ে আমার কোন লাভ আছে ? তোমার নাম এড়িয়ে চললেই বরং আমার মঙ্গল ।

অগিমা হঠাৎ ঘেন ক্লেপে যায় ।

রেগে আগুন হয়ে বলে, তুমি তো সত্যি সত্যি আজকাল বড় ছোটলোক হয়ে গেছ ভায়ে ? ওই সব ব্যবস্থা করে দিল, মুখের ওপর ওকেই তুমি এভাবে অপমান করছ !

সমরেশ বুদ্ধিমানের মত মুখ বন্ধ রাখে । ভবানীর সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ।

অগিমার নিজের হাতে ঝাল মসলা দিয়ে রান্না করা মাছের ঝোল তৃপ্তিব সঙ্গে ঘরে গলানো বিদেশী মাখনের ঘিয়ে তৈরী পুরোট্টা দিয়ে খেতে খেতে ভবানী বলে, আমরা কাজের কথা বলছি, দরকারী কথা বলছি । এসব হল শ্রেফ কি করা ভাল আর কি করা ভাল নয় তার হিসাব নিকাশ । আমার নাম রাখবে কি রাখবে না সেটা হিসাবের ব্যাপার—তাতে আমার মান অপমানের প্রশ্নই নেই । তুমি কিছু না বুঝে অযথা ওকে গঞ্জনা দিলে ।

সমরেশ নীরবে খেয়ে যায় । দু'রকম মাছের মেশানো স্বাদে সে ঘেন একেবারে মজে গেছে ।

সমরেশের পার্শ্বে আরেক টুকরা মাছ তুলে দিয়ে অগিমা জিজ্ঞাসা কবে, রাগ করলে নাকি ভাগ্নে ?

সমরেশ মুখ তুলে বলে, এ রকম মাছ রাখতে কোথায় শিখেছ ছোটমামী ? হোটেলকে যে হার মানালে !

ভবানী মাথা নীচু করে খেয়ে যায় ।

অগিমা খিল খিল করে হাসে ।

সমাপ্ত